রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

ডক্টর প্রণয়কুমার কুণ্ডু

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০ ০০৭

উৎসর্গ

আমার পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

রূপে রসে ও আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের গীতি-ও নৃত্যনাট্যগুলির আবেদন ক্রমশ ব্যাপক ও গভীর হ'চ্ছে। রূপ ও রসের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় না হোক, অন্তত তার আঙ্গিক ও তার প্রযুক্তির দিক থেকে এই আবেদন বাংলাদেশের বাহিরেও প্রসারিত হয়েছে। বস্তুত, সমগ্র উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও নানা সৌখীন ও পেশাদারী মঞ্চে ভারতীয় 'ব্যালে' নামে যে-বস্তু মাঝে মাঝে পরিবেশিত হয়, তা' রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গীতি-ও নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক ও তার প্রযুক্তির রকমফের মাত্র। বাংলাদেশেও এর আনুষ্ঠানিক প্রসার ও জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গীতি-ও নৃত্যনাট্যগুলির রূপবৈশিষ্ট্য, রসাবেদনের প্রকৃতি, আঙ্গিক ও প্রযুক্তির উদ্ভব, বিবর্তন ও পরিণতির ব্যাপক ও সুসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ও আলোচনা এ-যাবৎ হয়নি', এবং না হওয়ার ফলে রবীন্দ্র-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের এই দিকটা আজও আমাদের যথেষ্ট বুদ্ধিগোচর হয়নি', আমাদের শিল্পসুষমাবোধ ও রুচি যথেষ্ট পরিশীলিত হয়নি'। এতে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, আরও হ'চ্ছে। অর্থাৎ, পর্বে পর্বে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাৎপর্য, আঙ্গিকের ক্রমবিবর্তন ও তার প্রযুক্তির ধারা ইত্যাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় ইতিমধ্যেই নবোদ্ভিন্ন ভারতীয় 'ব্যালে' অভিনয়ে নানা শৈথিল্য ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের গীতি-ও নৃত্যনাট্যগুলিতে এই শৈথিল্য ও বিকৃতি যেন আরও প্রকট হ'চ্ছে।

প্রণয়কুমারের বইখানার পাণ্ডুলিপি পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল, এবং পড়ে আমার ভালো লেগেছিল। এই বইটিতে বোধহয় এই প্রথম রবীন্দ্রগীতি-ও নৃত্যনাট্যগুলির রূপ ও রসপ্রকৃতির বিশ্লেষণ ও বিবর্তন, এগুলির আঙ্গিক ও তার প্রযুক্তির বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত হ'লো। এর প্রয়োজন ছিল। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রেখে আঙ্গিকের বিবর্তন ও প্রযুক্তি, তার রসাবেদন, আঙ্গিকের সঙ্গে বিষয় ও বিষয়াশ্রিত অর্থের সম্বন্ধ, গানের সঙ্গে নাচের সম্বন্ধ,

অভিনয়ের দৃশ্যমানতা প্রভৃতির এমন সুন্দর সুসংবদ্ধ ও বোধবুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ আগে কোথাও পাইনি। এবং এই বিশ্লেষণ আগাগোড়া করা হয়েছে খুব তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভরভাবে, ভাষার সাহিত্যিক শুচিতা রক্ষা করে, প্রণয়কুমারের বইখানা এই কারণে আমি অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করি।

প্রণয়কুমার বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্যার আদিতে রয়েছে গীতিনাট্য এবং শেষ প্রান্তে নৃত্যনাট্য'। এই তথ্যের মধ্যে প্রণয়কুমার একটি গভীর তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন, এবং সে-তাৎপর্য কবির ছন্দ-চেতনার ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্যেই ধরা পড়েছে। কবি বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য রচনার পর থেকে পৃথক পৃথকভাবে কাব্য, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুশীলন করেছেন জীবনের দীর্ঘকাল ধরে; কিন্তু শেষ পর্যায়ে পৌছে যেন খুব স্বাভাবিকভাবেই নৃত্যনাট্যে এমন একটি শিল্পরূপে পৌছুলেন, ছন্দচেতনার পথ বেয়ে, যাতে কথা, সুর, নৃত্য ও অভিনয় এক হয়ে মিলেছে একটি 'অবিভাজ্য ছন্দোময়তায়'। প্রণয়কুমারের এই বইখানা গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে বিবর্তনের এই ধারাটিকে সুস্পষ্ট করে দেখা ও দেখানোর একটি সার্থক চেষ্টা। এই সূত্রে প্রণয়কুমার গানের কথা, সুর ও ছন্দ, নৃত্যের ছন্দরূপ, নাটকের কথা ও গতি, অভিনয়ের রূপ, মঞ্চকলা, দেশ-বিদেশের গীতি-ও নৃত্যনাট্যের যোগাযোগ ও পার্থক্য, রবীন্দ্র-জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যচেতনা, ইত্যাদি সমস্তই তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন। তার ফলে তাঁর আলোচনাটি একটা সমগ্ররূপ ধারণ করেছে।

প্রণয়কুমার বলেছেন, চণ্ডালিকায় রবীন্দ্রনাট্যের চরম বিকাশ। "আঙ্গিকের বিচারে, রসের বিচারে, সামগ্রিক রূপের বিচারে এবং ঋজুলক্ষ্য তাৎপর্যে চণ্ডালিকাই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ক্রান্তিস্থল।" তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে রবীন্দ্র গীতি-ও নৃত্যনাট্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্র-চিত্তে একটি সচেতন বুদ্ধির ক্রিয়া, এবং একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের কিছু ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করেছিলাম; সে-প্রসঙ্গে বাল্মীকি-প্রতিভা থেকে শ্যামা-চণ্ডালিকায় রূপচেতনার পরিণতির কথা সংক্ষেপে বলেওছিলাম। কিন্তু আমার

কাছে তখন যা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট, যার আলোচনায় মনোনিবেশ করবার সুযোগ আমার হয়নি, প্রণয়কুমার তাকে সুস্পষ্ট করেছেন, বিস্তৃতভাবে তার আলোচনা করেছেন, এবং এমন আলোচনা যা নিঃসন্দেহে স্বীকৃতির দাবি রাখে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। এই বই যাঁরা অভিনিবেশে পড়বেন তাঁরা উপকৃত হবেন, আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইতি

কলিকাতা — নীহাররঞ্জন রায়

১৮ই নভেম্বর ঃ ১৯৬৪

নিবেদন

গীতবিতান, তৃতীয়খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় অংশের শেষে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন :

"রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে যেমন সুরের তেমনি ভাষা ও ছন্দের কত নূতন পরীক্ষা করিয়া কোথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে বিষয়ে যথাকালে অনুসন্ধান ও আলোচনা হইবে আশা করা যায়।"

বাস্তবিকপক্ষে, যদিও ছাত্রজীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে অনুরাগী ছিলাম, তথাপি এ বিষয়ে গবেষণা করার কথা কখনো মনে হয়নি। ১৯৫৯ সালের সুরুতে যখন রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনার কথা ভাবছিলাম, তখন রবীন্দ্রজীবনী-রচয়িতা পূজনীয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে এই বিষয়ে গবেষণা করার কথা বলেন ও উৎসাহ দেন। বন্ধুবর অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে, আমার পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী নির্দেশকরূপে গবেষণার পথ খুলে দেন। আমার গবেষণার এই হচ্ছে সূচনা এবং প্রাথমিক ইতিকথা। ১৯৬২ সালে যে গবেষণামূলক গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করি, সৌভাগ্যবশত ১৯৬৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সেই গবেষণাগ্রন্থ অনুমোদন করেন। পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ছাড়াও ওই গবেষণাগ্রন্থের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। এই সুযোগে তাঁদের কাছে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। ওই গবেষণা-গ্রন্থই কিছু পরিবর্তিতরূপে বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। তবে মূল আলোচনার ধারা ও বক্তব্য পরিবর্তন করা হয়নি।

গ্রন্থটি গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত বলেই, স্বভাবতই একটি তত্ত্বকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয়েছে। আলোচনার সুরুতেই 'পূর্বভাষণ'-এর মধ্যে ওই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি ; পরবর্তী বিশ্লেষণ বা আলোচনা তারই আলোকে আলোকিত। 'উত্তর ভাষণ' অংশে পূর্বাপরতাসূত্রে ওই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত।

বস্তুত, আমার মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বের সৃষ্টি গীতিনাট্য এবং শেষ পর্বের সৃষ্টি নৃত্যনাট্যের নির্দিষ্ট সংস্থান আকস্মিক বা পারম্পর্যহীন কোন ব্যাপার নয়। গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত যে সৃষ্টিধারা অন্তঃস্রোতের মতো এগিয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে এক অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে বলেই আমার ধারণা। কীভাবে এই যোগসূত্র রচিত হয়েছে, অথবা তার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন্ বিশেষ শিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, এই আলোচনার লক্ষ্য বা উপজীব্য তা'ই। এই আলোচনা আসলে রবীন্দ্র-শিল্প, বিশেষভাবে নাট্যকলার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির আলোচনা ; সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রসঙ্গই মুখ্যত এই আলোচনার মধ্যে এসে পড়লেও, মনে রাখা দরকার—আসলে এই আলোচনা সঙ্গীতের বা নৃত্যের নয়।

বিশেষ উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিশেষ দিক বেছে নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, অনেকেই এই বিষয়-নির্বাচন দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। এমন আভাসও কখনো কখনো পেয়েছিলাম, অধ্যাপকের পক্ষে এই ধরনের আলোচনা অসঙ্গত। আমার আজ কবুল করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, এইসব কারণে একদা গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই সংস্কারনিষ্ঠ যে, তা সংস্কার করতেও ভয় পাই।

যাই হোক, আমি লক্ষ্য করেছিলাম, রবীন্দ্র-নাটকের আলোচনায় যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে যেন কিছুটা নিস্পৃহ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটক বিষয়ে যে পর্যায়ের আলোচনা আছে, তুলনামূলকভাবে গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের আলোচনা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অথচ শিল্প হিসেবে এগুলির সত্যিই তুলনা নেই। এ বিষয়ে আলোচনার উৎসাহ যে আদৌ দেখা যায়নি বা হয়নি তা বলা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা। কিন্তু সেইসব আলোচনা যথোচিত বা পূর্ণাঙ্গ নয় ; হয়ত বা সেই উদ্দেশ্যে লিখিতও নয়। আমার দৃষ্টি সেই পূর্ণতার দিকেই। শিল্প হিসেবে গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের দু'টি দিক—ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক। কিন্তু লিখিত রূপে ব্যবহারিক দিকটির স্বরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর নয়। তাই হয়ত এই

আলোচনার কোন কোন অংশে প্রাঞ্জলতা বজায় থাকেনি। তথাপি, এই আলোচনা মূলত প্রযুক্তি-গত ও আঙ্গিক-গত। একথা স্বীকার করি, বর্তমান আলোচনাই শেষ কথা নয়; ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। তবে যতখানি সম্ভব ব্যাপক আলোচনারই চেষ্টা করেছি।

শিল্পী সৃষ্টির আনন্দে বা প্রেরণাতেই শিল্প রচনা করেন, শিল্পের মূলে থাকে অলৌকিক আনন্দ এবং ঐ সৃষ্টি স্বতউৎসারিত। শিল্প বিচার করতে বসে অথবা শিল্পের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে সমালোচক তত্ত্ব, তথ্য, আঙ্গিক ইত্যাদির প্রসঙ্গ তোলেন। বলা বাহুল্য, এসব নিতান্তই বাহ্যিক বিশ্লেষণ। শিল্পী সৃষ্টি করেই খুশী। কোন্ সমালোচক তার মধ্যে কী তত্ত্ব বা তথ্য খুঁজে পেলেন, তা তাঁর বিবেচ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, তখন তার মূলে ছিল সৃষ্টির ওই আনন্দ বা প্রেরণা। অবশ্য, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পের অনুশীলনজাত অভিজ্ঞতাও মূল্যবান সম্পদ ও উপাদান। বস্তুত, গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের একটা রসের বা উপলব্ধির দিক আছে, যা এই ধরনের আলোচনার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

তবে কেন এই বিশ্লেষণ? কারণ, আমরা যারা তত্ত্ব বা তথ্য বিশ্লেষণ করি, তার মধ্য দিয়ে শিল্পের স্বরূপকে ধরতে চাই, আর কিছু নয়। আমিও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই, রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষ সৃষ্টির আলোচনায় হাত দিয়েছি।

এই আলোচনায় অনেকেরই সহায়তা লাভ করেছি। তাঁদের মধ্যে স্মরণযোগ্য শ্রীপ্রশান্ত রায়, শ্রীবিশ্বরূপ বসু, শ্রীসনৎ গুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীমনোজকুমার চট্টোপাধ্যায়। পূজনীয় ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানী এবং শ্রীপুলিনবিহারী সেন আমাকে নানাভাবে বাধিত করেছেন। শ্রীগগনচন্দ্র দে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে, বিশেষভাবে নির্দেশিকা প্রস্তুত করে যে সাহায্য করেছেন, তা একান্তই বন্ধুজনোচিত। প্রখ্যাত আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত শম্ভু সাহা দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রগুলি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। শ্রীসমীর ঘোষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিশংকর চট্টোপাধ্যায় এই

আলোচনায় নানাভাবে আনুকূল্য করেছেন। সামগ্রিকভাবে বিশ্বভারতীর কাছে আমি উপকৃত ; বিশ্বভারতীর সাহায্য ছাড়া এই আলোচনা অসম্ভব হতো। বিশ্বভারতীর অনুমোদনেই রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রটি এই গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র-রূপে ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছি। তাছাড়া, বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুণীজনের আনুকূল্য লাভ করেছি। সর্বোপরি, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কয়েকটি ব্লক দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এই গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করে মাননীয় শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার গবেষণার সুরু থেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে কীভাবে সাহায্য পেয়েছি তা বলার নয়। রবীন্দ্র-সদনের ফাইলের স্তূপে বন্দী নানা তথ্য সংগ্রহের সুযোগ যদি তিনি না ক রে দিতেন, তাহলে 'পরিশিষ্ট' অংশের প্রায় সবটুকুই অলিখিত থেকে যেত। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

পূজনীয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূজনীয়া প্রতিমা দেবী, পূজনীয় শ্রীকানাই সামন্ত এবং পূজনীয় শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সস্নেহ সাহচর্য ও সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এই বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। শিল্প-সমালোচক পূজনীয় শ্রীকানাই সামন্ত আমার আলোচনায় নানাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া, সুরু থেকেই পূজনীয় শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সান্নিধ্য ও অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলাম। পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় নানা ব্যস্ততার মধ্যেও এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ; শুধু তাই নয়, তাঁর কিছু নির্দেশ ও উপদেশ এই আলোচনার ধারাকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। এঁদের সকলকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন থেকেই আমি আমার পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর অপরিসীম স্নেহ লাভ করেছি। গবেষণার ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কাছ থেকে যে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি, তা আজ বার বার মনে পড়ছে এবং আমার প্রথম গ্রন্থ তাঁকেই উৎসর্গ ক'রে আনন্দ অনুভব করছি।

প্রসঙ্গত, সুধী সমাজের কাছে নিবেদন এই যে, তাঁরা হয়ত স্বীকার করবেন, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা

ইতিপূর্বে হয়নি। আশা করি, তাঁরা এই আলোচনাটি সানন্দে গ্রহণ করবেন।

সবশেষে মুদ্রণ-প্রমাদ প্রসঙ্গ। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি ছাপার ভুল, প্রায়শই বানান ভুল, থেকে গেল। হয়তো একটি 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজন করলে ভালো হ'তো। তবে মুদ্রণ-প্রমাদগুলি তেমন হঠকারী বা বিভ্রান্তিকর নয়, তাই শুদ্ধিপত্র দিলাম না। বিশেষভাবে কয়েকটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'পূর্ব ভাষণ'-এর অন্তর্গত উল্লেখপঞ্জীর ২৫ সংখ্যক পাদটিকায় 'শেষ কথা'-র পরিবর্তে হবে 'উত্তর ভাষণ'। ৬ পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে 'চলিষ্ণু গতিশীল'-এর বদলে হবে 'চলিষ্ণু অথবা গতিশীল।' ১৩২ পৃষ্ঠায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এর বদলে ছাপা হয়েছে 'প্রকৃতির পরিশোধ'। ১৬১ পৃষ্ঠার চতুর্দশ পংক্তিতে 'অনুযায়ী'র বদলে হবে 'অনুসারী'। ২১৮ পৃষ্ঠায় 'গেল ছলি গেল তোরে গেল চলি'-র বদলে হবে 'গেল চলি, গেল তোরে গেল ছলি'। ২৬০ পৃষ্ঠার শেষে 'ভৈরবে'র বদলে হবে 'সিন্ধু ভৈরবে'র। ২৭৬ পৃষ্ঠায় 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু'র পরিবর্তে ছাপা হয়েছে 'হৃদয়ে মন্ত্রিল গুমরু গুরু গুরু'। তেমনি ২৯২ পৃষ্ঠার শেষের ছত্রে 'মহাবস্তুবদান' এর বদলে ছাপা হয়েছে 'মহাস্তুবদান'। তাছাড়া, 'পরিশিষ্ট' অংশেও এই ধরনের আরো কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল। এই ত্রুটির জন্য সত্যিই দুঃখিত। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করবার ইচ্ছে রইল।

ডিসেম্বর : ১৯৬৪ — প্রণয়কুমার কুণ্ডু

সূচীপত্র

কবির শেষ জন্মবার্ষিকীতে একটি নৃত্যানুষ্ঠান [শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে]

পূর্বভাষণ

এক পথ অন্য পথে মেশে, এক নদী আর-এক নদীতে : পথ হয় রাজপথ, নদী হয় সমুদ্র।

এই মিলন যেমন সত্য, মিলে যাবার পর তাদের বিশেষ-অস্তিত্ব-হীনতাও তেমনি সত্য। সেই মিলন এনে দেয় নতুন রূপ। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই এমনি এক পালা চলেছে। মানুষের মনো-রাজ্যেও এমনি এক প্রবণতা অনুভব করা যায়। বিচিত্র সম্ভারকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করবার জন্যে মন প্রস্তুত থাকে। শিল্পরাজ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করি। এক ঐতিহ্যের সঙ্গে আর-এক ঐতিহ্যের, এক সংস্কৃতির সঙ্গে আর-এক সংস্কৃতির, এক সুরের সঙ্গে আর-এক সুরের মিলনের পথ যেন সব সময়ই খোলা থাকে এবং এইভাবে বিচিত্র হবার জন্যেই যেন শিল্পকলা প্রস্তুত। বিচিত্র মানে বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট নয়, বহুর সমাস বা সমারোহ, যার লক্ষ একমুখীন, যার সুর একাত্ম, অবিভাজ্য।

বাস্তবিক পক্ষে, যে-কোনো শিল্পের দুটি দিক। এক, বিশিষ্টতা ; দুই, বহুর সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা। সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের প্রত্যেকটিরই এমন এক স্বাতন্ত্র্য আছে, যেখানে ধারা-ধরণ অনন্য। প্রত্যেক ধারাই বিভিন্ন উপায়-উপকরণকে আশ্রয় করে : কোনোটা কথা, কোনোটা সুর, কোনোটা রঙ বা রেখাকে। বলা বাহুল্য, সকলেরই লক্ষ্য থাকে 'রূপায়ণ', কোনো একটি 'রূপ'কে প্রকাশ করা। তাই অর্থ এবং ভাব -মূলক কবিতা যেমন মনের মধ্যে রসরূপ জাগ্রত করে, তেমনি অবচ্ছিন্ন সুরও

করে তার নিজস্ব প্রকরণে ও প্রকৃতিতে। চিত্র বা ভাস্কর্য-ধৃত রূপ তো ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, তবে তাকেও উদ্‌বোধিত চিত্তে গভীরভাবে বোধ করার বা সত্য করে দেখবার অপেক্ষা থাকে।

বিভিন্ন শিল্পকলার এই পৃথক পৃথক গতি-প্রকৃতিকে স্বীকার করেও বলা যায়, শিল্পের প্রধান সমস্যা হল— এগুলিকে কি কখনোই মেলানো যায় না? প্রশ্ন হচ্ছে, সুকুমার শিল্পের বিভিন্ন পথ কি একটি রাজপথে মিলতে পারে না, কিংবা বলা যায়— বিভিন্ন ধারা কি মিলে-মিশে রসসমুদ্রের এক সঙ্গমে ধাবিত হতে পারে না? এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সঙ্গীত শব্দটি এক সময় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। তেমনি সাহিত্যবাচক কাব্য শব্দটি। নাটককে দৃশ্যকাব্য আখ্যা দেওয়ার মধ্যে প্রকারান্তরে শুধু অভিনয়, এমন-কি কাব্য-সম্পৃক্ত অভিনয় ছাড়াও আরো অন্য শিল্পধারার স্বীকৃতি অনুভব করা যায়, সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর বিশ্লেষণপর মনোভাব যতই প্রকট হয়ে উঠেছে, সমগ্র ততই নানাভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এক হয়েছে বহু বিচিত্র কথা (কাব্য), সুর (গান), অঙ্গভঙ্গী (অভিনয় বা নৃত্য) বিচ্ছিন্ন হবার পরেও নিছক গানের মধ্যেই অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ হয়েছে এবং, এইখানেই শেষ নয়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেও সেগুলি আবার বহুবিচিত্র স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। এমনি করেই এক হয়েছে বহু, বিচিত্র।

এই তো হল এক থেকে বহুর দিকে গতি ও পরিণতি; একই রূপরসের বহু-আধার-আশ্রিত বহু-উপায়-উপাদানে সৃষ্ট বহুবিধ কলা, বহু জাতি, বহু শৈলী। এমনি করেই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা (গীত, বাদ্য, নৃত্য) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পরস্পরের কাছ থেকে। কালে কালে এমনও হয়— কেউ কাউকে

চেনে না, কেউ কাউকে বোঝে না, বা একই রস-রক্ত সকলেরই শিরায় শিরায় প্রবাহিত তাও যেন জানে না। তখনি প্রয়োজন হয় বহুকে পুনরায় একত্র মেলাবার, বিচ্ছিন্নকে গেঁথে দেবার— সূত্রে নানাবিধ ফুলের মতই-যে তাও হয়তো নয়, বহুকে মিলিয়ে জৈবিকভাবে নতুন একটি 'একক' সৃষ্টি করবার, যেখানে এই নতুন রূপায়ণকে এক বা বহু বলা কঠিন।

বিচ্ছিন্নকে এক সূত্রে গাঁথা অবশ্য সহজসাধ্য নয়, শিল্পক্ষেত্রে তো নয়ই। পৃথিবীতে এমন প্রতিভা নিঃসন্দেহে সুদুর্লভ। এমন-কি যদি বলি প্রায় নেই, তা হলেও হয়তো অত্যুক্তি করা হয় না। বহুকে মিলিয়ে একটি 'একক'-সৃষ্টির জন্যে যে শিল্পচেতনা দরকার, তেমন সাধনাই বা ক'জনের থাকে! সবগুলিকে একই পথে মেলাতে পারা চাই, এবং তার জন্যে প্রয়োজন এমন এক সামগ্রিক রসবিবেক বা প্রেরণা, যার থেকে বিভিন্ন ধারা উদ্ভূত এবং যাতে মিলিত। কাজেই, শিল্পের বা সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারাগুলিকে মেলানো সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন যে, মূলতঃ তিনি কবি,[১] তথাপি এ কথা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করতে হয়— তিনি সুরকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী এবং সর্বোপরি নব্যভারতীয় নৃত্যধারার পথিকৃৎ। কাব্যলোক থেকে সুরলোকে, সুরলোক থেকে রূপলোকে এবং রূপাতীতলোকে কেমন করে তাঁর শিল্পীসত্তা ধীরে ধীরে সমুত্তীর্ণ হয়েছে— সে যেমন গভীর বিস্ময়কর, তেমনি গভীর পর্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ রহস্যময় ঘটনা।

এই আলোচনায় দেখতে চেষ্টা করব— রবীন্দ্র-প্রতিভার চরম পরিণতিতে সেই অপূর্বের, সেই বহুর সমন্বয়ে রচিত একটি 'একক'-এর দেখা পাওয়া গেল কিনা।

২

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার মূল কথা কী? ১৩৩৮ সালে, পঁচিশে বৈশাখে শান্তিনিকেতনে কবি জানালেন :

জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।

এ কথা বলার পরই বলেছেন--

আমি সেই বিচিত্রের দূত।... যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে, চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখ-দুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে— তাঁর বিচিত্র-রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপক-গুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।[২]

কবির এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে যে, তাঁর শিল্পচর্যার মূলকথাই হচ্ছে 'বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে' তোলা। রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব-বিশ্লেষণে এইটেই মূলসূত্র বলে ধরা যেতে পারে, অন্তত পক্ষে কবির নিজের উক্তি হিসেবেও তার তাৎপর্য গভীর। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-শিল্পসাধনা সেই বিচিত্র রূপ ও রসেরই প্রকাশ— কাব্যে নাটকে গানে নৃত্যে চিত্রে। জীবনের সীমান্তে পৌঁছে কবির এই উপলব্ধি বা স্বীকারোক্তি নিছক অনুভবমাত্র নয়, তাঁর সমগ্র সৃষ্টিরও মূলকথা। কবি-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির বিচিত্র ধারাকে যদি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করি তা হলে দেখা যাবে— এক-একটি নির্দিষ্ট ধারা নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট রূপে

রূপায়িত হতে হতে বিশেষ একটি প্রান্তভূমিতে মিলিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসাধনার মূলসুরের কথা[৩] বলতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে গতিশীল জীবনবোধ। সেইজন্যে সার্থক বলা হয়েছে 'কাব্যপ্রবাহ' বা 'নাট্যপ্রবাহ'। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের গানেরও-যে একটা নির্দিষ্ট প্রবাহ আছে, সে কথাও স্বীকার করতে হয়। প্রবাহ কথাটা আদৌ বাহুল্য নয়, কেননা, কাব্য-নাটক-গানের সুস্পষ্ট ভাবেই একটি ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বলা যায় রবীন্দ্র-শিল্পচর্যার একটি সূচনা ও পরিণতি[৪] রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই ক্রমবিকাশ বা পরিণতি অন্তঃস্রোতের মতই শিল্পীজীবনের অন্তরালবর্তী রহস্যঘন ঘটনা। শিল্পীজীবনের মানস-রহস্যের আড়ালে যে রূপরসময় জগতের অস্তিত্ব, তার মুক্তি ঘটে ধীরে ধীরে। তাই বাইরে থেকে তার সবটুকু সহজে বোঝা যায় না। বাইরের কোনো বিশেষ ঘটনা দিয়ে তার সবটুকু বিশ্লেষণও সম্ভব নয়। তা ছাড়া, প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যেই একটা রহস্যের ঘন যবনিকা রয়েছে; সেই যবনিকা আছে বলেই হয়তো দেখার ও জানার শেষ নেই। হয়তো তাই মানুষের মনে জাগে অনন্ত জিজ্ঞাসা। শিল্পীর জীবনও এমনি রহস্যময়। যখন তিনি শিল্পসাধনার পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকেন, তখন সেই পথ-পরিক্রমার সবটুকু খবর কি তাঁরই জানা থাকে? হয়তো থাকে না। তার পর যখন তিনি সত্যিই কোনো-একটা সিদ্ধিতে বা পরিণতিতে পৌঁছান তখনই চোখে পড়ে পিছনের ফেলে-আসা পথের ছবি; তখনই মনে হয় যে, মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘটনাই মানুষের জীবনকে একটি বৃহত্তর তাৎপর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনও এমনি রহস্যময়, তাৎপর্যময়। আর সে কথা তিনি নিজেও বলেছেন।[৫]

যা গতিশীল, একমাত্র তারই বিকাশ, অর্থাৎ সূচনা স্থিতি প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি থাকে। রবীন্দ্র-শিল্পসাধনা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা চলিষ্ণু গতিশীল বলেই 'বিচিত্রের দূত' হতে পেরেছেন তিনি, 'বিচিত্র রূপকগুলিকে' অন্বেষণ করে সেগুলি সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই বিচিত্রকে খুঁজেছেন, বৈচিত্র্যকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। কাব্যের, নাটকের, সঙ্গীতের বিবর্তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই বৈচিত্র্য-পিপাসু মনটিকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়! এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' থেকে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই এক বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট শিল্পচেতনাও অনুভব করা সম্ভব।

এই বিশিষ্ট শিল্পচেতনার মূলকথা ছন্দোবোধ। বিশ্বের প্রাণ-প্রবাহ ছন্দ-বিধৃত। কবি বারবার বলেছেন যে, বিশ্বসৃষ্টির এই-যে প্রবাহ বা লীলা— তার মধ্যে রয়েছে এক মহাছন্দ। সেইজন্যেই বিশ্বের সব-কিছু গতিশীল, প্রাণবান এবং রূপময়। সামান্য তৃণ থেকে শুরু করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত সব-কিছুই চলিষ্ণু, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারা বারবার নতুন হয়ে চলেছে বলেই সৃষ্টিলীলা বজায় থাকছে এবং এই-যে চলা— তার মধ্যে আছে এক মহাছন্দ। তিনি অনুভব করেছেন যে, বিশ্বগীতি এই মহাছন্দের অনুশাসনে বাঁধা পড়েছে।[৬] এমনও অনুভব করেছেন— ছন্দের মধ্যে দিয়েই সমস্ত জগতের, সমস্ত বিশ্বের প্রকাশ।[৭]

৩

কবির এই যে ছন্দোবোধ, তার স্বরূপ কী? অর্থাৎ কবির ছন্দ-চেতনার স্বরূপ কী? প্রাসঙ্গিকবোধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল :

ক. হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলো।[৮]

খ. সুর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি সংগীতের দুই অংশ।... অনন্ত আকাশ জুড়িয়া চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহাসংগীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়। ছন্দ সংগীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্বিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে, বাইরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করিয়া দেয়।[৯]

গ. সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সমবেত বেগটাকে গতিদান করে।[১০]

ঘ. নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুলভার হাল্কা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নট বালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।[১১]

ঙ. বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়সম্পত্তির দিক নয়; যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে নৃত্য গীত বর্ণ গন্ধ, যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে ওঠে, যেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারই জবাব দিতে দিতে পথ চলে: তেমনিতরোই গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গিতে।[১২]

চ. কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে। মানুষের সকল ঘটনারই বাহ্যরূপ চলাফেরায়। কোনো-একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান করতে চাইলে তার চলাফেরাকে ছন্দের সুষমাযোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সংগত।[১৩]

ছ. মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ সুখ-দুঃখের আবেগে নানা-প্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলেছে, তার সমস্তটা

যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয়, তা হলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে। তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবল-মাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার ক'রে তাকে প্রবলবেগে জাগিয়ে রাখে।[১৪]

জ. এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া সে তাঁরই নাচের ছন্দে...[১৫]

ঝ. এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারি দিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না ; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারি দিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা।[১৬]

ঞ. ওরা অঙ্গভঙ্গির লতানে রেখা দিয়ে সুরের উপর নক্‌সা কাটতে থাকে।[১৭]

এই দৃষ্টান্তগুলির দিকে লক্ষ রেখে বলতে পারি, মূলতঃ ছন্দ বলতে কবি এমন-এক জীবনীশক্তিকে বুঝিয়েছেন যা বস্তুকে জীবন্ত করে তোলে, জড় পদার্থকে প্রাণময় করে, রূপময় বা রসময় করে। অর্থাৎ কবির এই ছন্দোবোধের মূলকথা হচ্ছে গতিময়তা। এই গতিময়তা সৃষ্টি হয় অন্তর-বাহিরের সংঘাতে বা মিলনে। কবি বলতে চান, বিশ্বলীলার মূলকথাই হচ্ছে গতিশীল জীবনপ্রবাহ, এবং ছন্দ হচ্ছে এমন এক সোনার কাঠি, যার স্পর্শে সমস্ত রূপ-

জগৎ জেগে ওঠে। কবি এই ছন্দ প্রসঙ্গে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—

> What is rhythm? It is the movement generated and regulated by harmonious restriction. This is the creative force in the hand of the artist. So long as words remain in uncadenced prose form, they do not give any lasting feeling of reality. The moment they are taken and put into rhythm, they vibrate into a radiance.[১৮]

অর্থাৎ ছন্দের স্পর্শে এক দিকে বস্তু যেমন গতিশীল হয়, তেমনি জড় পদার্থ হয় জীবন্ত। শিল্পের দিক থেকেও বলা যায়, এই ছন্দই সেখানে প্রবহমান থেকে শিল্পসৃষ্টিকে প্রাণময় জীবন্ত করে তোলে।

এই ছন্দোবোধ থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক ও সঙ্গীত -সৃষ্টি হয়েছে, তা বোধ হয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। শুধু তাই নয়— কবির সত্তর বৎসর বয়সের সৃষ্টি ছবির মধ্যেও এই চেতনা ফুটে উঠেছে। অন্য নানা দিক থেকে ত্রুটি থাকতে পারে কিম্বা রূপসৃষ্টির চিরায়ত পরম্পরার সঙ্গে না মিলতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক ভঙ্গীর দিক থেকে তা ছন্দোময়। আচার্য নন্দলাল বসুও বলেছেন-- রবীন্দ্রনাথের চিত্রের মূলকথা ছন্দোময়তা।[১৯] স্বয়ং কবিও এ সম্বন্ধে সচেতন—

> The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The universe has its only language of gesture, it talks in the voice of picture and dance.[২০]

দেখা যাচ্ছে, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত এবং চিত্র পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে আপন আপন ছন্দোময়তাকে অবলম্বন করেই বিবর্তিত। আশ্রয় ও

উপায়-উপকরণের পার্থক্যবশতঃ নিঃসম্পর্কিত বা পরস্পর-নিরপেক্ষ বলে মনে হতে পারে, বস্তুতঃ একই তাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম।

এ কথা নিশ্চিত, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিল্পচেতনার মূলে রয়েছে এই ছন্দোবোধ। রবীন্দ্র-প্রতিভা-সৃষ্ট কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, চিত্র, এবং নৃত্য এই বোধের দ্বারাই বিধৃত।

অবশ্য, কবির এই ছন্দোবোধ উপলব্ধি মাত্র: যে সত্যকে তিনি বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনুভব করেছেন, তা অন্য দিক থেকে শিল্পেরও সত্য। কাজেই যে ছন্দ-প্রবাহ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, সেই ছন্দই লুকিয়ে আছে শিল্পে। ছন্দই শিল্পের প্রাণ। শিল্প কোনো বিশেষ রূপে প্রকাশিত। রূপ হচ্ছে ছন্দেরই ইন্দ্রজাল, রূপের পরিণতি রসে। বলতে পারি ছন্দ হচ্ছে ঢেউয়ের মত, তাতে রূপ ভেসে ওঠে। রস থাকে অন্তরালে, কবির মানসলোকে; তার পর কতকগুলি রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। রস সূক্ষ্ম প্রেরণারূপে শিল্পী-চিত্তে জাগ্রত থাকে, তখন কোনো-এক ছন্দ অবলম্বন করে রূপ ভেসে ওঠে, রূপসৃষ্টি হয় এবং সব-শেষে রসে পরিণতি ঘটে। অর্থাৎ যে রস শিল্পী-মনের অন্তরালে ছিল, তা রসিকের মনে ভেসে ওঠে। রস যে শিল্পবস্তুতে আবদ্ধ তা নয়, উপরন্তু তা বিশ্লেষণের অতীত। শিল্পীর ছন্দোময় রূপসৃষ্টির দ্বারা রসিকের চিত্তে রস উদিত হয়। তাই বলা যায়, রস যেমন সূচনায় তেমনি শেষেও থাকে। শিল্পসৃষ্টিতে যা বিশ্লেষণ করা যায় তা হচ্ছে রূপ ও ছন্দ। এই ছন্দ যিনি ধরতে পারেন, তিনি অচলকে (যেমন চিত্র, মূর্তি) চলিষ্ণু দেখাতে পারেন, অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন। এমনকি অরূপকেও রূপ দিতে পারেন। শিল্পক্ষেত্রে যাকে বলি ছন্দ, জীবনে তাকেই তো বলি প্রাণ। জীবনে রয়েছে রূপ এবং সে রূপ প্রাণের দ্বারা বিধৃত, বিকশিত এবং চলিষ্ণু। জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত চলেছে

প্রাণই একাধারে রূপ ও অরূপ, একাধারে বস্তুময় ও নির্বস্তু। শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। তাই বলছি— রূপ ও রস ছন্দের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত হয়। কবি তাঁর অনুভূতি দিয়ে এই ছন্দকে ধরতে পেরেছিলেন এবং সেই নিঃশব্দ নির্বস্তু ছন্দকেই রূপে ধরতে চেয়েছেন, এমন কথা বলা চলে: অর্থাৎ রবীন্দ্র-শিল্প এই ছন্দোবোধেরই রূপায়ণ।

এ কথা বোঝা গেল যে, মানুষের জীবন প্রাণময় বলেই গতিশীল, বিশ্ব চলিষ্ণু ছন্দোময় বলেই। কিন্তু তার লক্ষ্য কী? কবি বলছেন, আনন্দ।[২১] কাজেই যদি বলি— কবির শিল্পচর্যার মূলকথা ছন্দোবোধ, তবে তার সঙ্গে আর একটু যোগ করা উচিত— এর মধ্য দিয়ে জীবনের আনন্দময় অমৃতময় রূপটিকেই কবি রূপ দিতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, এমনকি নৃত্যেরও অনুশীলন এই চেতনার আলোকে সন্দীপ্ত। এগুলি বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র পথে বিশেষ বিশেষ ছন্দকে আশ্রয় করে বিবর্তিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, এগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোনোটার সঙ্গে কোনোটার যোগ নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বরং মনে হয়, একটার সঙ্গে অপরটির গভীর যোগ রয়েছে এবং বিচিত্র পথে চলতে চলতে অবশেষে সবগুলি ধারা একটি প্রান্তভূমিতে মিলিত হয়েছে— সেই প্রান্তভূমি হচ্ছে নৃত্যনাট্য। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে কাব্য, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যের ছন্দগুলি একটি একক অবিভাজ্য ছন্দোময়তায় পরিণতি লাভ করেছে। নৃত্যনাট্যে সেই স্থায়ী পরিণতি। সৃষ্টিশীল কবিজীবনের সেই 'সম' বা 'শম', যেখানে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির সামগ্রিক তাৎপর্য সহসা উদ্ভাসিত।

৪

বিশিষ্ট এবং নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের পর, রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্যার আদিতে রয়েছে গীতিনাট্য এবং শেষপ্রান্তে নৃত্যনাট্য। বাইরে থেকে দেখলে এই সন্নিবেশ অর্থহীন বা তাৎপর্যহীন মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এর মধ্য দিয়ে এক গভীর তাৎপর্যই ফুটে উঠেছে। যে ছন্দোবোধের কথা বলেছি, তা গীতিনাট্য থেকে কী ভাবে ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত নৃত্যনাট্যের মধ্যে রূপায়িত, ভেবে দেখতে গেলে, সেই বিবর্তনের ইতিহাসটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অর্থময়।

বস্তুতঃ, এ কথাই মনে হয় যে, এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা ও পরিণতিকে দেখতে পাচ্ছি। তাই সুস্পষ্ট-ভাবেই বলা চলে, সূচনায় গীতিনাট্যকে না পেলে পরিশেষে নৃত্যনাট্যকেও ঐরূপে দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ। শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে একটি ধারাবাহিক ছন্দ-চেতনার সন্ধান পাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, শেষ পর্যায়ে পৌঁছে কবির চেতনা নটরাজের কল্পনায়[২২] নিমগ্ন এবং তারও মূলে আছে ঐ একই অনুভূতি। কেননা, নটরাজের মূর্তি-কল্পনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ঐ সঞ্জীবনী শক্তি বা ছন্দোময়তাই রূপায়িত।[২৩]

এজন্যই বলেছি, রবীন্দ্র-শিল্পসৃষ্টির দুই প্রান্তে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের এই সংস্থান আকস্মিক কোনো ঘটনামাত্র নয়, বরং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। গীতিনাট্য-রচনার পর থেকে কবি স্বতন্ত্রভাবে কাব্য নাটক সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুশীলন[২৪] করেছেন সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি একটি আধারে মেলবার জন্যেই এগিয়ে গিয়েছে যেন তাঁর অজ্ঞাতসারে। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি

বুঝলেন যে, একমাত্র নৃত্যনাট্যই হচ্ছে সেই শিল্পরূপ, যার মধ্যে কথা সুর নৃত্য ও অভিনয়ের ছন্দ মিলতে পারে একটি অবিচ্ছেদ্য 'একক' ছন্দে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্যা শেষ পর্যন্ত অবিভাজ্য ছন্দোময়তায় উত্তীর্ণ হল।

এমনি করে নানা যুগের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৌর্যত্রিক[২৫] সঙ্গীতের বিশ্লিষ্ট রূপটি পুনরায় সার্থকভাবে সম্মিলিত ও রূপায়িত হয়েছে; আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এমন একটি সুমিত শিল্পরূপ-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঐ অবিভাজ্য ছন্দোময়তা কী ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা এই আলোচনার মূল সুর; সমগ্র আলোচনা এই তত্ত্বেরই প্রকাশ। পরবর্তী আলোচনার মধ্যে এই তত্ত্ব বা সূত্রটি ব্যাখ্যা ও অনুসরণ করা হয়েছে। এ দিকে লক্ষ রেখেই, পারম্পর্য বজায় রেখে, সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা না বললেই নয়। এপর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে; রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধেও প্রামাণিক আলোচনার অভাব নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাট্য ও নৃত্যনাট্যের সুসম্পূর্ণ বা ব্যাপক আলোচনা হয় নি যদি বলা যায়, তা হলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সাম্প্রতিক কালে এগুলির আনুষ্ঠানিক প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার ফলে অনেকের মধ্যেই এ বিষয়ে আলোচনার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনাও হয়ে থাকে। সেই-সব আলোচনার মননশীলতা ও রসবিবেক সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করেও বলতে হচ্ছে, সেগুলি যতটা সাহিত্যের বা রসের দিক থেকে আলোচনা, ততটা আঙ্গিক বা প্রযুক্তিগত নয়। অথচ এ বিষয়ে

আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন এবং সুযোগ রয়েছে। ঠিক এই কারণেই আমার দৃষ্টি প্রধানতঃ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ও আলোচনার দিকে এবং সেই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই আমার মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছি।

এই আলোচনার কাজে নেমে দেখা গেল, অব্যবহৃত বেশ-কিছু নূতন তথ্য ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তার সবগুলিই যে সংগ্রহ করতে বা কাজে লাগাতে পেরেছি, এমন দাবি নেই—তবে কিছুটা অন্তত কাজে লাগিয়েছি, এমন কথা হয়তো বলা যায়। সর্বোপরি, ইতিহাসের ধারা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে দিকেও দৃষ্টি রেখেছি এবং সমগ্র আলোচনাটি সেইভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু বিন্যস্ত :

১. প্রথম অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য ও বাল্মীকি-প্রতিভার পটভূমি।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় : গীতিনাট্যের পর্যালোচনা।

৩. সেতুবন্ধ : গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যবর্তী পর্বের আলোচনা।

৪. চতুর্থ অধ্যায় : নৃত্যনাট্যের আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পটভূমির স্বরূপ-বিশ্লেষণ। এরই সূত্র ধরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি—পূর্বোক্ত তত্ত্বটির প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছে এই গীতিনাট্য-গুলি। তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণের দিকে দৃষ্টি রাখলেই বোঝা

যাবে, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যবর্তী পর্বটি আসলে এ-দুইয়ের যোগসূত্রের ইঙ্গিত করছে এবং বলা যায়, এটি হচ্ছে প্রস্তুতি-পর্ব, যে পর্বে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ হয়েছে নানা পথে। অথচ, সেগুলি নানা দিক থেকে অবশেষে একটি প্রান্তে মিলিত হবার জন্যেই যে যাত্রা করেছে, সেকথা ব্যাখ্যা করবার জন্যেই এই অধ্যায়ের অবতারণা। চতুর্থ অধ্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে রবীন্দ্র-নৃত্য-নাট্যগুলির ব্যাপক বিশ্লেষণ। পূর্বালোচিত অধ্যায়গুলির সূত্র ধরে অবশেষে মূলতত্ত্বটির তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কে এই পূর্বভাষণ মূল আলোচনার অবতরণিকা-স্বরূপ।

উল্লেখপঞ্জী

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৫ সংখ্যক পত্র।

২ আত্মপরিচয়। ৪ সংখ্যক প্রবন্ধ।

৩ জীবনস্মৃতি। এই তত্ত্বটি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৪ 'পরিণতি' কথাটা এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ যেখানে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বস্তুতঃ, পরিণতি শব্দটির অর্থ পরিপূর্ণ বিকাশ নয়। কেননা 'শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে।'

৫ আত্মপরিচয়। ১ম প্রবন্ধ।

৬ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। প্রভাতসংগীত।

৭ শেষ কবিতাংশ : 'বাল্মীকি-প্রতিভা'।

৮ পাগল। বিচিত্র প্রবন্ধ। ১২৯১ সাল।

৯ পঞ্চভূত (১৩০৪)। গদ্য ও পদ্য (১২৯৯)

১০ ছন্দ (চৈত্র ১৩২৪)। ছন্দের অর্থ।

১১ রক্তকরবী (১৩৩৩ । ১৯২৬)

১২ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি (১৩৩৩ । ১৯২৭) : যাত্রী।

১৩ জাভাযাত্রীর পত্র (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ । ১৯২৭)

১৪ তদেব

১৫ তদেব

১৬ শান্তিনিকেতন। সামঞ্জস্য (১১-১২শ খণ্ড)। রবীন্দ্র রচনাবলী ১৫শ খণ্ড।

১৭ পথে ও পথের প্রান্তে (১৩৪৫)

১৮ The Religion of An Artist (ch. II, April 1926)

১৯ গুরুদেবের আঁকা ছবি। রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড।

২০ পুস্তিকা (Paintings and Drawings by Rabindranath Tagore : Exhibition, June 16th to June 30th 1955, at Academy of Fine Arts) থেকে গৃহীত।

২১ স্মরণীয়—'পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়' (বলাকা : চঞ্চলা)। সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রেও কবির বক্তব্য অনুরূপ।

২২ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড— শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশেষ দ্রষ্টব্য 'নটরাজ ১৯১৭'। রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড— শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

২৩ নটরাজ মূর্তি-কল্পনার মধ্যেও বিভিন্ন যুগ বা অঞ্চল নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকের H. Zimmer রচিত *The Art of Indian Asia,* Vol II গ্রন্থের নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল :

২২৩, ২২৬, ২৩১ (২৩২), ২৩৮, ২৫৬ (২৫৮), ২৬০, ২৬৪। নটরাজ মূর্তি-কল্পনা প্রসঙ্গে *The Dance of Siva* গ্রন্থে A. Coomerswamy বলেন, "No doubt the root idea behind all of these dances is more or less one and the same, the manifestation of primal rhythmic energy. এবং H. Zimmer বলেন, "Vigorous and dynamic, though without the weight and compactness of an early warrior, the beautiful apparition dashes from the

background of the relief with the lightness and irresistible power of a lightening flash in a swift triumphant gesture devoid of static substantiality. Energy is suggested in the background inclination of the shoulders and in the tension of the outlining curve."—*The Art of Indian Asia*, Vol I, p 12.

২৪ 'নৃত্যের অনুশীলন' শব্দটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা উচিত। শেষ পর্যায়ে নৃত্যরসে কবির চেতনা এমনিই আচ্ছন্ন যে, তিনি 'নৃত্য' শব্দটি নানা লেখার মধ্যে যে কোনো প্রসঙ্গে ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

২৫ 'শেষকথা' অংশে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখানে শব্দটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হল মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

প্র থ ম অ ধ্যা য়

উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য

বাল্মীকি-প্রতিভার পটভূমি

গীতগোবিন্দে যার সূত্রপাত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যার ক্রমোত্তরণ এবং যার উপাদানগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়েছিল সার্থক আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়— য়ুরোপীয় অপেরার আদর্শ-অনুসরণে বাংলার সেই গীতিনাট্য উনিশ শতকের শেষদিকে এক নতুন রূপ নিল: তাকে কেউ বলেছেন নতুন যাত্রা, সখের যাত্রা বা গীতিনাট্য; কেউ বলেছেন গীতাভিনয় বা অপেরা (অনেক সময় ঠাট্টা ক'রে 'অপ্পেয়েরা'[১])। এর পাশাপাশি সমার্থক নাট্যরাসক শব্দটিও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরণের গীতিপ্রধান নাটকের ধারা অন্যত্রও চোখে পড়ে; যেমন— অসমীয়া 'অংকীয়া নাট', নেপালে প্রচলিত প্রাচীন গীতিনাট্য, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট প্রদেশে প্রচলিত এক ধরণের নৃত্যাভিনয় ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবক্ষয়ের যুগ বলে স্বীকৃত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যধারা যে বিকৃতি ও স্থূলতা লাভ করেছিল, যার প্রত্যক্ষ ছাপ কবিগানে— উনিশ শতকের প্রথম অর্ধের সাহিত্যে তারই প্রভাব পড়েছিল। বৈষ্ণব-পদাবলীর মধুর রস নয়, শাক্তপদাবলীর ভক্তিরসও নয়, কিংবা নয় গীতিকার সহজ অনাড়ম্বর জীবনের রূপায়ণ— সামগ্রিকভাবে এই পর্বের সংস্কৃতিতে দেখি বিকৃতির প্রলেপ। আর মূলতঃ কলকাতা তার কেন্দ্র। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র[২] মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিছু দৃষ্টান্ত স্মরণ করা গেল:

১. কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ্-আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ করলে। সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন।

—কলিকাতার বারোইয়ারী পূজা

২. ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে টলতে টলতে আসরে নাবলেন। অনেকে আখড়া ঘরে (সাজঘরে) শুয়ে পড়লেন। বাঙ্গালীর স্বভাবই এই, পরের জিনিষ পাতে পড়লে শাঁগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না (পেট সেটি বোঝে না বড় দুঃখের বিষয়!) ডেড় ঘণ্টা ঢোল, বেহালা, ফ্লুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজলো— গোঁড়ারা ঢুশ বাহবাও বেশ দিলেন— শেষে একটি ঠাকরুণবিষয় গেয়ে (আমরা গানটি বুঝতে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হতে পাল্লেম না।) উঠে গেলে চকের দল আসরে নাবলেন।

—কলিকাতার বারোইয়ারী পূজা

৩. খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড় মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলেপুলে, ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ ক'রে খ্যামটা নাচান— কোন খানে কিস্ না দিলে প্যালা খায় ত না—

—কলিকাতার বারোইয়ারী পূজা

৪. এদিকে বাবু ও পেশাদার যাত্রা, পাঁচালী, খেমটা, হাফ-

আখড়াই ও ফুল-আখড়াই দলের তালিম হচ্ছে। অনবরত তানপুরো, সারঙ, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ বাজচে। স্পিরিট, চরস ও গাঁজা অবিশ্রাম চলছে। গায়কদের সাধা গলার সুস্বর চীৎকারে বাক্‌বাণী আর এ তিন দিনও অপেক্ষা কর্ত্তে পাচ্চেন না। আজি যেন আসরে মূর্তিমতী হন হন হয়েচেন।

—সরস্বতী পূজো

বস্তুতঃ গীতিনাট্যের চাহিদা বা জনপ্রিয়তা এক সময় অনেক বেশী ছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে থিয়েটারের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো। অন্যদিকে পাঁচালী, হাফ্-আখড়াই, কবিগান ইত্যাদি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দর্শকের কাছে রুচিকর ছিল না। নাট্যাভিনয় দেখারও তেমন সুযোগ নেই। অভিজাত পরিবারে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিতদের জন্যেই সেগুলি অভিনীত হতো। কাজেই মধ্যপন্থার প্রয়োজন হয়েছিল। নাট্যাভিনয়ের আর্থিক অসুবিধে দূর করবার জন্যই নতুন যাত্রার বা গীতাভিনয়ের বা গীতিনাট্যের উৎপত্তি।[৩] উনিশ শতকের নাটকের ইতিহাস এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত।

গীতিনাট্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে প্রথমদিকে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ১২৮৫ সালের ৯ই মাঘ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

বিগত শনিবার রজনীতে উক্ত জাতীয় নাট্যশালায় আমরা বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। অধ্যক্ষগণ গীতাভিনয়ে সংসারের এবং তৎসহ সাধারণ দর্শকমণ্ডলীর রুচি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা চরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। গত কয় বর্ষ ধরিয়া জাতীয় নাট্যশালায় 'সংস্কৃত যাত্রা',

যাহা অপেরা নামে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে, অধ্যক্ষগণ এক্ষণে তৎপরিবর্তে প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

একথা বলা হয়েছে 'কামিনীকুঞ্জ' গীতিনাট্যের অভিনয় সম্বন্ধে। মন্তব্যে বলা হয়েছে, '... পেশাদার যাত্রার যেমন দুই একটি কথা এবং তৎপরেই গান থাকে, এতদিন সেই প্রণালীর অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতেছিল; অধ্যক্ষসমাজ এক্ষণে ইটালিয়ান অপেরার ন্যায় আদি হইতে অন্ত্য পর্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তর, স্বগত বিলাপযুক্ত প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন।' এই গীতিনাট্য রচনা করেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রচনাকাল ১২৮৫। মোট পাঁচটি দৃশ্য, আগাগোড়া গানে রচিত। কোনো গদ্যসংলাপ নেই। উদাহরণস্বরূপ:

খাম্বাজ। তাল ফেরতা

ললিতা। সইলো! আজি সাজাব যতনে।
ফুলহারে শ্রীরাধারে
আর বাঁকা শ্যামধনে।

বিশাখা। বিকচ কমল ফুলে সাজাব হৃদয় খুলে
জুড়ায় জীবন সখি, নেহারি নয়নে।

চিত্রা। কোমলাঙ্গী শ্রীরাধার সবে না কুসুমভার
বিনাসূতে গাঁথি হার পরাব দুজনে।

কাহিনী এই: রাত্রিশেষে সখীদের সঙ্গে ব্যাকুলা রাধা কৃষ্ণের আগমন প্রত্যাশায় রত। চন্দ্রাবলীর গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে এলে রাধা অভিমানে কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে অনুতাপ এবং মিলন।

য়ুরোপীয় অপেরার আদর্শে 'কামিনীকুঞ্জ'কে পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য বলা যায়। কিন্তু তখনো অনেকের মনে ধারণা ছিল, নাটকে গানের প্রাচুর্য থাকলেই তাকে গীতিনাট্য বলা চলে। পূর্বোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে তাই এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে— 'বলা বাহুল্য, যে, এরূপ প্রথা বঙ্গীয় নাট্য সমাজে সম্পূর্ণ নূতন।' ১১ই মাঘের অভিনয়ের পর সংবাদ-প্রভাকরের সম্পাদকের কাছে একখানি চিঠি প্রেরিত হয় 'কেনচিৎ দর্শকেন।' তাতে দর্শক-মহাশয় অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন, "পরিশেষে এক বিষয় তাঁহাদিগকে একটি সৎপরামর্শ দিতেছি।... যদি 'কামিনীকুঞ্জ' নাট্যরাসক মধ্যে প্রত্যেক গীতের অবসর স্থানে বাক্‌চাতুর্য থাকিত, তাহা হইলে সেদিন নাটকাভিনয় সম্বন্ধে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইত। সম্পাদক টীকাতে বলেন, দর্শক মহাশয়ের রুচি ভিন্ন দেখিতেছি। 'গীতের অবসর স্থানে বাকচাতুর্য' থাকিলে তাহাকে প্রকৃত গীতাভিনয় বলা যায় না। তাহা সংস্কৃত যাত্রা মাত্র। নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিজ্ঞাপন দেন যে, 'কামিনীকুঞ্জ' ইটালিয়ান অপেরা অনুসারে রচিত, বাস্তবিক তাহাই যথার্থ।"

১৮২২, ১৩ই জুলাই (৩০শে আষাঢ়, ১২২৯) তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ এর আগে বলা হয়েছিল— 'নূতন যাত্রা।... নানাপ্রকার রাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্যনৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন, এ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি।' ১৮৫৯-এ রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বলেন, 'গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস পাইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎবৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল।' এই নূতন যাত্রাকেই বলা হয়েছে গীতাভিনয় বা অপেরা— 'আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগে আবার গীতাভিনয় নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরণের

একপ্রকার অভিনয় এ দেশে দেখা দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাদস্তুর নাটকেরই মত ; তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্যপটাদির বালাই ছিল না। নাটকাভিনয় এ দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন সম্ভব ছিল না।'[৪]

অনেকেই ভেবেছিলেন যে, অপেরায় পূর্ববর্তী যাত্রার প্রয়োজন মিটবে।[৫] অবশ্য, তাও শেষে প্রহসনের রূপ নেয় এবং সুরুচিকর নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে।[৬]

দেখা যাচ্ছে, এই শতকের সপ্তম-অষ্টম দশক পর্যন্ত পুরোনো ধারার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যাত্রার যেমন উদ্ভব হয়েছে, তেমনি এরই পাশাপাশি ছিল থিয়েটার। কবিগান যদিও তখন জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছে, তথাপি, নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে তার প্রভাব বর্তমান ছিল ; গীতিনাট্যের সুরু থেকেই— আঙ্গিকের দিক থেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসারী হলেও, সেই অশ্লীল রুচি তার মধ্যে বিশেষভাবে ছায়াপাত করে। অন্যদিকে, ক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না ব'লে থিয়েটারও পুরোপুরি অগ্রসর হবার পথ পায় নি। এর মধ্যে দিয়েই উনিশ শতকের গীতিনাট্যের জন্ম। থিয়েটারের প্রয়োগকলা ও যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল এই গীতিনাট্যের উপজীব্য। এই গীতিনাট্যকে আবার দুভাগে ভাগ করা চলে— ১. যেগুলি আদ্যন্ত গানে বাঁধা, ২. যেখানে গানের প্রাচুর্য, কিন্তু সংলাপ গদ্যে অথবা পদ্যে। বলা বাহুল্য, দুটি রীতিকে গীতিনাট্য বলা হলেও, প্রথম ধারাকেই যথার্থ গীতিনাট্যের আখ্যা দেওয়া চলে। হরিমোহন রায় রচিত 'মানিনী' (১২৮৬) গীতি-নাট্যের ভূমিকার মধ্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে :

"অপারা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল আমি 'জানকী বিলাপ' নামে একখানি গীতিকা রচনা করি।... তৎকালে 'জানকী বিলাপ'খানি কথঞ্চিৎ অপারার আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল।... 'সতী কি কলংকিনী' যদিও বিশুদ্ধ অপারা নহে, তত্রাচ অভিনয় মন্দ হয় নাই।... আমিও যে 'মানিনী'র সমুদয় অঙ্গ বিশুদ্ধরূপে সুসজ্জিত করিয়াছি তাহাও বলিতে পারি না, কারণ, বঙ্গদেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে ততদূর আশা করা যায় না। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে 'অপারা' যে প্রণালীতে রচনা করা আবশ্যক তাহার কিছুমাত্র ক্রটি করি নাই।" প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, গীতিনাট্যের মধ্যে যুগপৎ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত, পাশ্চাত্য ঐকতান এবং নৃত্যের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী, কালু-ভুলুর হীন কদর্য নৃত্য (?) সৌভাগ্যবশতঃ পরীস্থানের রুচিকর নৃত্যের দিকে ঝুঁকেছিল। এর থেকে একথাই বলা যায়, বাংলা গীতিনাট্য ধীরে ধীরে সংহতির পথে চলেছিল। পূর্বতন নাট্যগীতির ধারাটি নতুন ভাবে এ যুগের গীতিনাট্যের মধ্যে দানা বাঁধবার সুযোগ পেল।

এই গীতিনাট্যের ধারাটির পরিচয় দেবার জন্যে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রকাশকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল :

১৮৬৫ শকুন্তলা— অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬৫ রত্নাবলী— হরিমোহন রায়
১৮৬৬ শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান— পূর্ণচন্দ্র শর্মা
১৮৬৭ সাবিত্রী সত্যবান— তিনকড়ি ঘোষাল
১৮৬৯ চণ্ড কৌশিক— অজ্ঞাতনামা

১৮৭০ মালতীমাধব— নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭১ মৈথিলীমিলন— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৭২ ধ্রুবচরিত্র— নিমাইচাঁদ শীল
১৮৭৩ ভারতমাতা— কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অক্রুর সংবাদ— হরনাথ মজুমদার
১৮৭৪ সতী কি কলংকিনী— নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রজত গিরিনন্দিনী— হরচন্দ্র ঘোষ
ঊষাহরণ— অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭৫ পারিজাত হরণ— নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কনকপথ— হরলাল রায়
মানভিক্ষা— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
পতিব্রতা— রাজকৃষ্ণ রায়
১৮৭৬ আদর্শ সতী— অতুলকৃষ্ণ মিত্র
প্রণয় কানন— অতুলকৃষ্ণ মিত্র
আগমনী— অতুলকৃষ্ণ মিত্র
মাল্যপ্রদান— হারাণচন্দ্র ঘোষ
১৮৭৭ আনন্দমিলন— রামতারণ সান্ন্যাল
আগমনী— গিরিশচন্দ্র ঘোষ
অকালবোধন— গিরিশচন্দ্র ঘোষ
১৮৭৮ কামিনীকুঞ্জ (১২৮৫)— গোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রভাত কমল (১২৮৫)— রামতারণ সান্ন্যাল
দোললীলা— গিরিশচন্দ্র ঘোষ
কনকপ্রতিমা— অতুলকৃষ্ণ মিত্র
অনলে বিজলী— রামকৃষ্ণ রায়
কৈলাস কুসুম— কুসুম দাসী

১৮৭৯ প্রেম পারিজাত— প্রমথ মিত্র
কৈলাস কুসুম— নগেন্দ্র ঘোষ
কনক কানন— বিনোদবিহারী দত্ত
নিকুঞ্জ কানন— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
বসন্ত উৎসব— স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮৮০ আগমনী— অতুলকৃষ্ণ মিত্র
অপ্সর কানন— অতুলকৃষ্ণ মিত্র
উষাহরণ— রাধানাথ মিত্র
বসন্তলীলা— কুঞ্জ বসু
নন্দোৎসব— প্রিয়নাথ রায়
দানলীলা, প্রমীলার পুরী— নগেন্দ্র ঘোষ
রামলীলা— রামতারণ সান্ন্যাল
মানময়ী— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৮১ শর্মিষ্ঠা — অজ্ঞাতনামা
কাঞ্চনকুসুম— কুঞ্জ বসু
মায়াতরু—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মোহিনী প্রতিমা— গিরিশচন্দ্র ঘোষ
অহল্যা হরণ — বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বাল্মীকি-প্রতিভা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই তালিকা থেকে গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী যাত্রার মধ্যে দেখা যায়, রামায়ণ-মহাভারত, অথবা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনের প্রয়াস। অবশ্য সামাজিক কাহিনীও কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সমসাময়িক কালের নাট্যধারার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা

যাবে, বিষয়ের বা কাহিনীর দিক থেকে দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য রয়েছে। নাটকে অবশ্য ঐতিহাসিক কাহিনীও স্থান পেয়েছে গীতিনাট্যে তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। অর্থাৎ আঙ্গিকের দিক থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও, উপজীব্য হচ্ছে দেশীয় প্রাচীন কাহিনী,— নতুন আধারে পুরোনো রস বিতরণ।

উনিশ শতকের গীতিনাট্যের আঙ্গিকগত যে দুটি রীতির কথা বলা হয়েছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

ক. সংলাপ অংশ গদ্যে, মাঝে মাঝে গান :

কৃষ্ণ। প্রিয়ে আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে

রুক্মিণী। নাথ তোমার আবার ভয় কি—যাহ'তে ভয়ের উৎপত্তি, ভয় তার কি করতে পারে বল।

কৃষ্ণ। আমি সে ভয়ের কথা কচ্চি না, এ আর এক রকম

রুক্মিণী। ভয়ের তো কমবেশী শুনেছি, এর যে আবার রকম রকম আছে তা তো জানিনে,—সে যাই হোক তোমার এ কি রকম ভয়।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে এ বড় বিষম ভয়, এ ভয়ের কথা মনে হলে ভয়েরও ভয় জন্মায়।

গানের নমুনা :

রুক্মিণী। কেন কর ছলনা
সদা মগন কার ভাবে নাথ বল না।
কেন হে চাতুরী
বারবার পাইয়ে ললনা।

(পারিজাত হরণ। ১৮৭৫। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

খ. পিলু বারোঁয়া। ঠুংরী

সীতা। আগে এত ভাবিলে মনে
তবে কি দহিত দেহ বিরহদহনে॥
রাম। আগে তা কি জানি মনে, হারাইব তোমা ধনে,
সীতা। তাই বুঝি প্রাণপণে রাখিবে হে যতনে॥
রাম। বিধাতা সাধিলে বাদ, প্রমোদে ঘটে প্রমাদ,
সীতা। তবে মিলনের সাধ, বল করি হে কেমনে॥
(জানকী বিলাপ। হরিমোহন কর্মকার ১২৭৪

গ ইমনকল্যাণ। আড়াঠেকা

বৃন্দে। কেন হে নাগর, রায়
বাঁশরিটি ধরে সুমধুর স্বরে
ডাকিতেছ শ্রীরাধায়।
কুলের কামিনী, রাধা বিনোদিনী
মরে গুরু গঞ্জনায়।

ইমনকল্যাণ

ললিতা। ওহে শ্যাম এ তোমার ব্যাভার কেমন,
রাধা বলে কেন ডাক যখন তখন ?

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি

কৃষ্ণ। সখি! কি দোষ আমার
রাধা নামে সাধা বাঁশি বাজে অনিবার।
সখি সদা মনে করি বাজাব না নাম ধরি
এমন নিলাজ বাঁশি কোথা আছে আর ?

ঝিঁঝিট

এমন নিলাজ বাঁশি সজনি,

না বাজালে তবু বাজে অমনি !

(মানিনী। হরিমোহন রায়)

এর সঙ্গে তৎকালীন গীতিনাট্যে ব্যবহৃত কিছু গানের নমুনাও উল্লেখযোগ্য :

ক. আক্কুটে সব আগেই খেলে,
রোপ্‌টে বেড়াই বাদাড় পানে।
দাঁটার জোরে বাগাই বাগা,
বাঁশির শরে বন হরিণে।
তীর কানটায় মারি হাতী
খোঁচায় ভঁইস বরা গাঁথি
(ধরি) সাতনালায় পাখ্‌ গহন বনে।

(হরি অন্বেষণ)

খ. মদন পীড়নে দেব সইতেছি যাতনা
ঘুচাও অন্তরে সুখ সাধ মম সাধনা।
নানা রঙ্গে অনঙ্গ
দহিছে দেখ অঙ্গ,
করিতেছে আশা ভঙ্গ, সহেনা এ বেদনা।

(প্রভাতকমল)

গ. প্রথম যোগিনী। আমার যেমনি বেণী, তেমনি রবে
চুল ভেজাব না।
দ্বিতীয়। আমি খুব ডুব দেব সই
তোর সলা তো শুনবো না॥
তৃতীয়। আমি জল ছেটাব, ছড়াব
তোদের গায়ে দেব ;

প্র-দ্বি। আমরা তবে চলে যাব, জলে নাবো না,
সকলে। আর ভাই সাঁতারে সাঁতারে,
এপারে ওপারে করি আনাগোনা॥

(ব্রজলীলা। ১২৮৯। অমৃতলাল বসু)

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণে গীতিনাট্যের সাধারণ চেহারাটি অনুমান করা সম্ভব। প্রথমেই মনে হয়, 'সংবাদ প্রভাকরে'র চিঠির প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলছি, গীতিনাট্য সম্বন্ধে রচয়িতাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অধিকাংশ গীতিনাট্যই গীতিবহুল গদ্যময় সংলাপ-রীতির অনুসারী। এমনকি গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্যের মধ্যেও তাই দেখি। ভাষার দিক থেকে গদ্যসংলাপ কথ্যরীতির অনুসরণ করেছে। তৎকালীন কলকাতার কথ্যভাষাই তার আদর্শ। তা ছাড়া গানের ভাষার মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রাসের, দাশুরায়ের পাঁচালি বা কবিগানের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। অবশ্য, এরই পাশাপাশি তৎসম শব্দঘেঁষা গানেরও অভাব নেই। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বলতে হয়— সুযোগমত প্রায় সর্বত্রই সস্তা হাল্কা পরিহাস, এক কথায়, অশ্লীলতার অবতারণা করা হয়েছে। প্রত্যেক গীতিনাট্যেই একদল সখী বা সহচরীর ভূমিকা রয়েছে, যারা অনঙ্গদেবকে রসিয়ে রসিয়ে দর্শকের কাছে উপস্থিত করেছে।[৭] অর্থাৎ সর্বত্রই নিম্নরুচির আদিরসের প্রকাশের প্রয়াস। তা ছাড়া শৃঙ্গারমূলক দৃশ্যেরও অবতারণা করা হয়েছে। সখী ও নায়িকাদের মধ্যে যে ধরণের অশোভন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে এ কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, যে, তৎকালীন সমাজের চারদিকে এমনি এক আব-হাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে নব্যবাবু সমাজ, অভিজাত সমাজ, অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের কদর্যজীবন — তারই ছবি গীতিনাট্যের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কাহিনীর মধ্যে কোনো একটা ভাবাদর্শ

প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নেই তা নয়, তবে তার আবেদন নিতান্তই ম্লান। এটা কি তৎকালীন প্রহসনের প্রভাব? হয়তো তাই। প্রহসন, নাটক বা গীতিনাট্য যাই হোক না কেন, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সর্বত্রই যথার্থ গভীর শিল্প-চেতনা বা রসবোধের অভাব। বানের জলে অনেক নোংরা থাকে। তাই লোকরঞ্জক সাময়িক আবেদন ছাড়া এগুলির অন্য কোনো সাহিত্যমূল্য স্বীকার করা চলে না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, প্রতিটি গীতিনাট্যেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত। রামতারণ সান্ন্যাল প্রমুখ সুরকার বা গীতিকার রাগসঙ্গীতেরই আশ্রয় নিয়েছেন। এইসব গীতিনাট্যের মধ্যে নিম্নোক্ত রাগ-রাগিণীগুলি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত :

১. ইমনকল্যাণ ২. ঝিঁঝিট ৩. পিলু ৪. খাম্বাজ ৫. বারোঁয়া ৬. বাহার ৭. লুম ৮. বিভাষ ৯. যোগিয়া ১০. সিন্ধু ১১. ভৈরব ১২. ভৈরবী ১৩. শংকরা ১৪. কালাংড়া ১৫. টোড়ি ১৬. আলাইয়া ১৭. আড়ানা বাহার ১৮. সারং ১৯. পরজ-কালাংড়া ২০. কুকুভ ২১. ললিত ২২. সাহানা ২৩. জয়জয়ন্তী ২৪. মল্লার ২৫. হাম্বীর ২৬. পরজবাহার ২৭. মূলতান-খাম্বাজ।

এর সঙ্গে নিম্নলিখিত তালগুলিও তখন এইসব গীতিনাট্যে প্রচলিত ছিল :

১. ত্রিতাল ২. চৌতাল ৩. কাওয়ালি ৪. আড়াঠেকা ৫. যৎ ৬. মধ্যমান ঠেকা ৭. জলদ মধ্যমান ৮. ঝাঁপতাল ৯. ঢিমে তেতালা ১০. একতালা ১১. খ্যামটা ১৩. ঠুংরী।

এত উপাদান থাকা সত্ত্বেও গীতিনাট্যের আবেদন সস্তা রুচিকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই কারণেই গীতিনাট্যের সমস্ত

উপাদান ও আয়োজন প্রায় ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে সঙ্গীতের যে চর্যা সুরু হয়েছিল তার পিছনে কতখানি শিল্পচেতনা ছিল বলা কঠিন। তবে আসরে বা বৈঠকে চলতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সে দিন আভিজাত্যের নিদর্শন বলে গণ্য হতো। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। সম্ভবতঃ তারই প্রভাব গীতিনাট্যের গানের মধ্যে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র রচনাকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গীতিনাট্যধারার এইটেই সাধারণ চেহারা।

এই ধারারই অন্তর্গত, অথচ স্বতন্ত্র, ১৮৭৯ সালে রচিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যের বিশেষ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পিছনে তিনটি প্রভাব বর্তমান : ১. ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান, ২. বিহারীলালের সারদামঙ্গল, ৩. য়ুরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা— অবশ্য, অন্যত্র বলা হয়েছে রাজকুমার রায়-রচিত 'নাট্যসম্ভব'ই (১৮৭৬) প্রত্যক্ষভাবে এই গীতিনাট্য-রচনায় প্রেরণা দিয়েছে।[৮]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' ও স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসব'-এর মধ্যে রীতিমত সৌসাদৃশ্য রয়েছে। 'বসন্ত উৎসব'ই 'মানময়ী' রচনায় প্রেরণা দিয়ে থাকবে। 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যে ২টি অঙ্ক ; প্রথম অঙ্কে ৩টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ৩টি দৃশ্য। মোট ১২টি চরিত্র। 'মানময়ী'তে— মদন, বসন্ত, উর্বশী ও সখীগণ। দুখানি গীতিনাট্যই আদ্যন্ত গীতিময়। দৃষ্টান্ত :

ক. 'বসন্ত উৎসব' থেকে—

উষা। ধরলো ধরলো ডালা, এই নে কামিনীফুল।

ইন্দু। (উষাকে ঈষৎ ঠেলিয়া) তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো
ভ্রমরাকুল ॥

উষা। (কপালে হাত দিয়া আকুলভাবে)
উহু, সখি, মরি জ্বলি
কপালে দংশেছে অলি—।

খ. 'মানময়ী' থেকে—

১ম সখী। ছি ছি সজনী, যায় যায় রজনী—
উর্বশী। যায় যাক্, যায় যাক্।
তোরা মাত্ প্রমোদে সই।
সখীগণ। ছি ছি আজি! ওকি কথা রঙ্গিনি বলো
সুখ তরঙ্গে সজনী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ঢালো।

রবীন্দ্র-পাঠকের জানা আছে যে, এই গীতিনাট্যের 'আয় তবে সহচরী' গানটি রবীন্দ্রনাথ-রচিত। এই দুখানি গীতিনাট্যের আঙ্গিক-গত সংহতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর দিক থেকে প্রচলিত ঐতিহ্যের অনুসরণ করলেও এই দুখানি গীতিনাট্য আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে তার ব্যতিক্রম।

সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, এর পিছনে রয়েছে ঠাকুরবাড়ীর সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

বাংলা নাটকের প্রথম পর্বকে অর্থাৎ ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, সখের নাট্যশালার যুগ বলা হয়েছে।[৯] পরবর্তীকালের সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম এই সখের বা ব্যক্তিগত নাট্যশালাকে কেন্দ্র ক'রে। সখের নাট্যশালা হিসেবে প্রখ্যাত—

১. বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ
২. বেলগাছিয়া নাট্যশালা

৩. পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যশালা— যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

৪. শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারিক্যাল সোসাইটি

৫. জোড়াসাঁকো নাট্যশালা— সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. বহুবাজার নাট্যশালা

৭. বাগবাজার সখের নাট্যশালা

সখের নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই যেমন বাংলা নাটকের জন্ম, তেমনি আবার, মধুসূদন-দীনবন্ধু-রামনারায়ণের মতো নাট্যকার-বৃন্দও আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেলেন। এই-সব নাট্যশালায় যাঁরা অভিনয় করতেন, তৎকালীন সমাজে সকলেই সুপরিচিত। উনিশ শতকের গীতিনাট্যের পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতারাও স্মরণীয়। কিন্তু এদিক থেকে যে দুটি নাট্যশালা বা যাঁদের কথা মনে পড়ে সর্বাগ্রে, তাঁরা পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং জোড়াসাঁকো নাট্যশালার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। তা ছাড়া, বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুশীলন ও চর্চা সুরু হয় ঠাকুর-পরিবারেই। জোড়াসাঁকো নাট্যশালাকে লক্ষ্য করে প্রাসঙ্গিকভাবে তাই বলা হয়েছে যে, বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে নাট্যশালার দান বড় কম নয়।[১০]

শুধু জোড়াসাঁকো নাট্যশালাই নয়, পাথুরিয়াঘাটা এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালার ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। এই নাট্যশালায় যতীন্দ্রমোহনের নির্দেশে ঐকতানের সূত্রপাত। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় হিন্দু-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন করলেন।[১১] অবশ্য সঙ্গীতে আগেই পরিবর্তন এসেছিল সখের যাত্রাকে কেন্দ্র করে। ১২৮৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রসঙ্গক্রমে বাইজিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তখনকার

বাবু-সমাজ এঁদের পছন্দ করতেন খুব বেশি। এবং বাইজিদের কণ্ঠে সস্তা টপ্পা নাকি বাংলার সঙ্গীতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু'দের এই রুচিটি যেমন সত্য, তেমনি যতীন্দ্রমোহন-শৌরীন্দ্রমোহন-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথাও স্মরণযোগ্য। বলা বাহুল্য, 'বাবু সংগীতে'র শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটেছে। বাস্তবিকপক্ষে, জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় যে-সব অনুষ্ঠান হয়, তার মধ্যে দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি তথা সঙ্গীতের নবযুগের সূত্রপাত।

ঠাকুরবাড়ীকে ঘিরে সঙ্গীতের বা সংস্কৃতির যে আবহাওয়া রচিত হয়েছিল, তার সুপরিমিত দৃষ্টান্ত-উল্লেখ আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো ছবি থেকে এই আবহাওয়ার ইতিহাসটি সংগ্রহ করা চলে। প্রথমে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকেই সুরু করা যাক :

১. সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত।... এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল; কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল— অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

[ভৃত্যরাজকতন্ত্র]

২. রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত।

[নানা বিদ্যার আয়োজন]

৩. গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম।

[শ্রীকণ্ঠবাবু]

৪. সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।

[পিতৃদেব]

৫. আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রদাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

[বাড়ির আবহাওয়া]

৬. বেশ মনে পড়ে, বড়দাদা একবার কী-একটা কিম্ভুত কৌতুকনাট্য (burlesque) রচনা করিয়াছিলেন— প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত।

[বাড়ির আবহাওয়া]

৭. সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন।··· একসময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

[গীতচর্চা]

৮. ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা[১২] ভুলিতেছি— মাডাম নীল্‌সন অথবা মাডাম আল্‌বানী হইবেন।··· য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক।

[বিলাতি সংগীত]

খ. 'ছেলেবেলা' থেকে—

১. আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি।

২. থিয়েটারে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নাম-জাদার দল··· ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে বাজে লোক।

৩. বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না।

এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে

৪. বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান।

গ. 'ঘরোয়া' থেকে—

১. রোজ জলসা হত বাড়িতে। রবিকাকা গান রচনা করতেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে বসে তাঁর গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এসরাজ বাজাতুম।

২. 'অশ্রুমতী'র এইসব গানে সব মাত ক'রে দিলে। এই গানটায় সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিকাকা, ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। রবিকাকাও কয়েকটা গানে সুর দিয়েছিলেন বোধহয়। বিলেতি সুরে বাংলা গান, এখন মজা লাগে ভাবতে।

ঘ. 'জোড়াসাঁকোর ধারে' থেকে—

১. গান বাজনাও হত। তখনকার দিনে মাইনে-করা গাইয়ে থাকত বাড়িতে।

২. এমনিতরো নাচ দেখেছিলুম সে আরেকবার। কর্ণাট থেকে নাম-করা বাইজি আনিয়েছেন। খুব ওস্তাদ নাচিয়ে মেয়েটি।

৩. তিন পুরুষের সেইসব গানের সুর এসে মেশে আবার নতুন নতুন গানের সঙ্গে, রবিকাকার গানের সঙ্গে, দ্বিজুবাবুর গানের সঙ্গে।

ঙ. 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকে—

সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশান দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম।··· সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করাই প্রচলিত রীতি; কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরী হইত।

চ. সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে—

১. রবীন্দ্রনাথের জন্যে বাড়িতে ভূমি তৈরি। তিনি এসে তাতে নতুন নতুন বীজক্ষেপ করতে লাগলেন।

২. রবিমামা বিলেত থেকে ফেরার পর তিনিই নেতা হলেন। দাদাদের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ব্রহ্মসংগীত রচনা করা, ওস্তাদদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুর ভাঙা, নিজের মৌলিক ধারায় সুর তখন থেকেই তৈরি করা ও শেখান— এ সবের কর্তা হলেন রবিমামা।

৩. জীবনের প্রথম দিকে কাব্য বা সঙ্গীতের রসগ্রাহিতায় রবীন্দ্রনাথের আত্মপর বিচার ছিল না। যে কবির যেটি ভালো লাগতো সেটিতে নিজের সুর বসিয়ে গেয়ে ও গাইয়ে তার প্রচার করতেন।

ছ. 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম'-এ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বলেছেন—

কবি প্রথম জীবনে বিলাত প্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রথম দিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলেতী প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে যে ইতিহাস জানা গেল, তার প্রথমেই বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নেই ছিল সঙ্গীতের আশীর্বাদ। তাঁদের অভিজাত পরিবারে একদিকে যেমন হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের চর্চা দেখি, তারই পাশে বাংলার দেশী সঙ্গীতেরও স্থান ছিল। কিশোরী চাটুজ্যের বিবরণ থেকে জানা যাবে, দাশুরায়ের পাঁচালীর শব্দঝঙ্কার কবিকে কতখানি মুগ্ধ করে। অন্যদিকে রামায়ণ-মহাভারত তৎকালীন সাহিত্য সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছিল। তাই দেখি, মধুসূদন বিদেশী সাহিত্যরসিক হয়েও যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এরই সঙ্গে, ঠাকুর-পরিবারে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের

চর্চার দিকটিও অনুধাবনযোগ্য। ইতিমধ্যে ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের সময় বিদেশী ইতালীয় অপেরা কলকাতায় অভিনয় করেন। পুরানো গীতিনাট্যের (নাট্যগীতি ও যাত্রা) আদর্শ তো ছিলই, সেই সঙ্গে বিদেশী অপেরার আদর্শও দেখা গেল। শিক্ষিত-অভিজাত সমাজের দৃষ্টি গেল সেদিকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক অভিনীত হলে দেখা গেল তাতে দু'খানা গান ইংরেজি সুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতির এবং পূর্বে-উল্লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের মন্তব্যগুলি স্মরণ রেখে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথও য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নিতান্ত পিছিয়ে ছিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দিরাদেবীর কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ পাঁচটি ইংরেজী গানের[১৩] তালিকা দিয়েছেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে স্পষ্টতঃই ঠাকুর-পরিবারে রাগসঙ্গীত, দেশি-সঙ্গীত এবং য়ুরোপীয় সঙ্গীতের চর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ত। এর প্রথম দুটি প্রাচীন ঐতিহ্য, তৃতীয়টি নবীন। প্রাচীন ও নবীনের সাযুজ্যই উনিশ শতকের সাহিত্য ও সঙ্গীতের মূল কথা।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বয়স তখন তাঁর সতেরো। যাত্রার তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ (৫ আশ্বিন ১৮৮৫)।[১৪] ব্রাইটনে থাকতে কবি য়ুরোপীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হলেন। এই প্রবাসজীবনে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার চেষ্টা করেন। ১২৮৬ সালের মাঘ মাসের (ফেব্রুয়ারী ১৮৮০) মাঝামাঝি তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। যেজন্যে বিলেত গিয়েছিলেন, তা হ'ল না। কিন্তু এই প্রবাসজীবন নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য ; বিশেষভাবে সঙ্গীতের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে লেখা চিঠিপত্র[১৫] থেকে কবির সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা স্মরণযোগ্য :

১. আমরা যেদিন ফ্যান্সি-বলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলাম— কত মেয়ে-পুরুষ নানারকম সেজে গুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল···

[৩ সংখ্যক পত্র]

২. গত মঙ্গলবারে আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম···

[৩ সংখ্যক পত্র]

৩. এক-একদিন আমাদের গান-বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান কবি। মিস ক— বাজান। মিস ক— আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন।

[১০ সংখ্যক পত্র]

৪. যা হ'ক এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধেবেলা আমোদে কেটে যায়। গান বাজনা, বই পড়া।

[১০ সংখ্যক পত্র]

একই সঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র 'বিলাতি সংগীতে'র কিছুটা অংশ মিলিয়ে দেখা চলে :

১. ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম।··· য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন···

২. দেশে ফিরিয়া আসিয়া এইসকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে। এমন-কি, তাঁহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে।

অর্থাৎ, প্রবাস-জীবনে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপীয় সঙ্গীতের যে অভিজ্ঞতা দেখা গেল, তাতে মনে হয়— তিনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে

বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয়বার বিলাত-প্রবাসে এ অভিজ্ঞতা আরো গভীরতা পায়, কিন্তু সে আলোচনা আপাততঃ প্রাসঙ্গিক নয়।

দেশে প্রত্যাগমনের পর য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সুরে গান রচনার চেষ্টা করা তাই তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'মানময়ী' রচিত ও অভিনীত হয় বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে। এরই কিছু আগে 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যও অভিনীত হয়েছিল। এই সময়েই—

'এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল।'

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ এর জন্মকাল। পরের বছর 'কালমৃগয়া'। তারও পরে 'মায়ার খেলা'র। প্রথম গীতিনাট্যের মধ্যে যে কী অপরিসীম আনন্দ রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায় সহজেই—'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম, সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। এই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য, এই গীতিনাট্যের পিছনে প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোন গীতিনাট্যের প্রভাব আছে কিনা বলা কঠিন।[১৬] তবে একটা কথা বলে চলে যে, তিনি নিঃসন্দেহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের[১৭] কাছে ঋণী। বিহারীলালের প্রভাব কবি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। সর্বোপরি, সবগুলি গান রবীন্দ্রনাথেরই সুরারোপ কিনা, তাও সঠিকভাবে বলা তর্কাতীত নয়। এ ক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে হাত ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে।[১৮] সঙ্গীত ও নাটকের আঙ্গিককে তিনি পরবর্তীকালে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন, তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এখানে

শুধু একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাংলা গীতিনাট্য যা নীহারিকা রূপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়েছিল, তা অবশেষে একটি প্রান্তভূমিতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। অনেকেরই ধারণা পালাগান থেকেই যাত্রার উৎপত্তি।[১৯] এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত এই যে, কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে যাত্রা রচনার নজির অনেকদিন থেকেই চলে আসছিল। সেই ধারাই অবশেষে জয়দেবের মধ্যে দিয়ে, মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিক কালে এসে পৌঁছেছে। যাত্রা অর্থে 'নাটগীত'ও বোঝাতো, কেননা, তার মধ্যে নৃত্য ও গীতের স্থান ছিল। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগের মঙ্গল ও পাঁচালী গানের মধ্যে তারই অন্য একটি রূপ দেখতে পাচ্ছি। পাঁচালী বলতে, মধ্যযুগে, আখ্যানমূলক যে কোনো রচনাকেই বোঝাতো। পাদচালনা করে ঘুরে ফিরে পদ-গান, ভাবকলি, নাচাড়ি, বৈঠকী এবং দাঁড়া-কবি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ছিল এর অঙ্গ। এই ধারার সঙ্গে আখড়াই, হাফ-আখড়াই, কবিগান ইত্যাদির প্রসঙ্গও স্মরণীয়। যাত্রার পিছনে এই উপাদানগুলির স্বীকৃতি রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে যাত্রার তিনটি পৃথক রীতি লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা ও চণ্ডীযাত্রা।[২০] পুরানো ভক্তিরসের বদলে এল অশ্লীলতাপুষ্ট বিট-বারনারীর, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানীর সঙ্; আদি রসাত্মক ধারা পরিপুষ্ট হলো বিদ্যাসুন্দর যাত্রায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ধারাগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়। যাত্রার প্রধান আকর্ষণ গান; এবং নানা রীতিতে তা পরিবেশন করা হতো। এই যাত্রার পালা-শৈলীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২১] প্রথম শ্রেণীতে ধরা যায় কৃষ্ণকমলের রচনা, আগাগোড়া গানে বাঁধা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গোবিন্দ অধিকারী,

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় রচিত পালাগুলি— কথা ও গান প্রায় সমান অংশ গ্রহণ করেছে। তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন মতিলাল রায় প্রমুখ সখের যাত্রাওয়ালাবৃন্দ— যাঁদের রচনায় 'সংলাপের নামে কথকতার ধরণে দীর্ঘ বক্তৃতা'র পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমে সঙ্গীত-সর্বস্বতাই ছিল যাত্রার বৈশিষ্ট্য, পরে ধীরে ধীরে গদ্যসংলাপ প্রবেশ করেছে, গানের স্থান সংকুচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ধারা ছিল পল্লীকেন্দ্রিক। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য অপেরার সঙ্গে পরিচয় ঘটার ফলে পূর্ববর্তী নাটগীতের ধারাই অবশেষে নাগরিক পরিবেশে গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হলো। এর পিছনে নব্য নাটক বা থিয়েটারের প্রভাবও স্বীকার করা হয়েছে।[২২]

য়ুরোপে 'অপেরার' ভাগ্যে প্রশংসা ও নিন্দা দুইই জুটেছে। ইংলণ্ডে অনেক সঙ্গীতবিদ্‌দের অভিমত এই যে, অপেরা সংগীতকে কোনোরকম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ অপেরা শিল্পী নাকি অনৈতিক জীবনযাপন করতেন। সর্বোপরি, অপেরা ছিল মূলতঃ অভিজাতদের বিলাস ও উপভোগের বস্তু। Beethoven এবং Wagner-এর সময় থেকে অবশ্য এ ধারণা বদলাতে থাকে যেদিন থেকে তাঁরা অপেরার য়ুরোপীয় সঙ্গীতের একটি উচ্চ আদর্শ ও মান প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যদিকে, অপেরা য়ুরোপে এত বেশী জনপ্রিয় যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট নিদর্শন বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

ষোড়শ শতকের শেষ পর্বে ফ্লোরেন্সে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিকের চেষ্টায় ও উৎসাহে সর্বপ্রথম অপেরার বীজ রোপিত হয়। এর জন্মসূত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন গ্রীক-ট্রাজেডীর মধ্যে তার গোড়াপত্তন, সঙ্গীত ছিল তার অপরিহার্য উপাদান।[২৪]

দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন কাল থেকেই নাটককে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ও উপযোগিতা রয়েছে; তথাপি ষোড়শ শতকের শেষে অপেরার (প্রচলিত অর্থে) সূত্রপাত। Daphne ও Apollo-র কাহিনীকে কেন্দ্র করে Ottavio Rinuccini কথা অংশ এবং মুখ্যত Jacopo Peri সুর যোজনা করলেন। ১৬০০খৃষ্টাব্দে তাঁরা দুজনে Euridice নামে একটি অপেরা রচনা করলেন— সম্ভবতঃ, প্রথম পূর্ণাঙ্গঅপেরা। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে দুটি ধারার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়— ক. Classical Tragedy, খ. Ballet. এই ব্যালেকে কেন্দ্র করেই ফ্রান্সে অপেরার জন্ম। Jean Baplise Lully (১৬৩২-.৬৮৭) যে রীতিতে অপেরা রচনা করলেন, তার সঙ্গে ইতালীয় অপেরার প্রভেদ দেখা গেল। তিনি নাটকীয় উপাদানের দিকে যেমন বেশি দৃষ্টি দিলেন, তেমনি যন্ত্রসঙ্গীতের প্রাধান্য ও দীর্ঘ গানের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গানের ব্যবহার করলেন। তার সঙ্গে ব্যালের আদর্শও স্থান পেল, যেমন দৃশ্যসজ্জার ঘনঘটা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই জার্মান অপেরার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেল। তার আগে সুদীর্ঘ এক শতাব্দীকাল মুখ্যত ইতালীয় রচয়িতারাই জার্মান ভাষার অপেরা রচনা করতেন। সুতরাং বলাই বাহুল্য, যে, জার্মান অপেরার সঙ্গে ইতালীয় অপেরার ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশী। ঐই পর্বের স্মরণীয় জার্মান রচয়িতা হচ্ছেন Reinhard Keiser (১৬৭৪-১৭৩৯)। ইংলণ্ডে অপেরার জন্ম 'masque' থেকে এবং The Venus and Adonis (১৬৮৫) John Blow রচিত প্রথম ইংরেজী অপেরা। এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হচ্ছেন Henry Purcell (১৬৫৯-১৬৯৫); তাঁর Dido and Aeneas (১৬৮৯) আজও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংলণ্ডে ষোড়শ

শতকের শেষে যন্ত্রসঙ্গীতের জগতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এলো—'music for music's sake,' 'abstract music.' ইংলণ্ডে ইতালীয় অপেরা কালক্রমে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। Restoration যুগের 'Recitative Musick'-এর চর্চা তো ছিলই, তার সঙ্গে ফরাসী অপেরার নৃত্যাদর্শ ও যন্ত্রসঙ্গীত, সবশেষে ইতালীয় আদর্শ— এসবের সমন্বয়ে ইংলণ্ডে অপেরার আদর্শ গড়ে উঠতে থাকে; তবু এর সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। সোভিয়েট রাশিয়া প্রধানতঃ ইতালীয় অপেরার আদর্শ বজায় রেখেছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Cherubini-এর অনুসরণে Glinka 'A Life for the Tsar' নামে একটি (Rescue Opera) অপেরা রচনা করেন, যার ভিত্তি রুশসঙ্গীতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পর্বের রুশীয় রচয়িতাদের মধ্যে Moussorgsky (১৮৩৯-১৮৮১) বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, যিনি তাঁর রচনার মধ্যে রুশ-সঙ্গীতের আদর্শ বজায় রেখেছেন।

য়ুরোপীয় অপেরার ইতিহাস সত্যই বিচিত্র, এবং তা সংক্ষেপে আলোচনার বস্তু নয়। Wagner সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে; আপাতত বলা দরকার, তাঁর সময় পর্যন্ত য়ুরোপীয় অপেরা বিভিন্ন পরীক্ষার সীমান্ত অতিক্রম করেছে। কখনো কথার সঙ্গে নামমাত্র সুর, কখনো যন্ত্রসঙ্গীতের প্রাধান্য, কোথাও গায়কের কণ্ঠসঙ্গীতের প্রাধান্য, কোথাও বা এরই সঙ্গে নৃত্যও স্থান পেয়েছে। হাল্কা রসের অপেরার পাশাপাশি রোমাণ্টিক অপেরার যেমন আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও অপেরা ক্রমশঃ বাস্তবের দিকে ঝুঁকেছে। আবার, এই অপেরাকে কেন্দ্র করেই য়ুরোপীয় কথাশিল্পের যুগান্তর এসেছে। কাজেই, য়ুরোপে অপেরার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

য়ুরোপীয় অপেরার এই জনপ্রিয়তা এবং তার ঐশ্বর্যই নিঃসন্দেহে

উনিশ শতকের বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চকে স্পর্শ করেছে। প্রচুর অর্থব্যয়ে তখন কয়েকটি ইতালীয় অপেরা অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়।[২৪] অপেরার বাইরের জৌলুসই তৎকালীন দর্শককে আকৃষ্ট করেছিল, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের মনে এসব স্মৃতি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বলা কঠিন। বোধ হয় য়ুরোপ-প্রবাসেই তিনি এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন; তাঁর নিজের লেখা থেকে এই কথাই ধারণা করা চলে। পরবর্তী-কালে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আর্থার স্যুলিভানের গণ্ডোলিয়র্স সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে অপেরা সম্বন্ধে তাঁর কী মনোভাব, অনুভব করা যায়। এই পর্বটি তখন ইংলণ্ডে সঙ্গীতের দিক থেকে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এর কিছুকাল আগে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে Wagner ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, তাঁর অপেরার অভিনয়ে লণ্ডনে তখন থেকেই অপেরার বা সঙ্গীতের নবজাগৃতি সুরু হল। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম ইংলণ্ডে যান, (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮-ফেব্রুয়ারী ১৮৮০) অনুমান করা যায়, যে নব-কল্লোল সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন লণ্ডনের সাঙ্গীতিক জগতে, তিনিও তার রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত হন নি। অপেরাকে তার নিজস্ব পরিবেশে কাছে থেকে দেখার এই সুযোগকেই তিনি বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে ব্যবহার করেছিলেন।

এই কথাগুলি স্মরণ করেই সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে, বাংলা গীতিনাট্যের ধারাটি বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে শেষ পর্যন্ত সংহতি লাভ করেছে। কবি নিজেও এই গীতিনাট্যটিকে বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে দেখতেন—এবং নানা উপলক্ষ্যে এটি বহুবার অভিনীত হয়েছে। বস্তুতঃ, বাল্মীকি-প্রতিভা স্বতন্ত্র বা পারম্পর্যহীন বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, বরং পূর্বাপরতাসূত্রে এর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১ "কয়েক বৎসর হইল আর এক পদ্ধতির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে কেহ কেহ অপেরা বলে, কেহ বা উপহাস করিয়া 'অপ্পেয়েরা' বলে। ইহাতে শামলা আছে, পেণ্টলুন আছে, কোট আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে। ইহাতে দেখিবার জিনিষ যথেষ্ট। পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাতেই এই নতুন যাত্রাতে বেশভূষার এত জাঁক। সঙ্গীত ও কাব্যরসের এতো অভাব।" (ফাল্গুন ১২৮৯ ॥ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩)

দ্রষ্টব্য: Opera Yatras and Degenerated Theatres, *The Indian Stage*, Ch. VII, H. Dasgupta.

২ হুতোম প্যাঁচার নক্সা—১ম ভাগ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পরে ১৫ই অক্টোবর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে।

৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন।

৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ Hindu Patriot, May 22, 1865.

৬ *The Indian Stage*, Vol. II, H. Dasgupta.

৭ হুতোম প্যাঁচার নক্সা

৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন।

৯ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০ *The Indian Stage*, Vol. II, H. Dasgupta.

১১ তদেব

১২ Christina Nilson (1843-1922), Swedish Prima Donna Dame Albani (1852-1930), Canadian Prima Donna—জীবনস্মৃতি, বিলাতি-সংগীত; রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৭শ খণ্ড) বিশ্বভারতী সংস্করণ।

১৩ 'Won't you tell me, Mollie darling'
'Darling, you are growing old'

'Come into the garden, Maud'

'Good night, good night, beloved'

'Goodbye, sweet-heart, goodbye' ('শোধবোধ' নাটকে এই গানটির উল্লেখ আছে)

১৪ রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

১৫ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

১৬ "তৎকালে প্রচলিত অনুরূপ দেশী বা বিদেশী গীতিনাট্য থেকে এই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র রচনার কল্পনা তাঁর মনে এসেছিল কিনা সেকথা নিশ্চিত ভাবে বলার মতো কোন তথ্য আমাদের সামনে নেই। কিন্তু আমরা জানি ঐ নাটকরচনার পূর্বে গুরুদেবের বাড়িতে বিদ্বজ্জনসমাগম-উৎসব উপলক্ষ্যে 'মানময়ী' নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত একখানি পূর্ণাঙ্গ গীতি-নাটক অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে, গুরুদেব ও পরিবারের আরো অনেকেই এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।"—রবীন্দ্র-সংগীত॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

১৭ "..এই কাব্যের আরম্ভ সর্গ হইতে বাল্মীকি সম্বন্ধীয় গীতিনাট্য রচনার ভাব রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম উদিত হয়। গীতিনাট্যখানি লিখিবার সময় সারদামঙ্গলের দুই একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকি-প্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইল।"—রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্রষ্টব্য : গীতিবিতান (৩য় খণ্ড) গ্রন্থপরিচয়।

১৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

১৯ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু।

২০ বিচিত্র সাহিত্য (১ম খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন।

২১ বাংলা-সাহিত্যে নাটকের ধারা—শ্রীবৈদ্যনাথ শীল।

২২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩ "Opera as a form of entertainment has its roots in the tragedies of ancient Greece, in which music was an integral part. The theatrical performances of ancient Rome also

used music. In the middle Ages drama became the property of the church and it was then that the principle of modern opera was developed."—*The World's Great Operas* —John Tasker Howard.

২৪ "প্রায় লাখটাকার কাছাকাছি চাঁদা তুলে… উপরি উপরি পাঁচ-ছয় বছর গ্যারান্টি দিয়ে ইটালিয়ান অপেরা সম্প্রদায়কে কলকাতায় আনাতেন ও এই লিণ্ড্সে ষ্ট্রীটস্থ অপেরা হাউসে অভিনয় করাতেন।"—অমৃতলাল বসু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের পর্যালোচনা

গীতিনাট্যের গায়কী বা গায়ন-পদ্ধতি

গীতিনাট্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নাটকটি আদ্যন্ত গানে রচিত এবং গেয়ে অভিনয় করা হয়। গানের ভিতর দিয়ে নাট্যবস্তুকে রূপ দেওয়াই হচ্ছে গীতিনাট্যের মূল কথা। নাটকের সংলাপ গদ্যে অথবা কখনো ছন্দোবদ্ধ পদ্যে (কবিতায়) রচিত হয়ে থাকে। দুয়েরই সাধারণ ধর্ম অভিনয়। পার্থক্য হচ্ছে একটি সুরহীন বাণীর আশ্রয় নেয়, অপরটি সুরান্বিত বাণীকে আশ্রয় করে, একটি সাধারণ ভাষা, অপরটি সুরসমন্বিত ভাষা। নাটকের সংলাপ গদ্যে অথবা পদ্যে, যাতেই রচিত হোক না কেন, তার লক্ষ্য মনের ভাবকে প্রকাশ করা এবং সেইজন্যেই বলতে পারি— সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাকরীতি বা কথাবলার ঢংটি ফুটিয়ে তোলা ; এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাকে রূপদান করতে হয়। অভিনয়-দর্পণ-এর ৩৮-সংখ্যক শ্লোকে[১] চতুর্বিধ অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে : আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গসমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত। বাক্যের (কথার) মধ্য দিয়ে বাচিকাভিনয় ; হার, কেয়ূর, বেশ ইত্যাদি দ্বারা (শারীরিক) অলংকরণ আহার্যাভিনয় এবং সাত্ত্বিক ভাবসমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত সাত্ত্বিকাভিনয়। অভিনয় শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"অভিমুখভাবে অর্থ নির্ণয়ের জন্য যাহা নয়ন [আনয়ন] করে, তাহাই অভিনয়। যেহেতু রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগের দ্বারা ইহা জানা অর্থকে বিভাবিত (বিশেষভাবে জ্ঞাপিত) করে, সেই হেতু অঙ্গোপাঙ্গসংযুত ইহার নাম অভিনয়।"[২]

আসলে মানবমনের অন্তরীণ রহস্যকে রূপ দেওয়াই হচ্ছে অভিনয়ের লক্ষ্য। নানাভাবে আমরা নিজেদের প্র াশ করে থাকি। অভিনয়-দর্পণে সুস্পষ্টভাবে চারটি রীতির কথা বলা হলেও, এ কথা ঠিক— ঐগুলি সম্মিলিত ভাবেও প্রকাশ পেতে পারে। বাচিক এবং আঙ্গিক, বা আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক একসঙ্গে মিলিত হতে পারে। চাই কি, এই চতুর্বিধ রীতির সমন্বয়ও ঘটতে পারে। নৃত্য বা নৃত্তের প্রসঙ্গও এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। বলা বাহুল্য, বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিনয়ে স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গী হয়ে থাকে। কখনো সারা অঙ্গের মধ্যে কখনো বা বিশেষ অঙ্গের মধ্যে দিয়েও ভাব প্রকাশ করা হয়। অভিনয়ের মুহূর্তে সংলাপের অন্তর্নিহিত ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাবানুরূপ দেহবিক্ষেপ প্রয়োজন, অর্থাৎ অন্তরের ভাবটির সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর (অভিনয়ের) সাযুজ্যসাধন করা চাই। তাই কোনো করুণরসের অভিনয়ে স্বভাবতই কখনো চঞ্চল দেহবিক্ষেপ ঘটতে পারে না, অনুবৃত্ত আলোকিত দৃষ্টিপাত ঘটতে পারে না। যেমন, কোনো উদ্দীপনামূলক গানের লয় বিলম্বিত হতে পারে না।

বাস্তবিকপক্ষে, মনের ভাবকে নাটকে রূপ দিতে গিয়ে নাট্যকারকে ভাবতে হয়, গদ্য, পদ্য অথবা গান— কোন্ মাধ্যমের আশ্রয়ে তা সার্থক রূপলাভ করতে পারে? এদিকে লক্ষ্য রেখে এগুলির স্বরূপব্যাখ্যা বিধেয়। গদ্যের (গদ্যসংলাপের) মধ্যে স্পষ্টতঃ কোনো নিয়মিত ছন্দস্পন্দ নেই, সর্বত্রই ভাবানুযায়ী উচ্চারণ-রীতি নির্ধারিত হয়। পদ্য (কাব্যধর্মী সংলাপ) মূলতঃ নিয়মিত ছন্দ-স্পন্দকে আশ্রয় করে থাকে। গদ্য ও পদ্যের এই সীমারেখা নিশ্চয়ই তর্কাতীত নয়, কিন্তু অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উভয়ের এই পার্থক্য বোধ হয় স্বীকার করা চলে। আবার, যে ছন্দস্পন্দের কথা বলা

হল— তা গদ্যেরও ধর্ম হতে পারে, যদি তার মধ্যে অতিরিক্ত আবেগ সঞ্চার করা হয়। তখন স্বভাবতই তার মধ্যে এমন একটি ধ্বনিস্পন্দন লক্ষিত হয় যাকে কোনোমতেই তখন আর গদ্য বলা চলে না। চাই কি, আমাদের মনের আবেগপূর্ণ প্রকাশ এইভাবেই হয়ে থাকে। স্বভাবতই কণ্ঠে তখন সুরাগম লক্ষ্য করা যায়। এবং গদ্য তখন কাব্যে উন্নীত হয়। আবেগহীন গদ্যে যার অস্তিত্ব থাকে অস্পষ্ট— আবেগপূর্ণ ছন্দস্পন্দে কাব্যরূপে তা হয়ে ওঠে মূর্ত। কবিতার মধ্যে তাই সহজেই সুরধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়।[৫] অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা যায়, গানের মধ্যে দিয়েই আবেগ বা ভাব সবচেয়ে ভালোভাবে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায়। এদিক থেকে বলা চলে, গানের আকর্ষণ ও প্রকাশধর্মিতা অপেক্ষাকৃত বেশী। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রাগরাগিণীর লক্ষ্যই হচ্ছে মনের বিভিন্ন আবেগকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মনের বেদনাকে' ফুটিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ কী চোখে ভারতীয় রাগরাগিণীকে বা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে দেখেছেন তা প্রসঙ্গান্তর। তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে— ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে করুণা ও বৈরাগ্য, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল কথা যেন সুরকে অতিক্রম না করে,[৬] পরবর্তীকালে সে মত পরিহার করে কথা ও সুরের সাযুজ্য স্বীকার করেন।

গীতিনাট্যে সংলাপের ভূমিকা নেয় সঙ্গীত। সাধারণ অভিনয়ের সব রীতিই তার মধ্যে বজায় রাখতে হয়, শুধু নাট্যবিষয়টি গানের (বা সুরের) মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়।

গীতিনাট্য রচনা করতে গিয়ে সঙ্গীতকে কিভাবে তিনি গীতি-নাট্যের কাজে লাগিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা নিজেই ব্যাখ্যা

করেছেন।[৭] হার্বার্ট স্পেনসরের মতবাদ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন— 'ভাবিয়াছিলাম এই মত-অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।' অতঃপর তিনি কথকতার প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং অনতিপরেই মূল কথাটি বললেন—'ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গানহিসাবে এও সেইরূপ— ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে— ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোনো রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে।'

ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করে তুলতে সঙ্গীতের ক্ষমতা কতখানি বা গীতিনাট্যের অভিনয়ের লক্ষ্য কী, নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, আমরা যখন রোদন করি তখন দুটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে অতি অল্প ব্যবধান থাকে এবং স্বরগুলি কোমল সুরের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, সুর বিলম্বিত হয়ে ওঠে। তার বিপরীত হাসি। হাসিতে কোমল সুর লাগে না তো বটেই, উপরন্তু তালে রীতিমতো ঝোঁক লাগে। তুলনা দিয়ে তিনি বলেছেন, দুঃখের রাগিণী দুঃখের রাত্রির মতো ধীরে ধীরে চলে; আর সুখের রাগিণী হচ্ছে দিনের মতো দ্রুত পদক্ষেপে চলে। তিনি আরো বলেছেন—দ্রুত তাল হচ্ছে সুখের ভাব প্রকাশের অঙ্গ। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালেরও পরিবর্তন ঘটে। এরই সূত্র ধরে গীতিনাট্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর অভিমত এই যে, গীতিনাট্য আগাগোড়া সুরে অভিনয় করতে হয় বলে স্থানবিশেষে তাল থাকা দরকার। তা না হলে অভিনয়ের স্ফূর্তি বা পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নয়। প্রসঙ্গতঃ, হার্বার্ট স্পেনসরের মতবাদও স্মরণযোগ্য।[৮]

ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লয়ের কিভাবে পরিবর্তন ঘটে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে হার্বার্ট স্পেনসর Staccato, largo, adagio, andante, allegro, presto প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি[৯] ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রকরণ বা উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এদিক থেকেই গীতিনাট্যের গায়কী বা গায়ন-পদ্ধতির আলোচনা বিধেয়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি এই রীতিরই অনুসারী। উনিশ শতকের অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্যগুলি কিভাবে পরিবেশন করা হতো, তা সঠিকভাবে জানার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি তার ব্যতিক্রম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো, অভিনয়ের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ শিল্পীর বা পরিচালকের দক্ষতার তারতম্যের উপর নির্ভরশীল; স্বভাবতই যা প্রত্যক্ষভাবে অভিনয়ের ব্যাপার— লিখিতরূপে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের গায়কীর মূল কথা হচ্ছে গানগুলি যেহেতু অভিনয়ের ঢঙে গাইতে হয়, সেজন্যই সাধারণ গায়ন-পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ গানগুলি বিনাতালে কিংবা ভাঙা তালে গাওয়া দরকার। সাধারণ নিয়মে গানে তালের অনুশাসন মানতে হয়, তা সে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতই হোক, কিংবা লোকসঙ্গীতই হোক। এদিক থেকে গানের সঙ্গে কবিতার বেশ মিল রয়েছে। কবিতার ছন্দ বা গানের তাল, যে ভাবেই দেখা থাক না কেন, এমন এক শৃঙ্খলা যার চারপাশে সুরকে ঘুরে বেড়াতে হয়, সম্পূর্ণভাবে বিচরণের স্বাধীনতা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন, গায়কের মুক্তি বা কৃতিত্ব ঐ শৃঙ্খলাকে স্বীকার করার মধ্যে, অবহেলা করার মধ্যে নয়। বলা বাহুল্য, তা একক সঙ্গীতের পরিবেশনের

পক্ষে প্রযোজ্য। অন্যদিকে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের যা বৈশিষ্ট্য— মূল পয়ারের কাঠামোকে ভিত্তি করেও স্বাধীনভাবে চরণগুলি বিন্যস্ত হয়ে থাকে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবৃত্তি আসলে ভাবকে অনুসরণ করে বলে অভিনয়ের সঙ্গে বেশ সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

গীতিনাট্যের গানগুলিও অনুরূপভাবে পরিবেশন করতে হয়। এই গীতিনাট্যের গানগুলি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

ক. প্রথম দৃশ্য

১. সহে না সহে না কাঁদে পরাণ
২. আঃ বেঁচেছি এখন
৩. আজকে তবে মিলে সবে
৪. এখন করব কী বল
৫. শোন্ তোরা তবে শোন্
৬. ওই মেঘ করে বুঝি গগনে
৭. এ কী ঘোর বন
৮. পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে

দ্বিতীয় দৃশ্য

১. রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো
২. দেখো হো ঠাকুর
৩. নিয়ে আয় কৃপাণ
৪. কী দোষে বাঁধিলে আমায়
৫. এ কেমন হল আমার
৬. আরে, কী এত ভাবনা
৭. শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ

১. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে

২. ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই

৩. রাজা মহারাজা কে জানে

৪. আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা

৫. আঃ কাজ কী গোলমালে

৬. হা, কী দশা হল আমার

৭. অহো ! আস্পর্ধা একি তোদের

৮. আয় মা আমার সাথে

চতুর্থ দৃশ্য

১. কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই

২. কেন রাজা ডাকিস্ কেন

৩. চল্ চল্ ভাই ত্বরা করে যাই

৪. প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে

৫. বলব কী আর বলব খুড়ো

৬. সর্দার মশায় দেরি না সয়

৭. রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু

৮. তোর দশা রাজা ভালো তো নয়

পঞ্চম দৃশ্য

১. জীবনের কিছু হল না হায়

২. দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি

৩. কী বলিনু আমি

৪. এ কি এ, এ কি এ, স্থিরচপলা

৫. নমি নমি ভারতী

৬. শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা

১. কোথা লুকাইলে

২. কেন গো আপন মনে

৩. কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা

৪. বাণী বীণাপাণি

৫. এই যে হেরি গো দেবী

পূর্বোক্ত গানগুলি মূলতঃ বিনাতালে, ভাঙাতালে বা অনিয়মিত তালে গাওয়া দরকার।

এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত বনদেবীগণের গানগুলি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এই গানগুলি (১. সহে না সহে না, ২. নমি নমি ভারতী, ৩. বাণী বীণাপাণি) কোরাস-জাতীয়, রস করুণ; লয় বিলম্বিত। 'নমি নমি ভারতী' গানটির রস ঠিক করুণ না হলেও অন্তর্নিহিত ভাবের দিক লক্ষ্য রেখে বিলম্বিত লয়ে গাওয়া উচিত। এই তিনটি গানের মধ্যে দিয়ে যেন কবির নিজের মনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে বা, বলা চলে প্রত্যেক দৃশ্যের মূল সুরটি অভিব্যক্ত। ভাবপ্রধান এই গানগুলির মধ্যে আঙ্গিকাভিনয়ের তেমন সুযোগ নেই।

বাল্মীকির গানগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাব ফুটে উঠেছে, অর্থাৎ নানা ভাবের সংঘাত বা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়:

১. শোন্ তোরা তবে শোন্

২. রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি

৩. নিয়ে আয় কৃপাণ

৪. এ কেমন হল মন আমার

৫. শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ

৬. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে

৭. আয় মা আমার সাথে

৮. কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই

৯. রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু

১০. জীবনের কিছু হল না হায়

১১. কী বলিনু আমি

১২. একি এ, একি এ

১৩. শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি

১৪. কোথা লুকাইলে

১৫. কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা

১৬. এই যে হেরি গো দেবী

২, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬-সংখ্যক গানগুলি ভাঙা তালে, অথবা অনিয়মিত তালে গেয় হলেও অভিনয়ের দিক থেকে খুব বেশী উপযোগিতা আছে বলে মনে হয় না; কিন্তু ১, ৩, ৫, ৮, ৯-সংখ্যক গানগুলির অভিনয়গত উপযোগিতা যথেষ্ট রয়েছে। লক্ষ্য করা দরকার, এই গানগুলির মধ্যে যেমন আবেগের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সেই আবেগকে কেন্দ্র করে সুরও যেন তারই অনুগমন করেছে।

বস্তুতঃ এই গানগুলিতে আঙ্গিকাভিনয়ের বা নির্বাক অভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। 'শোন্ তোরা তবে শোন্' গানটির মধ্যে লয়েরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম অংশটুকু বিলম্বিত, শেষের 'ত্বরা করি যা তবে' অংশটুকু দ্রুতলয়ে গেয়। অনুরূপভাবে ৫-সংখ্যক গানটিও গাওয়া দরকার। 'এ আদেশ'— এই অংশে ভাবের সঙ্গে সমতা রেখে স্বরে প্রখরতা বা তীব্রতা প্রয়োজন। এদিক থেকে ৮-সংখ্যক গানটির গায়কী সত্যিই বিচিত্র। দক্ষ শিল্পীর স্পর্শ পেলে এই গানটির সার্থক প্রকাশ ঘটতে পারে। সুরের দিকে লক্ষ্য রেখে অভিনয়গত নির্দেশ দেওয়া হল :

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই— ক
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে খ
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে— গ
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে। ঘ
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে
কেমনে যাবে বেদনা।
ধরি ধনু আনি বাণ গাহিব ব্যাধের গান, ঙ
দলবল লয়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে। চ

ক— এর পর বিরতি (Pause)

খ – উঠে, দ্রুত

গ— এর পর বিরতি

ঘ— এর পর বিরতি

ঙ— দ্রুত

চ— বিরতি

বাল্মীকির ৯-সংখ্যক গানটিরও (রাখ্‌ রাখ্‌, ফেল্‌ ধনু) অভিনয়-গত উপযোগিতা যথেষ্ট রয়েছে। এই মূল গানগুলি ছাড়াও বাল্মীকির কণ্ঠে অন্য সংলাপের অন্তর্গত কয়েকটি খণ্ড গান (১. তফাতে সব সরে যা ; ২. শিকারেতে হবে যেতে ; ৩. শোনো, শোনো ; ৪. পূর্ণ হল বাসনা ; ৫. থাম্‌ থাম্‌ কী করিবি) রয়েছে; বলা বাহুল্য, এগুলিও পূর্ববর্তী রীতিতে অভিনেয়।

এই গীতিনাট্যে নিম্নলিখিত গানগুলি বালিকার :

১. ওই মেঘ করে বুঝি গগনে

২. এ কী এ ঘোর বন

৩. কী দোষে বাঁধিলে আমায়

৪. হা, কী দশা হল আমার

গানগুলি মূলতঃ করুণরসাত্মক। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক, গাইবার সময় ভাবানুযায়ী, বিলম্বিত লয়ে গাইতে হয়। ১ ও ২ -সংখ্যক গানে বাকী দুটি গানের তুলনায় আঙ্গিকাভিনয়ের সুযোগ বেশী আছে বলে মনে হয়। পঞ্চম দৃশ্যে ব্যাধদের প্রবেশ। এই গানটির মধ্যেও আঙ্গিকাভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। লয়ের কিভাবে পরিবর্তন আনা দরকার, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ শেষের অংশটুকু তুলে দেওয়া গেল :

বাল্মীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না।—

(বিলম্বিত)

ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর— এই ছাড়িলাম।—

(দ্রুত)

এদিক থেকে দস্যুদের গানগুলির আঙ্গিকাভিনয়ের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী :

১. আঃ বেঁচেছি এখন
২. আজকে তবে মিলে সবে
৩. এখন করব কী বল্
৪. পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে
৫. দেখো হো ঠাকুর
৬. আরে, কী এত ভাবনা
৭. ছাড়ব না ভাই
৮. রাজা মহারাজা কে জানে
৯. আঃ কাজ কী গোলমালে
১০. দীনহীন এ অধম আমি
১১. কেন রাজা, ডাকিস্ কেন
১২. চল্ চল্ ভাই

১৩. প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে

১৪. বলব কী আর

১৫. সর্দার মশায় দেরি না সয়

১৬. তোর দশা রাজা

১৭. আর না, আর না, এখানে আর না

১-সংখ্যক গানে নির্বাক অভিনয়ের বা প্যাণ্টোমাইমের রীতিমতো সুযোগ রয়েছে। যেমন, লাফ দিয়ে আরামসূচক 'আঃ' শব্দটি বলার সঙ্গে প্রথম দস্যুর মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। তার পর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে এমন ভাব দেখিয়ে, 'গোলেমালে ফাঁকতালে সট্‌কেছি কেমন' অংশটুকু অভিনয় করা বিধেয়।

এই গানটির বাকী অংশটুকুও ঐভাবেই অভিনয় করা চলে। ২-সংখ্যক গানটির বিষয়েও একই কথা। ৩-সংখ্যক গানটির :

করে দিই রসাতল !

সকলে। করে দিই রসাতল !

সকলে। হো রাজা, হাজির হয়েছে দল।

বল্ রাজা, করব কী বল্ এখন করব কী বল্ ॥

অংশে একটি স্ফূর্তির ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গানটিতে যেভাবে সুরারোপ করা হয়েছে, তাতে ঐ ভাবটিই ফুটে উঠেছে। এই অংশের অভিনয়ে সেই কারণেই নৃত্যাভাস এসে পড়ে, এবং এই কারণেই উপরের ঐ অংশটুকু তালে গাওয়া উচিত। ৭-সংখ্যক গানটির অভিনয়ে এই রীতিই প্রযোজ্য।

৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫ ও ১৭ -সংখ্যক গানগুলির পাশাপাশি ১২, ১৩ ও ১৪ -সংখ্যক গানগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। শেষের এই তিনটি গানকে পূর্বোক্ত ১ অথবা ৩ -সংখ্যক গানের সঙ্গে তুলনা করা যায় অভিনয়গত উপযোগিতার দিক থেকে।

বিনা তালে, ভাঙা তালে বা অনিয়মিত তালে গেয় পূর্বালোচিত ৪২টি গান ছাড়া আর এক শ্রেণীর গান রয়েছে, সেগুলি তালে গাইতে হয়। মনে রাখা দরকার, এই গানগুলিতে তালের (সুনিয়মিত ছন্দস্পন্দে) প্রয়োজন অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকাশ করার জন্যই। এখানে এই রীতিই অভিনয়ের অঙ্গ, এবং পূর্বোক্ত গানগুলির সঙ্গে তুলনা করতে গেলে লক্ষ্য করা যায়— এই গানগুলি মূলতঃ উদ্দীপনামূলক। সেই কারণেই তালে গাওয়া প্রয়োজন। গানগুলি যথাক্রমে :

খ. প্রথম দৃশ্য

১ এনেছি মোরা এনেছি মোরা

২. এক ডোরে বাঁধা আছি

৩. তবে আয় সবে আয়

৪. কালী কালী বলো রে আজ

৫. মরি ও কাহার বাছা

তৃতীয় দৃশ্য

৬. এত রঙ্গ শিখেছ কোথা

চতুর্থ দৃশ্য

৭. রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে

৮. এইবেলা সবে মিলে

৯. গহনে গহনে যা রে তোরা

১০. কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে

যতদূর জানা যায় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭-সংখ্যক গানগুলি নৃত্যের আঙ্গিকে অভিনীত হয়েছিল এবং হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উদ্দীপনা বা উল্লাসের ভাবটি এইভাবে অভিনয় করলে সার্থকভাবে ফুটতে পারে।

৫-সংখ্যক গানটি এদিক থেকে স্বতন্ত্র, কেননা, গানটির ভাব করুণ। এ ক্ষেত্রে সুরারোপে মূল আইরিশ মেলডির অনুসরণ করা হয়েছে। ৭-সংখ্যক গানটিও আগের গানটির মতো বনদেবীদের, এবং এই গানটির সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। কোরাস-জাতীয় গানগুলির তালে গাওয়ার দিকেই ঝোঁক ছিল।

এ জাতীয় গানগুলির অন্তর্ভুক্ত অথচ সামান্য স্বতন্ত্র প্রকৃতির দুটি যথাক্রমে ১. এক ডোরে বাঁধা আছি; ২. কালী কালী বলো রে আজ। প্রথম গানটি সম্পূর্ণভাবে তালে গাওয়া যেতে পারে অথবা প্রথম পাঁচটি চরণ ভাঙাতালে গেয়ে শেষের দুটি চরণ তালে গাওয়া চলে :

ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়॥

এইভাবে দ্বিতীয় গানটি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া গেল :

সকলে। কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো!
নামের জোরে সাধিব কাজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, বলো হো!— ক
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ওই লট্টপট্টকেশ অট্ট অট্ট হাসে রে
হাহাহা হাহাহা হাহাহা! খ
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়! গ
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়! ঘ

ক পর্যন্ত অংশ অভিনয়ের ঢঙে ভাঙা বা অনিয়মিত তালে

খ পর্যন্ত অংশ তালে স্পষ্টতঃ নৃত্যের আঙ্গিকে

গ পর্যন্ত অংশ ভাঙা তালে

ঘ পর্যন্ত অংশটুকু (বিশেষতঃ 'শ্যামা মায়ের জয়') বিলম্বিত লয়ে গেয়

বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে কালমৃগয়ার গায়কী বা গায়নপদ্ধতির বেশী পার্থক্য নেই। পূর্বালোচিত সূত্রটি এই গীতিনাট্যের গানগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। জীবনস্মৃতির পাঠকের জানা আছে, গীতিনাট্যের কিছু অংশ অবিকৃত বা সামান্য বিকৃত অবস্থায় বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে সংযোজিত।[১০] গানগুলি যথাক্রমে :

১. ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে (রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে)

২. বনে বনে সবে মিলে (এই বেলা সবে মিলে)

৩. গহনে গহনে যা রে তোরা

৪. চল্ চল্ ভাই

৫. প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে

৬. ঠাকুরমশয় দেরি না সয় (সর্দার মশায় দেরি না সয়)

৭. আঃ বেঁচেছি এখন

৮. কে এল আজি এ

৯. এনেছি মোরা এনেছি মোরা

এই গানগুলি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বনদেবীগণের 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে' গানটি এই গীতিনাট্যে গাইবার নির্দেশ রয়েছে :

সকলে। ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে।

দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা—
তৃতীয়। ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হরষে।
সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—
প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

কালমৃগয়া গীতিনাট্যের গায়ন-পদ্ধতির দিক থেকে বিশেষভাবে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি-প্রতিভার গানগুলির স্বরলিপি সাম্প্রতিক কালে যদিও তাল ভাগ করে করা হয়েছে, প্রথমে কিন্তু এই ধরণের তালের কোনো উল্লেখ চোখে পড়ে না।[১১] বাস্তবিকপক্ষে, সম্পূর্ণভাবে তালের নির্দেশ দেওয়া কতখানি সঙ্গত, তা ভেবে দেখার বিষয়। সে যাই হোক, কালমৃগয়াতে কিন্তু তালের নির্দেশ রয়েছে, এমন-কি পরবর্তী গীতিনাট্য মায়ার খেলাতেও। বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে এই ছুখানি গীতিনাট্যের এই পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কালমৃগয়া গীতিনাট্যে মোট ৩৯টি গান রয়েছে। গানগুলির সঙ্গে নিম্নলিখিত তালগুলি ব্যবহৃত :

১. বেলা যে চলে যায়— ঝাঁপতাল
২. ও ভাই দেখে যা— ত্রিতাল
৩. ও দেখবি রে ভাই— খেমটা
৪. কাল সকালে উঠব মোরা— খেমটা
৫. সমুখেতে বহিছে— ত্রিতাল
৬. ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে— খেমটা
৭. নেহারো লো সহচরী— ত্রিতাল
৮. জল এনে দে রে বাছা— ঝাঁপতাল
৯. না না, কাজ নাই— ত্রিতাল
১০. আমা-তরে অকারণে— ত্রিতাল

১১. গহন ঘন ছাইল— ত্রিতাল
১২. ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন— ত্রিতাল
১৩. আয় লো সজনী— ত্রিতাল
১৪. কী ঘোর নিশীথ— ত্রিতাল
১৫. মানা না মানিলি— ত্রিতাল
১৬. বনে বনে সবে মিলে— কাহার্‌বা
১৭. জয়তি জয় জয় রাজন্— কাহার্‌বা
১৮. গহনে গহনে যা রে— দাদরা
১৯. চল্ চল্ ভাই — কাহার্‌বা
২০. প্রাণ নিয়ে তো— খেমটা
২১. ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়— একতালা
২২. আঃ বেঁচেছি এখন— তাল ফেরতা
২৩. এনেছি মোরা, এনেছি মোরা— (তালের উল্লেখ নেই তাল-বিভাগ আছে— ১২৩। ১২৩॥)
২৪. কে এল আজি এ— তেওড়া
২৫. না জানি কোথা এলুম— ত্রিতাল
২৬. হা, কী দশা হল— ত্রিতাল
২৭. কী করিনু হায়— আড়াঠেকা
২৮. কী দোষ করেছি— ঝাঁপতাল
২৯. আমার প্রাণ যে ব্যাকুল— মধ্যমান
৩০. বলো বলো পিতা— ত্রিতাল
৩১. কে জানে কোথা— কাওয়ালি
৩২. এতক্ষণে বুঝি এলি রে— চৌতাল
৩৩. অজ্ঞানে করো হে— ত্রিতাল
৩৪. কী বলিলে, কী শুনিলাম— ত্রিতাল

৩৫. ক্ষমা করো মোরে— ঝাঁপতাল

৩৬. আহা, কেমনে বধিল তোরে— আড়াঠেকা

৩৭. শোকতাপ গেল— ঝাঁপতাল

৩৮. যাওরে অনন্তধামে— ঝাঁপতাল

৩৯. সকলি ফুরাইল— একতাল

তাল নির্দেশ সত্ত্বেও, ভাবানুযায়ী যে গানগুলির অভিনয় দরকার সেকথা স্বীকার্য। এক্ষেত্রে অভিনয়ের দিকে স্বচ্ছন্দে পূর্বালোচিত রীতি অনুসারে তালগুলিকে ভেঙে গাওয়া যেতে পারে। 'আঃ বেঁচেছি এখন' অথবা 'প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি'— এই জাতীয় গানের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, এগুলি সম্পূর্ণভাবে তালে গাইলে রস ব্যাহত হয়।

এই গীতিনাট্যে যদিও তালের নির্দেশ রয়েছে, তথাপি এইনির্দেশ পুরোপুরি বজায় রেখে অভিনয় করতে গেলে নিঃসন্দেহে রসের হানি ঘটে। তবে, বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে এই গীতিনাট্যের তুলনায় বলা যায়— এই গীতিনাট্যের অভিনয়গত উপযোগিতা অপেক্ষাকৃত কম। দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্ধঋষির 'জল এনে দে রে বাছা' গানটির উল্লেখ করা চলে :

জল এনে দে রে বাছা, তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে॥

মেঘগর্জন

না, না, কাজ নাই, যেয়ো না বাছা,
গভীরা রজনী ঘোর, ঘন গরজে—
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!
কেহ নাই— কেহ নাই—

তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে।
তোরেও কি হারাব বাছা রে—
সে তো প্রাণে স'বে না॥

এই চরিত্রটির অভিনয়ে, বলাই বাহুল্য, আঙ্গিকাভিনয়ের খুব বেশি সুযোগ নেই, অন্ধচরিত্রের প্রকাশ স্বভাবতই সংহত হওয়া উচিত। 'জল এনে দে রে বাছা' ও 'না না, কাজ নাই'— গান-দুটির মধ্যে 'মেঘগর্জনে'র নির্দেশ রয়েছে: তার জন্য অন্ধঋষির যে ব্যাকুলতা, তার প্রকাশ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মুখের অভিব্যক্তিতে হওয়াই বিধেয়। গীতিনাট্যে শুধু বাচিক নয়, আঙ্গিকাভিনয় একটি মুখ্য দিক। য়ুরোপীয় অপেরার ক্রমবিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখি, সেখানে ধীরে ধীরে আঙ্গিকাভিনয়ের স্থান বেড়েছে। এই সূত্রেই এসেছে নৃত্যের আঙ্গিক। বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে এই সুযোগ রয়েছে। এইজন্যেই শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ শিল্পীর বিশ্বাস, নৃত্যনাট্য হিসেবে বাল্মীকি-প্রতিভাকে নতুনভাবে পরীক্ষা করা যায়।[১২] এইজন্যেই বলছি, কালমৃগয়া গীতিনাট্যে আঙ্গিকাভিনয়ের উপযোগিতা অপেক্ষাকৃত কম।

কালমৃগয়ার আলোচনার প্রারম্ভে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানগুলির তাল-নির্দেশ দেওয়া আছে। অর্থাৎ গায়কীর দিক থেকে বলা যায়, এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের সময় তালের শাসন মেনে চলা দরকার। বিষয়টি পরে ব্যাখ্যা করা হবে। আপাততঃ তালের দিকে লক্ষ্য রেখে গানগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে:

১. মোরা জলে স্থলে— একতালা
২. পথহারা তুমি— একতালা
৩. জীবনে আজ কি — কাওয়ালি

৪. কাছে আছে— খেমটা
৫. যেমন দক্ষিণে বায়ু— কাওয়ালি
৬. মনের মতো কারে— খেমটা
৭. সখী, সে গেল— খেমটা
৮. প্রেমের ফাঁদ পাতা— ঝাঁপতাল
৯. যেয়ো না, যেয়ো না— ঝাঁপতাল
১০. কে ডাকে — কাওয়ালি
১১. এসেছি গো এসেছি— খেমটা
১২. ওকে বলো সখী— খেমটা
১৩. মিছে ঘুরি— ঢিমেতেতালা
১৪. তারে দেখাতে পারি নে— ঝাঁপতাল
১৫. সখা, আপন মন— রূপক
১৬. আমি জেনে শুনে— রূপক
১৭. ভালোবেসে যদি সুখ— কাওয়ালি
১৮. দেখো চেয়ে— ঝাঁপতাল
১৯. সুখে আছি, সুখে আছি— খেমটা
২০. ভালোবেসে দুখ সেও— একতালা
২১. ওই কে গো হেসে— কাওয়ালি
২২. দূরে দাঁড়ায়ে— তালফেরতা
২৩. প্রেমপাশে ধরা— খেমটা
২৪. ওগো, দেখি আঁখি— একতালা
২৫. ওকে বোঝা গেল না— কাওয়ালি
২৬. দিবসরজনী আমি —একতালা
২৭. সখী, সাধ করে— তালফেরতা
২৮. আমি হৃদয়ের কথা — একতালা

২৯. নিমেষের তরে শরমে— কাওয়ালি
৩০. ওগো সখী— আড়খেমটা
৩১. এ তো খেলা নয়— কাওয়ালি
৩২. ওই মধুর মুখ জাগে— একতালা
৩৩. তারে কেমনে ধরিবে— কাওয়ালি
৩৪. সকল হৃদয় দিয়ে— ঢিমেতেতালা
৩৫. তুমি কে গো— খেমটা
৩৬. তবে সুখে থাকো— কাওয়ালি
৩৭. সেই শান্তিভবন— কাওয়ালি
৩৮. কাছে ছিলে দূরে গেলে— আড়খেমটা
৩৯. দেখো সখা ভুল করে— কাওয়ালি
৪০. ভুল করেছিনু, ভুল— কাওয়ালি
৪১. অলি বার বার— খেমটা
৪২. ওই কে আমায়— কাওয়ালি
৪৩. বিদায় করেছ— যৎ
৪৪. আমি চলে এনু— কাওয়ালি
৪৫. সে দিনও তো মধুনিশি —যৎ
৪৬. না বুঝে কারে তুমি— কাওয়ালি
৪৭. আমি কারেও বুঝি নে— আড়াঠেকা
৪৮. প্রভাত হইল নিশি— আড়াঠেকা
৪৯. মধুনিশি পূর্ণিমার— যৎ
৫০. এস' এস' বসন্ত— রূপক
৫১. মধুর বসন্ত এসেছে— যৎ
৫২. আজি আঁখি— কাওয়ালি
৫৩. একি স্বপ্ন— কাওয়ালি

৫৪. আহা, আজি এ বসন্তে— ১

৫৫. আমি তো বুঝেছি— ঝাঁপতাল

৫৬. এতদিন বুঝি নাই— যৎ

৫৭. চাঁদ, হাসো হাসো— খেমটা

৫৮. আর কেন— আড়াঠেকা

৫৯. এ ভাঙা সুখের— ঝাঁপতাল

৬০. যদি কেহ নাহি চায়— কাওয়ালি

৬১. দুখের মিলন— ঝাঁপতাল

৬২. কেন এলি রে— ঝাঁপতাল

৬৩. এরা সুখের লাগি— একতালা

এই তালিকার দিকে লক্ষ রাখলেই চোখে পড়ে তালগুলি ব্যবহৃত হয়েছে গানের ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে :

ক. কাওয়ালি— ৩, ৫, ১০, ১৭, ২১, ২৫, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৫২, ৫৩, ৬০ -সংখ্যক গান

খ. খেমটা— ৪, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৯, ২৩, ২৫, ৪১, ৫৭ -সংখ্যক গান

গ. আড়খেমটা— ৩০, ৩৮ -সংখ্যক গান

ঘ. ঝাঁপতাল— ৮, ৯, ১৪, ১৮, ৫৫, ৫৯, ৬১, ৬২ -সংখ্যক গান

ঙ. একতালা— ১, ২, ২০, ২৪, ২৬, ২৮, ৩২, ৬৩ -সংখ্যক গান

চ. যৎ— ৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫১, ৫৬ -সংখ্যক গান

ছ. আড়াঠেকা— ৪৭, ৪৮, ৫৮ -সংখ্যক গান

জ. রূপক— ১৫, ১৬, ৫০ -সংখ্যক গান

ঝ. ঢিমেতেতালা— ১৩, ৩৪ -সংখ্যক গান

ঞ. তাল ফেরতা— ২২, ২৭ -সংখ্যক গান

বস্তুতঃ এই গীতিনাট্যে খেমটা তালে সর্বসমেত ১০খানি গান গাইবার নির্দেশ রয়েছে। এই গানগুলির সুরের ও ভাবের দিক থেকে চটুলতা ফুটে উঠেছে। কাজেই খেমটা তালে তার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। অন্যান্য তালের প্রসঙ্গেও এই কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, অভিনয়ের সময় এই তালগুলি কতখানি মানা চলে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলি নাটকীয়ভাবে গাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। তালের উল্লেখ থাকলেও তিনি তাল-গুলি ভেঙে গাইবার নির্দেশ দিতেন।[১৪] এক কথায়, ভাবানুযায়ী তালগুলিকে বুঝে গানগুলি গাওয়া দরকার। আর, নাটকীয়তার জন্যেই তাল বজায় রেখেও লয়ের তারতম্য ঘটতে পারে, কখনো বিলম্বিত, কখনো মধ্যম, কখনো বা দ্রুত। তবে, এই গীতিনাট্যে কোনো দ্রুতলয়ের সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। বিশেষভাবে, এই গীতিনাট্যের একক গানগুলিতে এই গায়কী অনুসরণ করা উচিত। কিভাবে লয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি গান বিশ্লেষণ করা গেল :

দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল,
কপোলে পড়িছে বারেবার।

এই গানটির প্রথম চরণের লয়টি কিভাবে ভাবকে অনুসরণ করেছে, বা আবেগ অনুযায়ী সুরারোপ করা হয়েছে, তা লক্ষণীয় :

র   প
॥ { মা ম্রা মা পা I র্সা - া - া - া I র্সর্রা র্সনা ধা পা I
দে লো স খী দে ০ ০ ● পরা ইয়ে গ লে
পধা পমা ধপা মগা I র্‍া - া - া - া I - া - া - া (মা)} I
সাধে রব কুল ফুল হা ০ ০ ০ ০ ● ০ র

'দে লো সখী' একটু দ্রুত লয়, 'দে' প্রায় বিলম্বিত, 'পরাইয়ে গলে সাধের বকুল ফুল' দ্রুত লয় এবং 'হার' বিলম্বিত লয়। এইভাবে ভাবের বা আবেগের উপর নির্ভর করে লয়ের পরিবর্তন ঘটেছে, যদিও এজন্যে তালের কোনো বৈকল্য ঘটে নি। 'পরাইয়ে গলে সাধের বকুল ফুল' এবং 'হার'— দুই-ই ৮ মাত্রার, কিন্তু প্রথমটিতে অনেকগুলি ধ্বনির বা অক্ষরের সমাবেশ, দ্বিতীয়টিতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম ধ্বনি, যদিও মাত্রা সংখ্যা সমান। এইভাবে একাধিক রাগ বিশ্লিষ্ট করে দেখানো যায় যে, অনেক সময় তাল বজায় রেখেও শুধুমাত্র লয়ের পরিবর্তন আনা যায় এবং তাতে অভিনয়ের দিক থেকে সুবিধাই হয়। সুতরাং তালগুলি বুঝে গানগুলি গাওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, খেমটা বা আড়খেমটা তালে কোনো গান যদি বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয় রসহানি ঘটবে। 'দূরে দাঁড়িয়ে আছ' এবং 'সখী সাধ করে' গান দুখানিতে তালেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

এ ছাড়াও, এই গীতিনাট্যে সমবেত গানগুলির (মায়াকুমারীগণের ও সখীগণের) গায়নপদ্ধতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি-প্রতিভার সমবেত গানগুলি কোরাস পদ্ধতিতে গেয়। কাল-মৃগয়াতে 'ঝম্ ঝম্ ঘন্ ঘন রে' গানটির আলোচনা ইতিপূর্বে

করা হয়েছে। এই গীতিনাট্যে 'মোরা জলে স্থলে কত ছলে' গানটির নির্দেশ মূল গ্রন্থে দেওয়া আছে। 'সুখে আছি সুখে আছি' কিভাবে প্রমদা ও সখীগণ পালা করে গেয়েছে, তাও লক্ষ্য করার মতো। এই গানটির 'মধুর জীবন মধুর রজনী' থেকে শেষের অংশটুকু বিলম্বিত লয়ে গাইতে হয়। প্রথমে প্রমদা একা গাইবার পর, সকলে পালা করে গেয়ে থাকে।[১৫]

১.	সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন-মনে	—	প্রমদা
২.	সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন-মনে এবং—কিছু চেয়োনা	—	সখীগণ
১.	দূরে যেয়ো না	—	প্রমদা
২.	শুধু চেয়ে দেখো	—	সখীগণ
১.	শুধু চেয়ে দেখো	—	প্রমদা
২.	শুধু ঘিরে থাকো	—	সখীগণ
৩.	শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি··· আপন মনে	—	প্রমদা ও সখীগণ
১.	সখা, নয়নে ··· প্রাণ	—	প্রমদা
২.	আমায় ··· প্রাণ	—	সখীগণ
১.	রচিয়া ··· গান	—	প্রমদা
২.	রচিয়া ··· গান	—	সখীগণ

তার পর বিলম্বিত লয়ে—

১.	গোপনে ··· মালাগাছি	—	প্রমদা
২.	গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি মন চেয়ো না, দূরে যেয়ো না	—	সখীগণ

১.	শুধু ঘিরে থাকো	—	প্রমদা
২.	শুধু ঘিরে থাকো	—	সখীগণ
৩.	সখী ঘিরে থাকো কাছাকাছি সুখে আছি ··· আপন মনে }	—	প্রমদা ও সখীগণ

এরই পাশাপাশি 'এস' এস' বসন্ত ধরাতলে' সমবেত গানটি স্মরণযোগ্য। এ গানটিও পালাক্রমে স্ত্রীগণ, পুরুষগণ এবং স্ত্রীগণ ও পুরুষগণ গেয়ে থাকে।[১৬]

সবশেষে উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিত গানগুলি বিনা তালে গাইলে ভালো হয়।

১. আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
২. কেন এলি রে, ভালোবাসিলি
৩. আর কেন, আর কেন

এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, গীতিনাট্যের এই গায়ন-পদ্ধতি বা গায়কী অভিনয়কেন্দ্রিক এবং তা যে বাংলা গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অভিনব, তাও স্বীকার্য। এই গায়কীর মধ্যে সঙ্গীতের একটি নতুন রূপ দেখতে পাচ্ছি। গীতিনাট্যের সুর-সমাবেশ সম্বন্ধে এর পরেই আলোচনা করা হবে। আপাততঃ বলা দরকার, সঙ্গীতকে এইভাবে নাটকের কাজে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত অন্যত্র চোখে পড়ে না। গীতিনাট্যের এই সাফল্য পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিককে প্রভাবিত করেছে। গান যে নাটকীয়তাসূত্রে বিভিন্ন ভাব প্রকাশে এবং চরিত্রের রূপায়ণে সক্ষম, গীতিনাট্যের এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের মধ্যে আর-একভাবে ব্যবহার করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ এই আলোচনার পূর্বাপরতা সূত্রে আরো একটা কথা স্মরণীয়। গীতিনাট্যের গানগুলি স্বাধীনভাবে ভাবানুযায়ী গাইতে হয়

বলে গানের (সংলাপের) ফাঁকে ফাঁকে নির্বাক আঙ্গিকাভিনয় বা মূকাভিনয়ের অবকাশ থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বাল্মীকি-প্রতিভার ব্যাধদের শিকারের দৃশ্যটি উল্লেখ করা যায়। ব্যাধরা শিকারে বেরিয়েছে, পাখি দেখা, শিকারের আয়োজন,[১৭] বাল্মীকির বাধা ও অনুরোধ, ব্যাধদের প্রত্যাখ্যান— এসব ভাবগুলি, 'দেখ, দেখ দুটো পাখি গাছে বসেছে' গানটির সঙ্গে আঙ্গিকাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা দরকার। স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে পরিমিত অবকাশ প্রয়োজন। একে বিরতি বলে ভাবলে ভুল হবে ; বরং তা পরবর্তী অংশের অভিনয়ে সাহায্য করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ বিষয়ে মাত্রাবোধ থাকা চাই। মঞ্চে যখন কোন একটা দৃশ্যের অভিনয় চলতে থাকে, তখন তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে একটা ছন্দোস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে, যা মঞ্চ, দৃশ্য পট, অভিনয়, আলোকসম্পাত— এ সবের সমন্বিত সংহতিতে সৃষ্ট। এবং কোনো একটির সংহতি নষ্ট হলে সেই নিঃশব্দ ছন্দোস্রোত— যা দর্শকের মনকে অলৌকিকের স্পর্শ দেয়, তা ব্যাহত হতে বাধ্য। এ বিষয়ে অভিনেতার বা শিল্পীর সচেতন হওয়া দরকার,[১৮] বাস্তবিকপক্ষে, অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যে সুরসংগতির সৃষ্টি হয়, তাকেই অন্যভাবে বলা যায় মঞ্চের ছন্দ, যা সার্থক শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্যভাবে নিহিত থাকে। Vakhtangov প্রসঙ্গক্রমে বলতে চান যে, এর ব্যতিক্রম হলে ঘটে শিল্পীর ও শিল্পের মৃত্যু।[১৯] তাই বলছি, ভাঙা বা অনিয়মিত তালে গাওয়ার অর্থ বিশৃঙ্খলভাবে গাওয়া নয়, সংলাপের মধ্যবর্তী বিরতির অর্থ থেমে থাকা নয়। রবীন্দ্রনাথকে যখন বলতে শুনি— গীতিনাট্যের স্থানবিশেষে এ তাল না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়, তখন মনে হয়— অভিনয়ের এই তাৎপর্যের প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। ভাবানুযায়ী গাইতে বলার পিছনেও এই যুক্তি রয়েছে। এই গায়কী অবশ্য একদিক থেকে বিচার করলে

ব্যবহারিক শিক্ষাসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গান গাওয়ার পক্ষপাতী, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরই স্বকণ্ঠে গাওয়া গানগুলি স্মরণীয়।[২০] 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে' গানটি এর অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'তবু', 'মনে রেখো'— বারবার বিভিন্ন ঢঙে গাইবার ভঙ্গিটি লক্ষণীয়। বলাই বাহুল্য, কখনো স্তব্ধতা, কখনো উদ্‌বেগ, কখনো গভীর ব্যগ্রতা— এইসব ভাবাবেগ কবিকণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সুর-সমাবেশ

অতঃপর গীতিনাট্যগুলির সুর-সমাবেশের আলোচনা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে একসময় ধারণা ছিল, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে এ সঙ্গীতের কোনো যোগ নেই কিংবা রবীন্দ্রনাথ নাকি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ গুণী ও বিদ্বজ্জন তাঁদের মূল্যবান আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন, এ ধারণা আদৌ সত্য নয়। বরং একটু চেষ্টা করলেই সহজে দেখানো যায়, প্রায়শঃইভারতীয় উচ্চাঙ্গ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীত বা পাশ্চাত্য) সঙ্গীতের ভিত্তির উপরই রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে যে কথা বলেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য : আমি বলব, আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না ; আমরা যা কিছু সৃষ্টি করি না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি থেকে যাবে। আমাদের সেই আত্মা, সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্বতনকালে কীর্তনগানে— বাউলে ছিল। সেই-রকম আজ যদি বাঙালী আপনাকে সঙ্গীতে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে, সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না— যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যাকিছু করবে নিজেকে মুক্ত করে—নকল করে

নয়।[২১] এ উক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই বহুদিনের সাধনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু একথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, 'নিজেকে মুক্ত করার' প্রবণতাই নকল করা থেকে দূরে রেখে তাঁকে নতুন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছে। আবার একথা খুবই সত্যি যে, যে-কোনো শিল্পীকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় সৃষ্টি করার আগে। সঙ্গীত বা শিল্পের দুটি দিক, ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক। পরিপূর্ণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দুয়েরই জ্ঞান আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ একে অন্যভাবে বলেছেন কলাকৌশল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকেও এই শিক্ষা নিতে হয়েছে। প্রথম গীতিনাট্য এই শিক্ষাপর্বেরই উৎসার। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে সঙ্গীতের যে-সব দৃষ্টান্ত ছিল অথবা যা তাঁর শিক্ষার বা অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল, কোনো-না-কোনো ভাবে সেই-সব আদর্শের অনুসরণে তিনি এই পর্বের গানগুলি রচনা করেছেন। এই জন্যেই বলা হয়েছে, বাল্মীকি-প্রতিভার যুগ শিক্ষানবিশির যুগ।[২২] বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়ার সুর-সমাবেশ সম্পর্কে এইটেই মূলকথা।

বাল্মীকি-প্রতিভার সুর-সমাবেশের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, এই গীতিনাট্যে তিনি প্রায় ২৭টি রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ৮টির মতো মিশ্ররাগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সুরারোপের দিক থেকে গানগুলি সন্নিবেশ করা গেল :

প্রথম দৃশ্য

১. সহে না সহে না কাঁদে— সিন্ধু কাফি

২. আঃ বেঁচেছি এখন— মিশ্র সিন্ধু

৩. এনেছি মোরা এনেছি— মিশ্র ঝিঁঝিট

৪. আজকে তবে মিলে— কাফি

৫. এক ডোরে বাঁধা— খাম্বাজ

৬. এখন করব কী বল— পিলু
৭. শোন্ তোরা তবে শোন্— ঝিঁঝিট
৮. ত্রিভুবনমাঝে— বেলাবতী
*৯. কালী কালী বলো রে— জংলা ভূপালী
১০. ওই মেঘ করে বুঝি— মিশ্র মল্লার
১১. এ কী এ ঘোর বন— দেশ
১২. পথ ভুলেছিস— পিলু
১৩. মরি ও কাহার বাছা— মিশ্র ঝিঁঝিট

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৪. রাঙাপদপদ্মযুগে— বাগেশ্রী
১৫. দেখো হো ঠাকুর— কাফি
১৬. নিয়ে আয় কৃপাণ— কানাড়া
১৭. কী দোষে বাঁধিলে— ঝিঁঝিট
১৮. এ কেমন হল— সিন্ধু ভৈরবী
১৯. আরে কী এত ভাবনা— পরজ
২০ শোন্ তোরা শোন্— দেওগিরি

তৃতীয় দৃশ্য

২১. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে— খাম্বাজ
২২. ছাড়ব না ভাই— মিশ্র বাগেশ্রী
২৩. রাজা মহারাজা কে জানে— কানাড়া
২৪. আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা— খাম্বাজ
২৫. আঃ কাজ কি গোলমালে— মিশ্র সিন্ধু
২৬. হা, কী দশা— গারা ভৈরবী
২৭. এত রঙ্গ শিখেছ— ভাটিয়ারী
২৮. অহো! আস্পর্ধা— বেহাগ

২৯. আয় মা আমার সাথে— ভৈরবী

চতুর্থ দৃশ্য

৩০. রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে— মল্লার
৩১. কোথায় জুড়াতে আছে— বেহাগ
৩২. কেন রাজা ডাকিস— সুরট
৩৩. এইবেলা সবে মিলে— ইমনকল্যাণ
৩৪. গহনে গহনে যা রে— বাহার
৩৫. চল্ চল্ ভাই— অহং
৩৬. কে এল আজি— মিশ্রমল্লার
৩৭. প্রাণ নিয়ে তো— দেশ
৩৮. বলব কী আর— গৌরী
৩৯. সর্দার মশায়— শংকরা
৪০. রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু— বাহার
৪১. আর না, আর না— নটনারায়ণ

পঞ্চম দৃশ্য

৪২. জীবনের কিছু হল না— হাম্বীর
৪৩. দেখ্ দেখ্ দুটো পাখি— মিশ্র পূরবী
৪৪. থাম্ থাম্ কী করিবি— সিন্ধু ভৈরবী
৪৫. কী বলিনু আমি— বাহার
৪৬. এ কি এ, এ কি এ— ভূপালী
৪৭. শ্যামা, এবার ছেড়ে— রামপ্রসাদী
৪৮. কোথা লুকাইলে— টোড়ী
৪৯. কেন গো আপন— সিন্ধু
৫০. কোথায় সে উষাময়ী— টোড়ী
৫১. বাণী বীণাপাণি— ভৈরোঁ

৫২. এই যে হেরি গো দেবী—বাহার

এই তালিকার দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়— বাল্মীকি-প্রতিভার সুরযোজনার মূল বিশেষত্বগুলি যথাক্রমে :

১. সবগুলি গানই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. কোনো বিশেষ আদর্শের অনুসরণে অধিকাংশ সুরারোপ করা হয়েছে।

৩. গানগুলি রাগ-রাগিণীতে রচিত হলেও নাটকের প্রয়োজনে সেগুলি নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলার কিছু থাকে না। কেননা, উপরোক্ত তালিকায় রাগ-রাগিণীগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্য রচনা করার সময় এই রাগ-রাগিণীগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এবং এইভাবে সেগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এখানে এইটা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘মানময়ী’ এবং ‘বসন্ত-উৎসবে’ বিশেষ করে ‘মানময়ী’তে, যতগুলি রাগ-রাগিণীর[২৩] ব্যবহার রয়েছে তার প্রায় সবগুলিই বাল্মীকি-প্রতিভায় ব্যবহৃত। উনিশ শতকের গীতিনাট্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, ঐসব গানেও রাগ-রাগিণীর ব্যবহার রয়েছে। ৫২টির মতো রাগ-রাগিণীর ব্যবহার ঐসব গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কয়েকটি অপ্রচলিত রাগ, যেমন—কুকুভ, সরফর্দা, লুম, গারা ইত্যাদি কোনো কোনো গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হতে দেখি। বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যেও ঐসব রাগ-রাগিণীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু মিশ্র রাগেরও পরিচয় পাওয়া যায় ঐসব গীতিনাট্যে। যেমন— সুরট-খাম্বাজ, ললিত-যোগিয়া, খট-রামকেলি, ঝিঁঝিট-

খাম্বাজ, কানাড়া-বসন্ত, গৌড়-সারং, ভৈরব-বাহার, পঞ্চম-বাহার, সোহিনী-বাহার, পরজ-কালাংড়া ইত্যাদি। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতেও মিশ্ররাগের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। কিন্তু নানা রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ বিশেষভাবে যেন বাংলা গানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা সংস্কৃতির এইটেই মূলকথা। আসলে বহুর সমন্বয়ে নতুন সৃষ্টির প্রবণতা আমরা বাংলা সঙ্গীতেও দেখতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত থেকে উপাদান সংগ্রহ করেও কয়েকটি রাগ-রাগিণীর স্বতন্ত্র রূপ গড়ে উঠেছে বাংলার মাটিতে। যেমন— বসন্ত, ভৈরব, রামকেলী, আশাবরী, পূরবী, বেহাগ।[২৪] উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটারে বা যাত্রায়, নিধুবাবু প্রভৃতির গানেও এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথ নিজেও উল্লেখ করেছেন— কীর্তনও রাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই অনন্যতা লাভ করেছে। দেখা যাচ্ছে— যা পরবর্তীকালের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য, সেই মিশ্রণের বা মিশ্র-রাগের দৃষ্টান্ত বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যেও রয়েছে।

এই গীতিনাট্য মূলতঃ শিক্ষানবিশির ফসল বলেই, খুবই স্বাভাবিক যে, এই গানগুলিতে কোনো-না-কোনো আদর্শের অনুসরণে সুর-যোজনা করা হয়েছে। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জন এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত[২৫] দেওয়া গেল :

	পুরোবর্তী আদর্শ	রাগতাল
অহো! আস্পর্ধা একি—	দারা দ্রিম তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল
এই যে হেরি গো দেবী—	মনকী কমলদল গোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে—	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	মল্লার, ত্রিতাল
হা, কী দশা হল আমার—	হাল মে রবে রবা	বেহাগ-খাম্বাজ ত্রিতাল

এই বেলা সবে মিলে— চতুরঙ্গ রসঘন
আয় মা আমার— মা একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন
থাম্ থাম্ কী করিবি— যে যাতনা যতনে

এ ছাড়া 'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা' গানটি রামপ্রসাদের গানের আদর্শে রচিত। তেলেনা গানের অনুসরণে 'এই বেলা সবে মিলে' গানটি রচনা করা হয়েছে। আরও কয়েকটি গানে অনুরূপ ঢঙ চোখে পড়া বিচিত্র নয়। 'কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে' গানটিও 'এ ভরা বাদর' গানের সুর অনুসরণ করেছে। ইন্দিরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথার মধ্যে বলেছেন যে, তৎকালীন ব্যাণ্ডসঙ্গীতের আদর্শেও কোনো কোনো গান রচিত। যেমন 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা' গানটি। সম্ভবতঃ শুধু দস্যুদের সমবেত গানেই এই প্রভাব পড়েছে। 'তবে আয় সবে আয়' গানটিও এদিক থেকে স্মরণীয়। তা ছাড়া তিনি প্রত্যক্ষভাবে 'মরি ও কাহার বাছা' এবং 'কালী কালী বলো রে আজ' গানদুটি যে যথাক্রমে টমাস ম্যুরের 'Go where glory waits thee' এবং ষ্টিফেন অ্যাডম্‌স্-এর 'Nancy Lee'-র আদর্শে রচিত, তাও উল্লেখ করেছেন। জীবনস্মৃতির পাঠকের জানা আছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এইসব অনুকৃতির কথা স্বীকার করেছেন।

এই অনুকৃতি বা আদর্শানুসরণের প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, মূল গানের সুর বা তাল তিনি গীতিনাট্যের গানের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। মূল সুরের বিকৃতি বা ব্যতিক্রম প্রায় ঘটে নি বললেই হয়। যেমন 'অহো আস্পর্ধা একি' গানটি মূলেও ছিল বেহাগে। টমাস ম্যুর বা ষ্টিফেন অ্যাডম্‌স্-এর গান দুটির সুরও যথাযথভাবে বজায় রাখা হয়েছে। Nancy Lee গানটির প্রথমে নির্দেশ রয়েছে 'With Spirit' এবং বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ উদ্দীপনামূলক সুর হিসেবেই তা ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং বলা যায়, অন্য সম্পদকে নিজের করে নিয়ে তাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করার মধ্যে নিশ্চয়ই কৃতিত্ব আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্যের সুরযোজনায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন, এ কথা স্বীকার করেও বলতে হয়—সমস্ত উপাদানকে মিলিয়ে তিনি এক নতুন সৃষ্টির কাজে লাগাতে পেরেছেন এবং এখানেই তাঁর প্রতিভার অপূর্বত্ব।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি ব্যাপক আলোচনাসাপেক্ষ। এর সুরুতেই প্রাসঙ্গিকবোধে জীবনস্মৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা গেল :

এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে ; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা, আশা করি, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।

দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যখন তিনি বলেন যে, এই গীতিনাট্যের সুরগুলিকে 'বৈঠকি মর্যাদা' থেকে বের করে নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে, কিংবা উড়ে চলা যার ব্যবসা তাকে মাটিতে দৌড় করাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তখনই মনে হয়—এই উক্তি নিছক ভাবোচ্ছ্বাস নয়, এর মধ্যে কবির গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নানাসূত্রে মূল সঙ্গীতের আলোচনা ছাড়াও কবি নানাভাবে সঙ্গীত-প্রসঙ্গে অসংখ্য মন্তব্য করেছেন। ভারতীয়, তথা

য়ুরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য হল 'য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন।' য়ুরোপীয় গান সম্বন্ধে তাঁর মনে হয়েছে 'এ সঙ্গীত রোমান্টিক'। আর 'আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।' য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, বাস্তব-জীবনের সঙ্গে এ সঙ্গীতের একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো অসংখ্য ঘটনা ও বর্ণনাকে আশ্রয় করে য়ুরোপীয় সঙ্গীত বাস্তব-জীবনের সঙ্গে গভীর ও বিচিত্রভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে, ভারতীয় সঙ্গীতের আবেদন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টনকে অতিক্রম করে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপ উদ্ঘাটনের মধ্যে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বাস্তব-জীবনের সঙ্গে এই যোগ থাকার জন্যেই, তার সাঙ্গীতিক ইতিহাসের বারবার পালাবদল হয়েছে। মেলডি থেকে হারমনির ক্রমোত্তরণের ধারাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমার নিজের বিশ্বাস, অপেরা বা ব্যালেতে সঙ্গীতকে যে বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি, তার মূলকথা সঙ্গীতকে নিত্য নতুনভাবে কাজে লাগানো এবং তার পিছনে বাস্তব-জীবনেরই তাগিদ অনুভব করা যায়। বীটোফেন, মোজার্ট, ওয়াগ্‌নার থেকে স্থুরু করে স্ত্রাভিন্‌স্‌কি প্রমুখ সঙ্গীতবিদ্‌দের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে এ কথা বলা যায়। তা ছাড়া, এই সঙ্গীতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হচ্ছে বাস্তবানুকরণ। অপেরার সুর-সমাবেশেরও মূল কথা এই। মানব-হৃদয়ের ভাব ও ভাবনাগুলি সুরের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সেই সুযোগ উপাদান ও প্রশস্ত পথ খোলা থাকার জন্যে সহজেই সঙ্গীতকে ইচ্ছামত নাটকের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের মেজাজ ঠিক এর বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বৈঠকি মর্যাদা' বাঁচাবার সাধনাই যেন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের মূল লক্ষ্য। এ কথার যুক্তি হিসেবে বলা যায়, এই সঙ্গীত যথার্থই বিভিন্ন যুগে হয় রাজসভা নয়তো দরবার, চাই কি, জন-কোলাহল থেকে দূরে একক অথবা মুষ্টিমেয় শিল্পীর সাধনায় বেড়ে উঠেছে। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি রাগ-সঙ্গীতের উচ্চ আদর্শ স্বীকার করেও বলতে হয়, এ সঙ্গীতের সঙ্গে জনসংযোগ বা বাস্তবজীবনের যোগ নিতান্তই সীমিত। জীবনাসক্তির পরিবর্তে 'বিশ্ববোধের আকৃতি'ই হয়তো এর উপজীব্য। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রথমস্তরের ইতিহাসের দিকে তাকালে অবশ্য মনে হবে সঙ্গীতকে তখন নাটকের প্রয়োজনে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। গান্ধার সঙ্গীত তার প্রমাণ। মাঝপথে পৌঁছে ভারতীয় সঙ্গীত যেন পথভ্রষ্ট। ঘরানার পর ঘরানা বেড়েছে, তান-বিস্তার, মীড় গমকের কারু-কার্যে ভারতীয় সঙ্গীতের সাত-মহলা অট্টালিকাও রচিত হয়েছে, কিন্তু সেই আভিজাত্য ছেড়ে আঁকাবাঁকা পথে বেরিয়ে আসার অবকাশ ঘটে নি কখনো।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর ব্যবসা হচ্ছে উড়ে চলা। এই উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। William L. Purcell এশিয়ার সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের মূল কথা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে বিশ্ববোধের অন্বেষণ।[২৬] তাই যদি হয়, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'অনির্বচনীয় রহস্যের রূপের অন্বেষণ', তা হলে পূর্বানুবৃত্তি করে বলা যায়, বাস্তবজীবনের উর্ধ্বলোকে এ সঙ্গীতের যাতায়াত। এক কথায়, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর আবেদন ব্যক্তিক নয়, সর্বজনীন।

সহজ করে বলতে গেলে, ব্যক্তিবিশেষের ভাব-প্রকাশের থেকে ব্যক্তিনির্বিশেষ ভাব-প্রকাশের দিকেই তার লক্ষ্য।

বলা বাহুল্য, রাগ-সঙ্গীতের এই চরিত্র নাটকীয়তা সৃষ্টির অনুকূল নয়। অপেরাতে সুরের মধ্যে দিয়েই নাটকীয় গতি সৃষ্টি করা হয়। উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্যগুলির যে-সব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো স্বরলিপি পাওয়া যায় না, নচেৎ দেখানো যেত, ঐ সব গীতিনাট্যে কিভাবে রাগ-রাগিণীগুলি নাটকীয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। যেটুকু দৃষ্টান্ত বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ গানের সঙ্গে যে-সব রাগ ও তালের নির্দেশ রয়েছে, তা থেকে ধারণা করা যায়, রাগ-রাগিণীগুলি নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হলেও সুরের মধ্যে দিয়ে নাটকীয় গতি সৃষ্টির নমুনা প্রায় বিরল। য়ুরোপীয় অপেরার অভিনয়-পদ্ধতি হয়তো চোখের সামনে স্পষ্ট ছিল, কিন্তু সুরযোজনার পদ্ধতি সম্বন্ধে তেমন অভিজ্ঞতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল বলে মনে হয় না।

বস্তুতঃ বাল্মীকি-প্রতিভার সুর-সমাবেশের এইটেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক যে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীগুলিকে সর্বপ্রথম এই গীতিনাট্যে নতুনরূপে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, এ সঙ্গীত অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনলে এর কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নয়।

এদিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, রাগ-রাগিণীগুলি যেখানে যে ভাবের সঙ্গে খাপ খায়, সেখানে তিনি সেইভাবেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথার সঙ্গে রাগ-রাগিণীর রূপটি ঠিকমতো বজায় রেখেও এমনভাবে সাজিয়েছেন, যার ফলে রাগ-রাগিণীর চরিত্র বদলে গেছে। কথার (ভাবের) সঙ্গে মিলিয়েই রাগ-রাগিণীগুলি ব্যবহার করেছেন; যেখানে তা হয় নি সেখানে

সুরকে ছন্দের বা তালের সাহায্যে জোরালো করেছেন, বা তার চাল বদলে দিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি :

১. সহে না সহে না কাঁদে পরান— সিন্ধু কাফি

২. আয় মা আমার সাথে— ভৈরবী

৩. রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে— মল্লার

৪. কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই— বেহাগ

৫. রাঙাপদ-পদ্মযুগে— মিশ্র বাগেশ্রী ইত্যাদি।

এই গানগুলিতে প্রচলিত প্রথাকে যথাযথ বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু এমনও কিছু গান আছে, যেখানে রাগ-রাগিণীগুলি বিশেষ রচনা-রীতির জন্যে অন্যরূপে রূপান্তরিত। যেমন 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটি খাম্বাজে রচিত। খাম্বাজের আবেদন আসলে কোমল, কিন্তু একে জোরালো করা হয়েছে। মনে হয়, এর পিছনে রয়েছে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাব। অর্থাৎ 'নাটকীয়তা' আনার জন্যেই খাম্বাজের মেজাজ বা চরিত্রটি বদলে দেওয়া হয়েছে। ইংরাজীতে Staccato কিংবা Allegro ওজস্বিতা, উদ্দীপনা বা দ্রুতগতি সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় নওহর-বাণী বা খাণ্ডার বাণী চালের ধ্রুপদগানেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদ্দীপক গানের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই রীতির সঙ্গে এই পর্বে পরিচিত ছিলেন না, কেননা তখন গওহর বাণী ছাড়া অন্য চালের ধ্রুপদগানের প্রচলন বিশেষ ছিল না। অতঃপর তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, বিষম তালের ছন্দের অর্থাৎ ঝাঁপতাল, সুরফাঁক্তা, তেওড়ার সাহায্যেই উল্লাসের ভাব প্রকাশ করা যায়।[২৭] রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানের উল্লেখ করে একথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা চলে। তবে এখানে ঐ

ধরণের ধ্রুপদীয় কোনো প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। দস্যুদের অন্যান্য সমবেত (কোরাস) গানগুলির মধ্যে যেমন য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাব বা আদর্শানুসরণ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এই গানটি দেশী রাগের উপর রচিত হলেও ঐ প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এই সঙ্গে 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা' গানটির কথাও স্মরণীয়। গানটি ঝিঁঝিট রাগে রচিত হলেও ছন্দের দিক থেকে ঐ প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। 'রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু' গানটির আলোচনা-প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী বলেছেন যে, বাহারে রচিত এই গানটি মনের আবেগ প্রকাশের বাহনরূপে নতুনরূপ লাভ করেছে। এর পিছনে বাস্তবিকপক্ষে নাট্যরসেরই প্রভাব রয়েছে।

ভাবানুযায়ী বা প্রথানুযায়ী সুরারোপের দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কতখানি ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে রামপ্রসাদী সুরে 'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা' গানটির উল্লেখ করা চলে। কালী-আরাধনার সঙ্গে এই সাযুজ্যের কথা স্মরণ রেখেই যে সুরারোপ করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই গীতিনাট্যে ব্যবহৃত ম্যুরের ও ষ্টিফেন অ্যাডামের গান দুটির সুর ভাবের দিকেই লক্ষ্য রেখে যথাযথভাবে ব্যবহৃত; এক্ষেত্রে মূল গানের ভাব নয়,[২৮] সুরটিই গৃহীত হয়েছে মাত্র। তেলেনা অঙ্গের গানে যেমন— 'এই বেলা সবে মিলে'— স্বভাবতই নাটকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের গানের সুরারোপে সেইজন্যে সহজেই নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ উদ্দীপক গানের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই ধরণের গানের মধ্যে খাঁটি বা মিশ্র ভৈরবী, ইমন ভূপালী, খাম্বাজ বাহারের ব্যবহারই বেশী। তার পর মিশ্র

ভৈরবী, শংকরা এমন-কি বাউল ও কীর্তনাঙ্গ সুরের গানও অনেক আছে।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এই পর্যন্ত সাঙ্গীতিক শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনেছেন বা বলা যায়, প্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন করেন নি। কিন্তু আসল কৃতিত্ব এখানে নয়, এই কৃতিত্ব একই রাগ-রাগিণীকে নানাভাবে ব্যবহারের মধ্যে— কোথাও জোরালো, কোথাও-বা কোমল। আগেই বলেছি, তা সম্ভব হয়েছে তালের বা ছন্দের জন্যে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সিন্ধুতে রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ করা গেল :

১. সহে না সহে না কাঁদে পরান— সিন্ধু কাফি

২. আঃ বেঁচেছি এখন— মিশ্র সিন্ধু

৩. এ কেমন হল মন— সিন্ধু ভৈরবী

৪. কেন গো আপন মনে— সিন্ধু

ভৈরব রাগের অন্তর্গত সৈন্ধবী বা সিন্ধুকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা লক্ষ্য করার মতো। ভৈরব রাগের অন্তর্গত বলে সিন্ধুর আবেদন করুণ রস। এর ধ্যান-বর্ণনায় তার পরিচয় রয়েছে, যেখানে রূপ-কল্পনার মধ্যে বৈরাগ্যের চিত্র অঙ্কিত। ১ ও ৩ -সংখ্যক গানে মূল ভাবটি বজায় আছে; ৪-সংখ্যক গানেও তার খুব একটা বৈকল্য ঘটে নি কিন্তু ২-সংখ্যক গানটির চাল সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র। তুলনামূলক আলোচনার জন্য সিন্ধুর রূপটি[২৯] উল্লেখ করা গেল :

আরোহণ—সা রি ম প ধ র্সা

অবরোহণ—র্সা <u>নি</u> ধ ম প <u>গ</u> রি সা।

১. পকড়—সা, রিমপ, ধ, র্সা, নিধপ ম <u>গা</u>, রিসা

(শুদ্ধ সৈন্ধবী)

২. পকড়— মপ, নির্সা, রিঁ গঁ, রিঁ সাঁ, নি ধ প ম গ, রি সা
(কাফি মিশ্রিত
সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া)। নিষাদ ও
গান্ধার কোমল (ন গ)

১-সংখ্যক গানে কোমল গান্ধার, কোমল নিষাদের সঙ্গে শুদ্ধ নিষাদও ব্যবহৃত। ২-সংখ্যক গানে কোমল গান্ধার ও নিষাদের ব্যবহার রয়েছে, শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার নেই। ১-সংখ্যক গানটির মতো ৩-সংখ্যক গানেও পূর্বোক্ত তিনটি স্বর ব্যবহৃত; ৪-সংখ্যক গানটি আবার ২-সংখ্যক গানের মতো শুদ্ধ নিষাদ-বর্জিত। অনুরূপ-ভাবে ঝিঁঝিটে কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত স্মরণযোগ্য :

১. এনেছি মোরা এনেছি মোরা— মিশ্র ঝিঁঝিট
২. শোন্ তোরা তবে শোন্— ঝিঁঝিট
৩. কী দোষে বাঁধিলে আমায়— ঝিঁঝিট

প্রথম দুটি গানই উদ্দীপক, কিন্তু ভিন্ন চালের। ৩-সংখ্যক গানটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তেমনি খাম্বাজে রচিত :

১. এক ডোরে বাঁধা আছি— খাম্বাজ
২. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে— খাম্বাজ
৩. আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা— খাম্বাজ

তিনটি গানই স্বতন্ত্র প্রকৃতির, প্রথমটির ভাব উদ্দীপক, দ্বিতীয়টির করুণ, শেষেরটি হাস্যাত্মক। 'সঙ্গীত-তরঙ্গে'র মতে মালশ্রী এবং মল্লারের সংমিশ্রণে খাম্বাজের সৃষ্টি। এর আরোহণ ও অবরোহণে পার্থক্য হচ্ছে— আরোহণে কোমল নিষাদসমেত সাতটি শুদ্ধ স্বরই ব্যবহৃত, অবরোহণে শুদ্ধ নিষাদসমেত ছয়টি স্বর ব্যবহৃত, ঋষভ-

বর্জিত। দেখা যাচ্ছে, খাম্বাজের এই রূপটি ঐ তিনটি গানেই বজায় রাখা হয়েছে। অথচ ছন্দের জন্যে প্রত্যেকের প্রকৃতি বদলে গেছে। বেহাগের উপর 'অহো আস্পর্ধা একি' ও 'কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই' গান দুটির পার্থক্যও লক্ষ্য করার মতো। তেমনি পার্থক্য সূচিত হয় 'এ কী এ ঘোর বন' ও 'প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি' গান দুটির মধ্যে। এ দুখানি গানই দেশ-এ। প্রথমটিতে কোমল-গান্ধার ব্যবহৃত হওয়ার ফলে মূল দেশের রূপটি সম্পূর্ণভাবে মানা হয় নি বলা যায়।

এই দৃষ্টান্তগুলিই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাবে, রাগ-রাগিণীগুলিকে ইচ্ছামতো খেলানো হয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে ভাবানুযায়ী ছন্দের দ্বারা। এই কারণেই একই রাগ-রাগিণীর চাল বা প্রকৃতি স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে। ইগ্‌নর্ স্ত্রাভিন্‌স্‌কির বক্তব্য হল ধ্বনি ও কাল (sound and time) সঙ্গীতের দুটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান।[৩০] অন্যত্র সঙ্গীতের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি মিটার ও রিদ্‌মের আয়তনিক ও পরিমাণ-বাচক গুণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিমত এই যে, ছন্দ হচ্ছে সঙ্গীতের সেই অন্তর্নিহিত জীবনী-শক্তি যা শৃঙ্খলা স্থাপন করে।[৩১] এই কারণেই ছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপও বদলে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে লয়ের কথাও স্মরণযোগ্য। দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্যের সুর-সমাবেশ করতে বসে ছন্দ-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই রাগ-রাগিণীগুলির রূপান্তর ঘটিয়েছেন (যদিও ছন্দ গানের ভাবের সঙ্গে মিলিয়েই রচিত)। বস্তুতঃ ভারতীয় রাগ-রাগিণীর 'উড়ে চলা'র প্রকৃতিকে এইভাবে মাটিতে দৌড় করানো হয়েছে অর্থাৎ স্বতন্ত্র পথে

হাঁটানো হয়েছে। যদিও তা পথবিভ্রম বা পথবিভ্রাট নয়, নতুন পথে যাত্রা।

শিল্পজগতে যখন কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে তখন সুস্পষ্টভাবেই একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে এ কথা প্রযোজ্য। সৃষ্টির এই নতুন রূপায়ণকেই বলি পালাবদল। ওয়াগ্‌নার থেকে স্ত্রাভিন্‌স্‌কি প্রমুখ সঙ্গীতবিদের সৃষ্টির মধ্যে সেই পালাবদল লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রাভিন্‌স্‌কিও এ কথা বলেছেন।[৩২]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই কথাগুলি গভীর ও সার্থকভাবে প্রযোজ্য। সঙ্গীতের এই 'বন্ধনমোচন' ও 'নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে'র ভিতর দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের এক নতুন পথ-নির্দেশ তিনি করেছেন।

এই আলোচনারই সূত্র ধরে কালমৃগয়া গীতিনাট্যের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই গীতিনাট্যের ৩৯টি গানের মধ্যে ৯টি গান পরিবর্ধিত বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে স্থান পেয়েছে। বাকী ৩০টি গানের রাগ-সমাবেশ যথাক্রমে :

১. বেলা যে চলে যায়— মিশ্র ভূপালী
২. ও ভাই দেখে যা— মিশ্র খাম্বাজ
*৩. ও দেখবি রে ভাই— মিশ্র খাম্বাজ
৪. কাল সকালে— মিশ্র বিভাস
৫. সমুখেতে বহিছে তটিনী— সিন্ধু
৬. ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে— কেদারা
৭. নেহার লো সহচরী— ছায়ানট
৮. জল এনে দে রে বাছা— জয়জয়ন্তী
৯. না না কাজ নেই— দেশ

১০. আমা-তরে অকারণে— খাম্বাজ
১১. সঘন ঘন ছাইল— মিশ্র মল্লার
১২. আয় লো সজনী— মল্লার
১৩. কী ঘোর নিশীথ— গারা
*১৪. মানা না মানিলি— মিশ্র বেলাবল
১৫. জয়তি জয় জয় রাজন— সিন্ধুড়া
১৬. না জানি কোথা এলুম— লুম-খাম্বাজ
১৭. হায় কী হল— ভৈরবী
১৮. কী করিনু হায়— বেহাগ
১৯. কী দোষ করেছি— মিশ্র খট
২০. আমার প্রাণ যে ব্যাকুল— মিশ্র ঝিঁঝিট-খাম্বাজ
২১. বলো বলো পিতা— রামকেলি
২২. কে জানে কোথা সে— বেহাগ-খাম্বাজ
২৩. এতক্ষণে বুঝি এলি— কাফি-কানাড়া
২৪. অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা— মিশ্র রাজবিজয়
২৫. কী বলিলে— মিশ্র বাহার
২৬. ক্ষমা করো মোরে— মিশ্র বেহাগ
২৭. আহা কেমনে বধিল— কাফি
২৮. শোক তাপ গেল দূরে— নটনারায়ণ
২৯. যাও রে অনন্তধামে— প্রভাতী
৩০. সকলি ফুরালো— ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

এই তালিকার অনুসরণে বলা যায়, এই গীতিনাট্যে ২৬টির মতো রাগ-রাগিণী ও ১৮টির মতো মিশ্ররাগ ব্যবহৃত। এখানেও ভাবানুযায়ী রাগ-রাগিণীগুলি সংযোজিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে, বিশেষভাবে ৪, ৫, ৭, ১১, ১২, ১৭ -সংখ্যক গানগুলি উল্লেখযোগ্য।

আদর্শানুসরণের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে এই গীতিনাট্যও সেই প্রভাব থেকে খুব বেশী মুক্ত নয়। কয়েকটি উল্লেখ করা চলে :

		পুরোবর্তী আদর্শ
* ৩.	ও দেখবি রে ভাই	— The Vicar of Bray
* ৬.	ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে	— Ye banks and braes
* ১৪.	মানা না মানিলি	— Go where glory waits
* ৩০.	সকলি ফুরালো	— Rabin Adair
২৯.	যাও রে অনন্তধামে	— গুজরাটী
১১.	সঘন ঘন ছাইল	— ইন্দহুঁকী অসবরী
২২.	কে জানে কোথা সে	— সহে না যাতনা

সঙ্গীতের যে সমীক্ষা ও পরীক্ষার বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী আলোচনায় করা হয়েছে, এই গীতিনাট্য সম্পর্কেও সেই ভাবে আলোচনা করা যেতে পারত, কিন্তু বাহুল্যবোধে তা করা হল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, বাল্মীকি-প্রতিভার সার্থকতাই এই গীতিনাট্য-রচনার উৎসাহ দিয়েছিল। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, পূর্ব-প্রবণতা এই গীতিনাট্যেও লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু স্পষ্টতঃ তালের উল্লেখ থাকার ফলে ছন্দের তারতম্য অনুসারে কিভাবে রাগ-রাগিণীর রূপান্তর ঘটেছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তা ছাড়া, এক-একটি রাগ-রাগিণী (কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া) একাধিক বার ব্যবহৃত না হওয়ার ফলে এ বিষয়ে আলোচনাও খুব বেশী অগ্রসর হতে পারে না বলেই মনে হয়। বস্তুতঃ এই গীতিনাট্যেও ভাবের দিকে লক্ষ রেখেই সুরারোপ করা হয়েছে এবং তাল (ছন্দ) তার সাহায্য করেছে।

এদিক থেকে মায়ার খেলা গীতিনাট্য কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

সেই আলোচনার আগে রাগ-সমাবেশের দিক থেকে গানগুলি সন্নিবেশ করা গেল। এই গীতিনাট্যের ৬৩টি গানে ৩৬টির মতো রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করা হয়েছে ; তার মধ্যে মিশ্র ১৬টি। গানগুলি যথাক্রমে :

১. মোরা জলে স্থলে— সিন্ধু
২. পথহারা তুমি পথিক— ইমনকল্যাণ
৩. জীবনে আজ কি প্রথম— মিশ্র বাহার
৪. কাছে আছে দেখিতে না পাও— কাফি
৫. আমার পরান যাহা চায়— মিশ্র কানাড়া
৬. সখী সে গেল কোথায়— বেহাগ
৭. দে লো সখী দে— দেশ
৮. সখী, বহে গেল বেলা— মিশ্র ভূপালী
৯. ওলো রেখে দে— খাম্বাজ
১০. প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে— জিলফ্
১১. যেয়ো না যেয়ো না— ছায়ানট
১২. কে ডাকে। আমি কভু— বসন্ত-বাহার
১৩. এসেছি গো এসেছি— পিলু
১৪. মিছে ঘুরি এ জগতে— বেলাবলী
১৫. তারে দেখাতে পারি নে— জয়জয়ন্তী
১৬. সখা, আপন মন— ভৈরবী
১৭. আমি জেনেশুনে— মল্লার
১৮. ভালোবেসে যদি— কাফি
১৯. দেখো চেয়ে— বেহাগড়া
২০. সুখে আছি— মিশ্র ঝিঁঝিট
২১. ভালোবেসে দুখ— মূলতান

২২. ওই কে গো— হাম্বীর
২৩. প্রেমপাশে ধরা— কালাংড়া
২৪. ওগো, দেখি— মিশ্র সুরট
২৫. ওকে বোঝা গেল না— ঝিঁঝিট
২৬. দিবসরজনী— মিশ্র সিন্ধু
২৭. সখী, সাধ করে— বাহার
২৮. আমি হৃদয়ের কথা— মিশ্র সিন্ধু
২৯. নিমেষের তরে শরমে— সিন্ধু
৩০. ওগো সখী দেখি-- পিলু
৩১. এ তো খেলা নয়— সরফর্দা
৩২. সে জন কে— মিশ্র দেশ
৩৩. ওই মধুর মুখ— মিশ্র ভৈরবী
৩৪. তারে কেমনে ধরিবে— মিশ্র ভেঁরো
৩৫. সকল হৃদয় দিয়ে— মিশ্র কানাড়া
৩৬. তুমি কে গো— কেদারা
৩৭. তবে সুখে থাকো— বেহাগ
৩৮. সেই শান্তিভবন— কাফি
৩৯. কাছে ছিলে— আলাইয়া
৪০. দেখো ভুল করে— কুকুভ
৪১. ভুল করেছিনু ভুল— ললিত-বসন্ত
৪২. অলি বারবার— মিশ্র দেশ
৪৩. ওই কে আমায় ফিরে— পূরবী
৪৪. বিদায় করেছ— কানাড়া
৪৫. সেদিনো তো মধুনিশি— কানাড়া
৪৬. না বুঝে কারে— ভূপ

৪৭. আমি কারেও বুঝি নে— বেহাগ
৪৮. প্রভাত হইল— বিভাস
৪৯. মধুনিশি পূর্ণিমার— কানাড়া
৫০. এস' এস' বসন্ত— সাহানা
৫১. মধুর বসন্ত এসেছে— সাহানা
৫২. আজি আঁখি জুড়াল— মিশ্র মূলতান
৫৩. একি স্বপ্ন— বেহাগ
৫৪. আহা আজি এ বসন্তে— মিশ্র ঝিঁঝিট
৫৫. আমি তো বুঝেছি সব— ঝিঁঝিট
৫৬. এতদিন বুঝি নাই— গৌড়সারং
৫৭. চাঁদ, হাসো হাসো— সোহিনী
৫৮. আর কেন, আর কেন— ভৈরবী
৫৯. এ ভাঙা সুখের— মিশ্র খট
৬০. যদি কেহ নাহি চায়— রামকেলি
৬১. দুখের মিলন— টোড়ী
৬২. কেন এলি রে— ভৈরবী
৬৩. এরা সুখের লাগি— মিশ্র বিভাস

যে স্বাতন্ত্র্যের কথা সুরুতে বলা হয়েছে তা হচ্ছে, এই গীতিনাট্যের গানগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম একটা স্বতঃস্ফূর্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। স্বতঃস্ফূর্তির ভাব বলতে বোঝাতে চাইছি, সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সৃজনী শক্তির প্রকাশ। বাল্মীকি-প্রতিভার গানের মধ্যে বিশেষ কোনো ঢং চোখে পড়ে না। সুরগুলো যেন স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মায়ার খেলা গীতিনাট্যে আগাগোড়া গানগুলির মধ্যে একটি সমধর্মিতা বা ঐক্য (যা গেয়ে দেখাবার বিষয়) রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। বিষয়টি অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে গবেষণার যোগ্য। এখানে সামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি, বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সঙ্গীত-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় নেই। আমার নিজের বিশ্বাস, এই গীতিনাট্যের (প্রথম সংস্করণ) সুরারোপ মূলতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই। তার প্রমাণ হিসেবে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি উপস্থাপিত করা গেল :

ক. জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনেছিলাম যে বাল্মীকি-প্রতিভার প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।[৩৩]

খ. এই সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন।··· রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।[৩৪]

এরই পাশাপাশি এই কথারই পরোক্ষ স্বীকৃতির প্রমাণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির প্রাসঙ্গিক অংশ স্মরণীয় :

ক. বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগ-রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।···আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা যোজনার চেষ্টা

করিতাম।··· এইরূপ দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।

রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরেই প্রথম সংস্করণ বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত।[৩৫] সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ দু-একটি গানের সুরযোজনা করে থাকবেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নাটক-রচনায় (গীতিনাট্যের কথা-অংশ), সুরসৃষ্টিতে নয়। তা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী'তে যতগুলি রাগ রাগিণী ব্যবহৃত, এই গীতিনাট্যেও প্রায় হুবহু সেই রাগ-রাগিণীগুলিই ব্যবহৃত। সেই রাগ-রাগিণীগুলি আগেই উল্লেখ করেছি। 'মানময়ী' গীতিনাট্যের স্বরলিপির সঙ্গে তুলনা-মূলক আলোচনায় এ কথার সত্য প্রমাণিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ ছাড়া তেমন কোনো স্বরলিপি চোখে পড়ে নি— যার সঙ্গে বাল্মীকি-প্রতিভার সুরারোপ মিলিয়ে দেখা চলে। তবে একটা কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে, বাল্মীকি-প্রতিভার সুরগুলিতে পিয়ানোর প্রভাব সুস্পষ্ট; 'সুরগুলো যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে···'। বাল্মীকি-প্রতিভার সুর-সমাবেশের পিছনে এই পরিবেশ ও পটভূমির কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। সুর-সমাবেশের আলোচনায় দেখিয়েছি, কিভাবে নাট্যরসের জন্যে রাগ-রাগিণীর চরিত্র বদলে দেওয়া হয়েছে। তার পিছনেও পিয়ানোর প্রভাব রয়েছে যদি মনে করা যায়, তা হলে হয়তো ভুল বলা হয় না।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে বা অন্যান্য নানা লেখা থেকে জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তা থেকে বলতে পারি রবীন্দ্র-নাথের প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গভীর মমত্ববোধ ও অপরিসীম স্নেহ ছিল। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথকে, বিশেষ করে সঙ্গীতে, তাঁর

কাছে ছাত্রের মতো শিক্ষা নিতে হয়েছিল। এইজন্যেই বলা যায় যে বাল্মীকি-প্রতিভার (প্রথম সংস্করণ) মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সঙ্গীত-সৃষ্টির বিশেষ কোনো পরিচয় পাচ্ছি না।

মায়ার খেলার স্বরারোপ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, এই গীতিনাট্যেই সর্বপ্রথম তাঁকে সঙ্গীত-রচনায় সাবালকত্ব লাভ করতে দেখলাম বা বলা উচিত স্রষ্টারূপে দেখলাম। পরবর্তী গীতি-নাট্যের যে পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছি তার পাশাপাশি এই গীতিনাট্যের গান রচনার পরিবেশ বা পটভূমির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে— এই পরিবেশই বাস্তবিকপক্ষে মায়ার খেলার গান-গুলিকে স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছে। রবীন্দ্রজীবনী-পাঠকের স্মরণ আছে সখিসমিতিতে এই গীতিনাট্য অভিনীত হওয়ার (১৫ পৌষ ১২৯৫) আগেই গানগুলি রচিত হতে থাকে এবং পূজার ছুটিতে যখন কবি দার্জিলিং যান সেখানেই এই গীতিনাট্য-রচনার সূত্রপাত হয়। অবশেষে এই বছরের অগ্রহায়ণে রচনার কাজ সমাপ্ত হল। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশের ও মানসিক অবস্থার কথা ভেবেই বলেছেন যে, 'গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত' হয়েছিল। তাই সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় এই-সব গান রচনার পিছনে বাহিরের কোনো আরোপিত প্রভাব নেই, রয়েছে অন্তরের আকূতি। অর্থাৎ যেখানে বাল্মীকি-প্রতিভার শেষ, সেখান থেকেই মায়ার খেলার সুরু। অথবা বলা চলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেখানে থেমেছেন, রবীন্দ্র-নাথ সেখান থেকেই যাত্রা করেছেন। এইজন্যেই বলেছি, মায়ার খেলা গীতিনাট্যের সাঙ্গীতিক আবেদন স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

যাই হোক, যে স্বতঃস্ফূর্তির কথা আগেই বলেছি— তার তাৎপর্য আরও খুঁজে পাওয়া যায়, যখন দেখি মায়ার খেলাতে কোনো বিশেষ গানের অনুকৃতি প্রায় নেই— স্পষ্টভাবে মাত্র দুটি গানের

উল্লেখ পাওয়া যায় :

১. আহা আজি এ বসন্তে— Go where glory waits thee

২. বিদায় করেছ যারে— বাজে ঝননন মোরে পয়েলিয়া

বস্তুতঃ বাল্মীকি-প্রতিভা কোনো-না-কোনো ভাবে বিশেষ গানের আদর্শের অনুকৃতির ফল বলেই তার মধ্যে আমরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট ঢং বা আবেদন পাচ্ছি না অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ সৃষ্টির প্রকাশ ঘটে নি (এখানে গানের সুরের কথাই বলা হচ্ছে)। মায়ার খেলার গীতরূপের অন্তরালে তেমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবের বদলে পূর্ববর্তী গান-রচনার অভিজ্ঞতাই বিদ্যমান। সেইজন্যেই এই গানগুলির স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা রয়েছে তুলনা-মূলকভাবে।

তা ছাড়া আগের দুখানি গীতিনাট্যেই লক্ষ্য করেছি ভাবানুষায়ী রাগ-রাগিণীগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে ভাবানুগ করায় রাগের রূপ-পরিবর্তন ঘটেছে।[৩৬] এই গীতিনাট্যেও সাধারণ-ভাবে এই কথা বলা চলে। তবে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে অনুভব করা যায়, পূর্ববর্তী দুটি গীতিনাট্যে রাগরূপের পরিবর্তন আনা হয়েছে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে, কিন্তু এখানে নাট্যধর্ম এতই মৃদুমন্থর যে, সেই পরিবর্তন ঘটানোর আদৌ প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে হয় না। ভাবানুযায়ী রাগরূপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

১. মোরা জলে স্থলে— সিন্ধু

৩. জীবনে আজ কি প্রথম— মিশ্র বাহার

১৩. এসেছি গো এসেছি— পিলু

৫৮. আর কেন, আর কেন— ভৈরবী

৬২. কেন এলি রে— ভৈরবী

৪. কাছে আছে দেখিতে— কাফি

ইত্যাদি।

১-সংখ্যক গানটির সঙ্গে ৫৮-সংখ্যক গানটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে কিভাবে ভাবানুযায়ী রাগিণীর ও তালের সাযুজ্য ঘটেছে। ৩-সংখ্যক গানটিও অনুরূপ। ৪-সংখ্যক গানটিতে ভাবানুযায়ী কাফি এবং সেই সঙ্গে খেমটা তাল ব্যবহৃত। পিলুতে রচিত ১৩-সংখ্যক গানটিতে ওই কারণেই খেমটা তাল ব্যবহৃত। ৫৮ ও ৬২ -সংখ্যক গান তুটি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তের বাহুল্য না ঘটিয়ে বলা যায়, এইভাবে প্রায় সর্বত্রই রাগ-রাগিণী ও তালের মধ্য দিয়ে গান-গুলির অন্তর্নিহিত ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলা তুটি গীতিনাট্যেই সূচনার গান তুটি ('সহে না সহে না' ও 'মোরা জলে স্থলে') সিন্ধুর উপর রচিত। সৌবীরক রাগটি মতঙ্গ মুনির মতে রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের প্রাবেশিক সঙ্গীত হিসেবে প্রয়োগ করা হত। সৌবীরকের সঙ্গে সিন্ধু সম্পৃক্ত। ভাবের দিক থেকে বিচার করলে গান-তুখানির মধ্যে কোনো সমমর্মিতা নেই। কাজেই, এই তুটি প্রাবেশিক গানে একই রাগের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; তবে সৌবীরকের মতো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা বলা কঠিন।

এই তুখানি গীতিনাট্যের সুর-সমাবেশের তুলনামূলক আলোচনাটি আরো কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া যায়। বাল্মীকি-প্রতিভা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি— নাট্যরসের বা নাট্যধর্মের প্রয়োজনে খাম্বাজ ইত্যাদি রাগ-রাগিণীগুলির চরিত্র কিভাবে বদলে দেওয়া হয়েছে। মায়ার খেলাতে সে প্রয়াস প্রায় চোখে পড়ে না। এই গীতিনাট্যের মূল রস শৃঙ্গার এবং সঞ্চারী রস করুণ। কাহিনীটির উপজীব্য হচ্ছে প্রেম। এ প্রেমের স্বরূপ কী? এ প্রেমের সংঘাতে কোনো

বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নি; বরং ভবিতব্যের মতো শান্তা, অমর বা প্রমদা প্রেমের মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত পরিণতি মেনে নিয়েছে। তাই সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই গীতিনাট্যের সর্বত্রই করুণরসের আধিক্য অনুভব করা যায়। আমার মনে হয়, কাব্যগত এই ভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে সুর-সমাবেশের মধ্যে। আগে যে রাগ-সমাবেশের তালিকা দিয়েছি, তার দিকে লক্ষ রাখলেই এ কথার তাৎপর্য অনুভব করা যাবে। এই গীতিনাট্যে সিন্ধু, ভৈরব, ভৈরবী, কাফি, পিলু, বেহাগ, বাহারের মত্তো কোমল-ভাবাত্মক রাগ-রাগিণীই বেশী ব্যবহৃত। তালের কথাও স্মরণীয়। ৪, ৬, ১৩, ২০, ২৩, ৩৬, ৪২ ও ৫৭ -সংখ্যক গানের সঙ্গে খেমটা তাল ব্যবহৃত। পিলুতে রচিত ৩০-সংখ্যক গানটিতে ভাবের ও সুরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই আড়খেমটা তালটি ব্যবহৃত হতে দেখি। সবচেয়ে বড়ো কথা, এখানে গানগুলি হয় বিলম্বিত লয়ে নচেৎ মধ্য লয়ে গেয়। হয়তো কোনো কোনো গানের অংশবিশেষ দ্রুতলয়ে গাওয়া চলে, কিন্তু তা ব্যতিক্রম মাত্র। এই-সব দৃষ্টান্ত স্মরণ রেখেই বলছি, মায়ার খেলার সুর-সমাবেশের মধ্যে এমন বিশিষ্ট মাধুর্য ফুটে উঠেছে, যাকে বাল্মীকি-প্রতিভার গানের সঙ্গে কোনোমতেই একত্রে মেলানো যায় না। তা সম্পূর্ণভাবেই গীতিকাব্যধর্মী।

নাটকের দিক থেকে বিচার করলেও এই কথার তাৎপর্য অনুভব করা যায়। মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানগুলি আসলে কাব্যধর্মী বা ভাবমূলক। পক্ষান্তরে বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে নাট্যধর্মই প্রধান। সুর এই নাট্যধর্মের সহযোগী বলেই সুরের মধ্যেও নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে মায়ার খেলা গীতিনাট্যে সুরের মধ্যে নাটকীয়তার সঞ্চার প্রায় নেই। বস্তুতঃ যে স্বকীয়তার কথা আগে উল্লেখ করেছি তার তাৎপর্য এর মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ সুরারোপের

মধ্যে নাটকীয়তার অভাবই এই গীতিনাট্যের এক দিক থেকে ঐশ্বর্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকীয় আবেদন নেই বটে, কিন্তু সঙ্গীতের বিশিষ্ট আবেদন— যা মনকে গভীরভাবে ভাবাবেগে আপ্লুত করে, মায়ার খেলার গানের মধ্যে সেইজাতীয় প্রভাব রয়েছে। গীতিনাট্য হিসেবে এখানেই বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলার পার্থক্য।

অতঃপর আলোচ্য তিনখানি গীতিনাট্য সম্পর্কে জীবনস্মৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা গেল :

ক. য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে— ইহা সুরে নাটিকা ; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র— স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।

খ. ইহার অনেক কাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আর-একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।

এই উক্তির আলোকে গীতিনাট্যগুলির আঙ্গিকের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে য়ুরোপীয় অপেরার আঙ্গিকের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রাসঙ্গিক-বোধে বলা দরকার। গীতিনাট্যের আলোচনার ক্ষেত্রে এই দিকটি সচরাচর উপেক্ষিত হয়, অথচ য়ুরোপীর অপেরা ও রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাট্যগুলির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। য়ুরোপীয় অপেরাগুলি ়রপ্রধান নাটক হলেও বিভিন্ন সময়ে তার আঙ্গিকের পরিবর্তন

ঘটেছে। একথা বলা হয়েছে যে, অপেরার কথা-অংশ বা Libretto-র দিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নজর দেওয়া হয় নি অর্থাৎ সুরকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'অপেরা মিউজিক' নামে এইভাবে এক-জাতীয় সঙ্গীত গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া, আরো লক্ষ্য করা যায়— এই সঙ্গীত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে গায়ক-গায়িকার দ্বারা। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শিল্পীর কণ্ঠস্বর, প্রতিভা বা ক্ষমতা অনুসারে অপেরার সঙ্গীত রচিত হতে দেখা যায়। এই কারণে শুধু যে অপেরা-সঙ্গীত-শিল্পীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, বিশেষ কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাবে সেই সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কলা-বিধিরও সৃষ্টি হয়েছে।

সুরপ্রধান হলেও য়ুরোপীয় অপেরার নানা বিবর্তন ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইতালীতে পরিবর্তন ঘটল 'recitativo Secco'-তে।[৩৭] পরের শতকে যখন বাদ্যযন্ত্রের উন্নতি ঘটল, বিশেষভাবে বেহালার, তখন থেকেই ধীরে ধীরে অপেরাতে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রাধান্য বেড়েছে, এবং এই সূত্রে অর্কেষ্ট্রার সূচনাও দেখা দিয়েছে। অন্য দিকে কণ্ঠসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বা চাহিদা বৃদ্ধি পাবার ফলে গানের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হতে থাকে। সাধারণ অঙ্গভঙ্গীর রূপান্তর হিসেবেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৃত্যও অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হওয়ার ফলে, অপেরাতে নৃত্যকে কেন্দ্র করে বিশেষ সঙ্গীতধারারও সৃষ্টি হয়েছে।— এ বিষয়ে ইতালী ও ফ্রান্সের সঙ্গীত-পদ্ধতির কথা উল্লেখযোগ্য। ইতালীয় অপেরায় আবার কোরাসের স্থান খুব বেশী ছিল না। ফরাসী অপেরাতে কিন্তু এ বিষয়ে এবং সেই সঙ্গে ব্যালের দিকে খুবই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। হ্যাণ্ডেলের মধ্যে এরই প্রভাব দেখা যায়। এ দিক থেকে অপেরায় জার্মানীর সবচেয়ে বড়ো সংযোজন হচ্ছে অর্কেষ্ট্রা।

য়ুরোপীয় অপেরার বিশেষ দিক হচ্ছে—চরিত্র অনুযায়ী গীতি-অংশ গাইবার পদ্ধতি। এবং এ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক অপেরার প্রারম্ভেই নির্দেশ দেওয়া আছে।[৩৮]

দেখা যায় যে, য়ুরোপীয় অপেরাতে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উপযোগী কণ্ঠস্বরের এক-একটি রীতি বা পদ্ধতি[৩৯] অনুসরণ করা হয় গাইবার সময়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এই গায়ন-পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ কথা আগেই বলেছি। সঙ্গীত-শিল্পীরা এইভাবে এক-একটি রীতির গায়ক বলে পরিচিত হয়ে থাকেন। আসলে অপেরার যাকিছু নাটকীয় কলাকৌশল, তা সঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই; সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই নাট্যিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ অপেরাতে সঙ্গীতই মুখ্য; এবং এইজন্যেই রচয়িতার দৃষ্টি থাকে এ দিকেই। য়ুরোপীয় প্রভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের এখানেই পার্থক্য। এ সঙ্গীত (সুর) নিয়ন্ত্রিত বা তৈরী হয়েছে নাট্যবিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই, গায়কীর দিক থেকে য়ুরোপীয় অপেরার সঙ্গে কোনো মিল নেই। উদাহরণ হিসেবে বাল্মীকি-প্রতিভার দস্যুদের প্রবল আনন্দদ্যোতক 'কালী কালী বলো রে' গানটির কথা স্মরণীয়।[৪০] এই গানটি সুরু হয়েছে পঞ্চম ও ধৈবত থেকে, শেষ হয়েছে তীব্র ষড়জে। এর পাশাপাশি 'মরি ও কাহার বাছা' গানটির সুরু ষড়জ থেকে। দেখা যাচ্ছে, একই গানে উদারা, মুদারা বা তারার (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত) স্বর লাগছে (বা লাগতে পারে)। য়ুরোপীয় অপেরায় এই রীতি অনুসৃত হয় না। য়ুরোপীয় অপেরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির গায়কীর বৈসাদৃশ্য এখানেই। অবশ্য শুধু গীতি-নাট্যের ক্ষেত্রেই নয়, য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এই বিশিষ্ট রীতির সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের এই পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই গীতিনাট্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য অপেরা বলে স্বীকার করতে চান নি। তুলনামূলক আলোচনায় তিনি বলেছেন যে, নাট্যবিষয়টি সুর করে অভিনয় করা হয় মাত্র। সুর (সঙ্গীত) নাট্যবিষয়টিকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে অর্থাৎ 'সুরে নাটিকা'।

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বাল্মীকি-প্রতিভার স্বতন্ত্র সাঙ্গীতিক মাধুর্য অতি অল্প। এ কথাও গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই গীতিনাট্যের গানগুলি যদি নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে শোনা যায়, তা হলে এ কথার সত্য উপলব্ধি সম্ভব হবে। যেমন, প্রথম দস্যুর (কালমৃগয়াতে বিদূষকের) গানগুলি সত্যই উপভোগ্য। কিন্তু সে রস পূর্বাপরতাসূত্রে। গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে গাইলে সে আবেদন আর থাকে না। তেমনি বনদেবীর 'সহে না সহে না' প্রভৃতি গান, চাই কি, দস্যুদের 'কালী কালী' গানটি অথবা 'তবে আয় সবে আয়' ইত্যাদি গানগুলি যদি বিচ্ছিন্নভাবে গাওয়া হয় বা অভিনয়-বিযুক্ত হয়, তা হলে পরিপূর্ণ রস গ্রহণে বাধা ঘটে বলেই বিশ্বাস। অর্থাৎ নাটকের কোনো অংশ যেমন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে, তেমনি এই গানগুলিও নাটক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ,উপভোগ্য নয়। এইজন্যেই এই গানগুলি এককভাবে গাইতে দেখা যায় না। 'রক্তকরবী' নাটকের 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি যদি এককভাবে গাওয়া যায়, তবু তার সুরের (গীতরসের) আবেদন গীতজ্ঞ বা রসজ্ঞ ব্যক্তির মনে সাড়া জাগাবে, অথচ গদ্যসংলাপের ক্ষেত্রে ব্যাপার অন্যরূপ। নন্দিনী যখন রাজাকে দুয়ার খুলতে বলছে, রাজার ক্লান্তি, তীব্রকণ্ঠে ফিরে যেতে বলার আদেশ—এই অংশটুকু নাটকের (অভিনয়ের) সঙ্গে জড়িয়ে না দেখলে যথার্থ রসানুভূতি সম্ভব হয় না। বাল্মীকি-প্রতিভার সুর-সমাবেশের বৈশিষ্ট্য এমনিই।

গানের কথার সঙ্গে সুরের সাযুজ্যের কথা মনে রেখে অনেকেই গীতিনাট্যকার হিসাবে রিচার্ড ওয়াগনারের (২২ মে ১৮১৩ - ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করেছেন। ওয়াগনার য়ুরোপীয় অপেরায় যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল 'the endless chain of music' রচনা করা। Tristan and Isolde-তে তিনি অপেরার রূপ বদলে দিয়ে সৃষ্টি করলেন 'music drama'।[৪১]

ওয়াগনারের সৃষ্টিতেই নাট্যবিষয় ও সুর সাযুজ্যলাভ করল বা পরস্পর সম্পৃক্ত হল। চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে প্রকাশ করাই গানের (কাব্যের) কাজ, আর সেই কথাকে লক্ষ্য করেই সুর অগ্রসর হবে— এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ ও ওয়াগনারের তুলনা সার্থক। ওয়াগনারের মতোই রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যের কাব্যভাগ নিজেই রচনা করেছেন। উনিশ শতকের গীতিনাট্যকারবৃন্দ নাটকের কথা অংশ রচনা করতে পারতেন, কিন্তু সুরযোজনার জন্য অপরের উপর নির্ভর করতে হত। অর্থাৎ একই প্রেরণা থেকে সেই-সব গীতিনাট্য রচিত হয় নি। সর্বপ্রথম স্বর্ণকুমারী বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যেই সেই প্রবণতা দেখা গেল। একই প্রেরণাসঞ্জাত নয় বলে উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্যগুলির অধিকাংশই ব্যর্থ সৃষ্টি। অন্য দিকে য়ুরোপীয় অপেরা রচয়িতাদের সকলেই সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন, কিন্তু Libretto-র জন্য অপরের সাহায্য নিতে হয়েছে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রেও একই প্রেরণার অভাব দেখা যায়। আর সেইজন্যেই নাটকের বিষয়-বস্তু সুরের অনেক পিছনে পড়েছে, সুরের দিকই হয়েছে প্রধান। এদিক থেকে ওয়াগনারই প্রথম কথা ও সুরের (এবং অভিনয়ের) মিলন ঘটালেন। একই প্রেরণা ও তাৎপর্য রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের।

মহৎপ্রতিভাবান শিল্পীর জীবন ও সৃষ্টি সব সময়েই জীবনের রাজপথ বা সোজা পথ ধরে চলতে চায় নি, বা চায় না। যে পথ বন্ধুর, দুর্গম, যা অবহেলিত উপেক্ষিত, অনাদৃত— তার দিকেই যেন শিল্পীর আকর্ষণ। প্রচলিত রীতি বা প্রথাকে না মেনে তাকে নতুন করে রূপ দেওয়াই মহৎ প্রতিভার ধর্ম। ওয়াগনারও গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাতে পারেন নি।

ওয়াগনারের চরিত্র ও দেহের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে তাঁর সঙ্গীত-সৃষ্টি জড়িত। খর্বাকৃতি গঠন, রীতিমতো বড়ো মাথা ও অত্যন্ত স্পষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয়— এই শারীরিক গঠনের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত এবং অন্যান্য অনেক এই ধরণের মানুষের মতো তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুর্যোগপূর্ণ। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিল্পের বিচিত্র জগতে টেনে এনেছে ; ওয়াগনার তাতে নিমগ্ন হয়ে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সঙ্গীত-সৃষ্টিতে। জীবনের গভীর থেকে উৎসারিত বলেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এক বিচিত্র জীবনরসের সন্ধান মেলে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়াগনারের তুলনামূলক আলোচনা নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তা স্বতন্ত্র গবেষণা বা আলোচনা -সাপেক্ষ। গীতিনাট্যকার হিসেবে দুজনের সমমর্মিতা স্বীকার করেও বলতে হয়, মূলতঃ কিন্তু য়ুরোপীয় অপেরার গঠন-রীতির সঙ্গে যে পার্থক্য সেই পার্থক্য কোনো কোনো দিক থেকে ওয়াগনারের সঙ্গেও রয়েছে। যেমন অর্কেষ্ট্রা বা ঐকতান। প্রশ্ন উঠতে পারে— যন্ত্রসঙ্গীতের সুযোগ থাকলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্যে অর্কেষ্ট্রা ব্যবহার করতেন। আমার মনে হয় তা আদৌ সত্য নয়। যন্ত্রসঙ্গীতের অপ্রাচুর্যের জন্যই যে তিনি অর্কেষ্ট্রা ব্যবহার করেন নি— এমন ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। বাণীহীন সুর

রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মের ঠিক অনুকূল নয়। বাংলা গানের আদর্শই এ দিক থেকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করি। বাংলা গানের বিশিষ্ট সম্পদই হচ্ছে কাব্য বা কথা। এই প্রবণতা সর্বত্রই চোখে পড়ে। নিধুবাবু প্রমুখ সঙ্গীতবিদ্ উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের অনুসরণে যে টপ্পার প্রচলন করলেন তাতে যদিও সুরেরই প্রাধান্য বেশী, তবু কথাও একেবারে অবহেলিত নয়। আসলে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গীতে বাংলাগানের এই আদর্শই শ্রদ্ধার সঙ্গে বজায় রেখেছেন। তাই য়ুরোপীয় অপেরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েও অর্কেষ্ট্রাকে সযত্নে পরিহার করেছেন। অপেরাকে বলা হয়েছে 'department of romantic music', কেননা এই সঙ্গীতের উপজীব্য হচ্ছে মানবমনের প্রমূর্ত আবেগগুলি প্রকাশ করা; সঙ্গীত আসলে সেই আবেগপূর্ণ ভাষা। রবীন্দ্রনাথ একই দৃষ্টকোণ থেকে গীতিনাট্যে সুরযোজনা করেছেন। বিশেষভাবে মায়ার খেলার গানগুলির দিকে তাকিয়ে বলতে পারি, এই গীতিনাট্যও আসলে রোমাণ্টিক।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উক্তিও আলোচনাসাপেক্ষ। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, প্রথম দুখানি গীতিনাট্য গানের সূত্রে নাট্যের মালা, শেষেরটি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। অর্থাৎ প্রথম দুটির ক্ষেত্রে মুখ্য হচ্ছে নাট্য এবং সেই নাট্যরসকে রূপ দেবার জন্যে গানের অবতারণা। পক্ষান্তরে তৃতীয়টি ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ মুখ্য হচ্ছে গান— সেগুলি একত্রে গ্রথিত করবার জন্যেই নাট্যের প্রয়োজন হয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যে নাট্যধর্ম সম্পূর্ণ-ভাবেই বজায় রয়েছে। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্রোত নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হতে হতে উপসংহারে

স্থিতিলাভ করেছে। প্রথম দৃশ্যেই দস্যুদের উন্মত্ত আনন্দের সঙ্গে বালিকার বেদনাঘন আবির্ভাব দৃশ্যটির শেষ অংশকে সমস্যামণ্ডিত করে তুলেছে। বনদেবীদের গানে ('মরি ও কাহার বাছা') তারই প্রকাশ। দ্বিতীয় দৃশ্যে দস্যু বাল্মীকির মনে জেগেছে দ্বন্দ্ব। তৃতীয় দৃশ্যে বাল্মীকির সুপ্ত মনুষ্যত্বই জয়ী হয়েছে ; তবু আবার পূর্ব-সংস্কার জেগে উঠল। এবং শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা গেল বাল্মীকির নবজীবন লাভ হয়েছে। এইভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ঘটনাস্রোত এগিয়ে গেছে। সুর এরই সহযোগী হয়ে উঠেছে— ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুরকেও সমতা রেখে চলতে হয়েছে। অব্যবহিত পূর্বেই দেখানো হয়েছে— বাস্তবিকই এই গীতিনাট্যে স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য অতি অল্প স্থানেই আছে। তার কারণ আর কিছুই নয়, সঙ্গীত (সুর) এখানে নাটকের সহযোগী মাত্র। নাটকের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের তিনটি রূপ থাকতে পারে— স্বপ্রধান, সহযোগী ও অনুসঙ্গী। প্রথমটির ক্ষেত্রে গানই মুখ্য ; দ্বিতীয়টিতে সংলাপেরই সহযোগী ; শেষেরটিতে সংলাপের বক্তব্য পুনর্বার গানের মধ্যে প্রকাশিত। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যে আসলে সঙ্গীত (সুর) ঐ সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

কালমৃগয়াও সমজাতীয় রচনা। তবে নাটকীয়তার দিক থেকে তেমন বিশেষ চমৎকারিত্ব নেই। দৃশ্যবন্ধের মধ্যে শৈথিল্য চোখে পড়ে। এখানে সঙ্গীত (সুর) নাট্যরসের সহায়ক হয়ে উঠেছে।

মায়ার খেলা ঠিক এর বিপরীত। এই গীতিনাট্যে মোট সাতটি দৃশ্য রয়েছে। শৃঙ্গার-রসাত্মক এই গীতিনাট্যে উপন্যাসের মতো ত্রিভুজ বিরোধের সুযোগও ছিল। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এখানে নাটকীয়তা একেবারে অনুপস্থিত, অন্তত তা যে মন্থর, স্বীকার করতেই হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথম দৃশ্যের কথা উল্লেখ করা চলে।

এই দৃশ্যে একটি মাত্র গান ('মোরা জলে স্থলে') রয়েছে। এই ধরণের দৃশ্যবন্ধের ত্রুটি বা শৈথিল্য সমগ্র মায়ার খেলাকে অধিকার করে আছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নাট্যধর্ম এখানে গৌণ। বস্তুতঃ এই গীতিনাট্যে গানগুলি স্বপ্রধান বা মুখ্য সঙ্গীতের (স্থর) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যধর্ম পিছনে পড়েছে। এইজন্যেই মায়ার খেলায় স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য অনুভব করা যায় আগাগোড়া। বাল্মীকি-প্রতিভার আলোচনায় বলেছি, এই গীতিনাট্যের গানগুলি এককভাবে সাধারণতঃ গাওয়া হয় না। মায়ার খেলার গানগুলি কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বা এককভাবে গাইবার বিশেষ উপযোগী। অর্থাৎ স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ঠিকই বলেছেন যে, ইতালীয় অপেরার সঙ্গে এই গীতিনাট্যের মিল রয়েছে।[৪২] বস্তুতঃ বাল্মীকি-প্রতিভার গানগুলি নাট্যপ্রধান এবং মায়ার খেলার গানগুলি আবেগ-প্রধান। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণ-যোগ্য :

ক. বাল্মীকি-প্রতিভা থেকে—

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ—
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আস্পর্ধা তোদের,
মোরে নিয়ে এ কি হাসি-তামাশা।
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবর্দার রে খবর্দার!

দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার!

খ. মায়ার খেলা থেকে—

সখীগণ। অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহো পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়রতন-আশে।

সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে॥

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে দেখি, পদান্তের মিল সত্ত্বেও সংলাপের আদর্শ ব্যাহত হয় নি। দুই দুই ছত্রে বিভিন্ন দুজন দস্যুর বক্তব্যের ও চরিত্রের সংঘাত পরিস্ফুট। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে সংলাপের আকার শুধু আছে, আসলে সংলাপ-ধর্ম অনুপস্থিত— একটি ভাবরস বিভিন্ন পাত্রীর আধারে অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রবাহিত। নাটকে চরিত্র-অনুযায়ী সংলাপ রচিত হয় বা হওয়া উচিত। এ দিক থেকে বাল্মীকি-প্রতিভা সার্থক রচনা। কিন্তু মায়ার খেলার সংলাপ-মূলক গানের সঙ্গে যে-সব নাম রয়েছে, সেই নামগুলি যদি তুলে দেওয়া যায়, তা হলে গানগুলি যেমন সংলাপ-ধর্ম হারায়, তেমনি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়ে, অথচ কোনোটির গীতরসের কোনো হানি বা অপূর্ণতা ঘটে না। বালিকার সঙ্গে বনদেবীগণের, বাল্মীকির সঙ্গে দস্যুদের সংলাপের (গানের) ভাষাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। কাজেই

বলা যায়, বাল্মীকি-প্রতিভা হচ্ছে গানের আকারে সংলাপ— মায়ার খেলা সংলাপের ছলে গান; রবীন্দ্রনাথের কথায় গানের সূত্রে নাট্যের মালা এবং নাট্যের সূত্রে গানের মালা।

বাল্মীকি-প্রতিভার এই সংলাপধর্ম আবার অন্য দুখানি গীতি-নাট্যের তুলনায় অনেক বেশী; বাক্-রীতির সঙ্গে অভিন্ন:

১. বলো হো হো হো
২. হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ
৩. রাখো রাখো রাখো বাঁচাও আমায়
৪. দূর দূর দূর, আমরে আর ছুঁস নে
৫. এ পাপ আর না, আর না, আর না
৬. এখন কেন করছ, বাপু, উঁ উঁ উঁ
৭. চল্ চল্ চল্— এখনি যাই
৮. এ বনে এসো না, এসো না, এসো না

কালমৃগয়াতে এই বৈশিষ্ট্য নেই। মায়ার খেলাতে মাত্র একটি গানে (ভালোবেসে দুখ সেও সুখ) এই বিশেষত্ব চোখে পড়ে (যেমন— না না না, সখা; মন দাও দাও, দাও সখী)। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়— নৃত্যনাট্যের গানের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথাসময়ে সেদিকে আলোকপাত করা হবে।

অবশ্য কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে পরস্পরের মধ্যে। তা হচ্ছে কোরাসের ব্যবহার। য়ুরোপীয় অপেরাতে কোরাস একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রায় প্রত্যেক অপেরাতেই (কোনো কোনো কোরাস নেপথ্যবর্তী, যেমন দেবুসীর Pelléas Et Melisande-তে) কোরাসের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়ার বনদেবীগণ মায়ার খেলায় মায়াকুমারীগণে রূপান্তরিত।[৪৩] আমাদের বাংলাদেশের যাত্রায় কোরাসের বদলে বিবেকের ভূমিকা

আছে। কখনো-বা সূচনায় একদল বালক (অপেরার প্রভাব ?) সমবেতভাবে গান গায়। সংস্কৃত নাটকেও কোথাও কোথাও (যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলের নেপথ্যবর্তী হংসপদিকার গানের মধ্যেও) অনুরূপ ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। নাটকে কোরাসের উপযোগিতা কতখানি বা আদৌ থাকা উচিত কিনা তা অবশ্য তর্কাতীত নয়। এ বিষয়ে Frederich Schiller-এর (১৭৫৯-১৮০৫ খৃঃ) অভিমত উল্লেখযোগ্য। নাটকের তথাকথিত বাস্তবতায় গ্যেটে বিশ্বাস করতেন না এবং এই আন্দোলনে তিনি শীলারের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। শীলার নিজেও গোটের ঐ মতবাদে আস্থাবান ছিলেন। গ্যেটের মতোই তাঁর ধারণা ছিল— রঙ্গমঞ্চের কারুশিল্প বা দৃশ্যপট আসলে প্রতীকধর্মী। তা ছাড়া কৃত্রিমও বটে।[৪৪]

য়ুরোপীয় অপেরায় কোরাসের উপযোগিতা ও ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে যে বনদেবীগণ ও মায়াকুমারীগণের ভূমিকা রয়েছে, বলা বাহুল্য, তা অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধন করেছে। নাগ্‌লার কোরাসকে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বলেই মনে করেছেন ; সে উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকের কল্পনাকে স্বাধীনতা দেওয়া। এবং চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র রচনা করা। বনদেবী ও মায়াকুমারীরা মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে এক দিকে যেমন কল্পনাকে মুক্তি দেয়, অন্য দিকে তেমনি ঘটনা ও চরিত্রের এবং দৃশ্যগত যোগসূত্র রচনা করেছে। এ দিক থেকে, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে য়ুরোপীয় অপেরার (বা মিউজিক ড্রামার) প্রভাব পড়েছে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের আঙ্গিকে য়ুরোপীয় অপেরার এই প্রভাব ছাড়াও আরো কোনো কোনো দিক উল্লেখযোগ্য। যেমন বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের দস্যু এবং কালমৃগয়ার বিদূষকের (কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যগুলির) ভূমিকা। Opera Buffa বা ফরাসী

Opera Comique-এর প্রভাব হয়তো বা পড়ে থাকবে। উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্যেও এই ধরণের হাল্কা বা কৌতুক-দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। 'পঞ্চরঙ' ইত্যাদির মধ্যে কমিক বা কৌতুকাভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে য়ুরোপীয় অপেরার অনুসরণেই এই জাতীয় দৃশ্যের উপস্থাপনা করেছেন কিনা, তা তর্কাতীত নাও হতে পারে। বিশেষতঃ কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা যখন আমাদের দেশীয় নাটকের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। মায়ার খেলায় এই ধরণের কোনো দৃশ্য নেই। তার সুযোগও নেই অবশ্য। বিদূষক বা প্রথম দস্যুর যে কৌতুককর ভূমিকা, আসলে তার বীজ চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। বিদূষকের চরিত্র, আশা করি, কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রসঙ্গেই বাল্মীকি-প্রতিভার শেষ দৃশ্যের কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৫] বলা বাহুল্য, এই কবিতাটি উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যবহৃত হয় নি। এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? মনে হয়, সুরের মধ্যে দিয়ে যে নাটকীয়তা ফুটে উঠেছিল— তার মধ্যে স্বভাবতঃই একটা মত্ততা, বলা উচিত— সুরের ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল। এই কবিতাটি তার মাঝে গাম্ভীর্য এনেছে। এইভাবে গীতিনাট্যটি একটি গভীর প্রশান্তির মধ্যে ধীরে ধীরে সমাপ্ত। এ দিক থেকে, কবিতাটির একটি গুরুত্ব রয়েছে।

গীতিনাট্যের রূপান্তর

রূপান্তরের আলোচনা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেই কারণেই অপরিহার্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্রই অবশ্য এই রূপান্তর চোখে পড়ে। সে আলোচনা প্রসঙ্গান্তর। গীতিনাট্যের বিষয়গত ও আঙ্গিকগত রূপান্তরের দুটি দিক। এক, মূলকাহিনীর— দুই, রবীন্দ্রনাথের নিজের

রচনার। গুরুত্বের দিক থেকে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টির দাবীই বেশী, কেননা, লেখকমাত্রই কাহিনীর উপজীব্য হিসেবে প্রাচীন বা প্রচলিত কাব্য ও কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সেই গৃহীত উপাদান লেখকের ব্যক্তিত্বে বা সৃজনীক্ষমতার গুণে নবরূপায়ণে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।[৪৬] একদিক থেকে বলা যায়, এই রূপান্তর সৃষ্টিরই নামান্তর। বরং ঐদিক থেকে লেখকের নিজের লেখার রূপান্তর অপেক্ষাকৃত বেশী আলোচনার যোগ্য; তার মধ্যে লেখকের মানসিক পরিবর্তন ও শিল্পচেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে এই দ্বৈত রূপান্তরই লক্ষ্য করা যায়। বাল্মীকি-প্রতিভার কাহিনী হল— দস্যু বাল্মীকির কবি-বাল্মীকিতে পরিণতি। মূল কাহিনী রামায়ণের। রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর যোগসূত্র নিতান্তই সূক্ষ্ম ও দূরবর্তী। পার্থক্যও সুস্পষ্ট। (প্রসঙ্গক্রমে কাহিনী কাব্যের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার কথাও স্মরণীয়।) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত এই গীতিনাট্য প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'এই সারদামঙ্গলের আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকিপ্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই একটা কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইয়াছে।'[৪৭]

প্রেরণার দিক থেকে মূল রামায়ণ ও বিহারীলালের 'সারদা-মঙ্গলের' ভূমিকা স্বীকার করেও এই গীতিনাট্যের কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টিতে অভিনবত্বই চোখে পড়ে। এবং তা যেমন মূল রামায়ণের থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি সারদামঙ্গলের সঙ্গেও অমিলটাই বেশী। এই গীতিনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাল্মীকির চরিত্রটি কবি যে পরিবেশ ও পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন তার পিছনে

রবীন্দ্রনাথের 'স্বকীয়তার'ই স্বাক্ষর রয়েছে। দস্যুবৃন্দ, বালিকা, বনদেবীগণ, সবশেষে লক্ষ্মী সরস্বতীর আবির্ভাব— এসবই কবির কল্পনাসঞ্জাত।[৪৮]

প্রসঙ্গক্রমে গীতিনাট্য (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ কালমৃগয়ার কথাও স্মরণযোগ্য। এই গীতিনাট্যের কাহিনীও রামায়ণ থেকেই নেওয়া। দশরথ মৃগয়াকালে অন্ধমুনির পুত্রকে মৃগভ্রমে বধ করেন, এই কাহিনীই রবীন্দ্রনাথের উপজীব্য। লক্ষণীয়, এই গীতিনাট্যের শিকারীগণ, বনদেবী, লীলা, বিদূষক-চরিত্রগুলি মৌলিক সৃষ্টি।

এই দুখানি গীতিনাট্যের আলোচনা যৌথভাবে করা দরকার। বাল্মীকি-প্রতিভা সম্বন্ধে বলা হয়েছে— '১৮০২ শকের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতীর সেকালের প্রচ্ছদটি এই পুস্তকের মলাট হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৩। আন্দাজ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম অভিনয় হয়। পুস্তকটি এই দিনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।'[৪৯] কালমৃগয়া প্রসঙ্গে জানা যায় '... প্রকাশকাল ১.৮৯। ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষ্যে খৃষ্টীয় ১৮৮২ সালের শনিবার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হয়।'[৫০]

এই দুখানি গীতিনাট্যের মধ্যে মাত্র বছরখানেকের ব্যবধান। অতঃপর ১২৯২ ফাল্গুনে এ দুয়ের মিলিত রূপ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বিষয়ে যে কথা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য :

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী

আহূত হইয়াছিল, ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী-উপলক্ষ্যেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়।[৫১]

এবং এরই সঙ্গে—

বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথকর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতি-নাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

তার পর দ্বিতীয় সংস্করণ (ফাল্গুন ১২৯২) গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত আছে— 'অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে কালমৃগয়া হইতে গৃহীত।'

এই দুখানি গীতিনাট্যের যুগ্ম-রূপায়ণের পিছনে যে কারণ বর্তমান তা হচ্ছে— 'কিন্তু সময় অল্প, নূতন-নাটক রচিবার সময় নাই।'[৫২]

বস্তুতঃ নিম্নলিখিত গানগুলি অবিকৃত বা সামান্য শব্দগত পরিবর্তন করে কালমৃগয়া থেকে পরিবর্ধিত বাল্মীকি-প্রতিভায় গৃহীত হয়েছে :

১. আঃ বেঁচেছি এখন
২. এনেছি মোরা এনেছি মোরা
৩. রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে (ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে)
৪. এই বেলা সবে মিলে (বনে বনে সবে মিলে)
৫. গহনে গহনে যা রে তোরা
৬. চল্ চল্ ভাই
৭. কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে

৮. প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে

৯. সর্দারমশায়, দেরি না সয় (ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়)

কালমৃগয়ার পঞ্চম দৃশ্যই সামান্য পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকি-প্রতিভার চতুর্থ দৃশ্যে রূপান্তরিত। 'আঃ বেঁচেছি এখন' গানটি কালমৃগয়ায় পঞ্চম দৃশ্যে ছিল। বাল্মীকি-প্রতিভায় পরে প্রথম দৃশ্যে সংযোজিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে এই দুটি দৃশ্যের মধ্যে ভাবগত ও পরিবেশগত রীতিমতো সাদৃশ্য রয়েছে। দশরথ নিশীথ রাতে শিকারে বেরিয়েছেন— দস্যু বাল্মীকিও 'তন্ন তন্ন করি অরণ্য করী বরাহ খোঁজ গে'— আদেশ দিয়েছে। দশরথের সঙ্গে নিশ্চয়ই বাল্মীকির চরিত্রগত তুলনা চলে না। কিন্তু এক দিকে আবার বেশ মিল রয়েছে। দুজনেই শিকারীদের 'রাজা'। কাজেই কালমৃগয়ার পঞ্চম দৃশ্যটিকে প্রায় অবিকৃত ভাবেই অনুরূপ পরিবেশে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে, এক দিকে হয়তো কালমৃগয়া অবহেলিত হয়েছে, কিন্তু এই যুগ্ম-মিলনের ফলে পরিবর্ধিত বাল্মীকি-প্রতিভা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য বিদূষকই প্রথম দস্যুর মধ্যে আত্মগোপন করেছে, কেননা এ দুটি চরিত্র মনোধর্মের দিক থেকেও অভিন্ন। একজন 'সর্দারমশায়' এবং আর-একজন 'ঠাকুরমশয়' হলেও এ শুধু নামান্তর মাত্র—এ যেন নামাবলী খুলে রেখে ভোল বদলানো।

আগেই বলেছি, গীতিনাট্য হিসেবে কালমৃগয়া ত্রুটিপূর্ণ, দৃশ্য-বন্ধের শৈথিল্য বড়ো বেশী প্রকট। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মনেও অস্বস্তিবোধ ছিল। সময়ের অল্পতা হয়তো অন্যতম কারণ ; কিন্তু এই ত্রুটির কথা ভেবেই তিনি এই গীতিনাট্যের নতুন করে রূপ দেবার চেষ্টায় ছিলেন। অন্য দিকে প্রথম সংস্করণ বাল্মীকি-প্রতিভাও দৃশ্যবন্ধের দিক থেকে না হোক, আয়তনের দিক থেকে অপূর্ণ

ছিল। দু দিক থেকেই এই ত্রুটি সংশোধন করবার জন্যেই তাঁকে এই রূপান্তরে হাত দিতে হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, গানগুলির সুরারোপে কোনো তারতম্য ঘটে নি।

দৃশ্যগত রূপান্তর শুধু এখানেই শেষ নয়, আরো রয়েছে। বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম সংস্করণে ছিল মাত্র তিনটি দৃশ্য। পরিবর্ধিত সংস্করণে দেখা গেল আরো তিনটি দৃশ্য বেড়েছে। অর্থাৎ ষষ্ঠ দৃশ্যে সমাপ্ত। প্রথমে এই গীতিনাট্যের সুরু ছিল দস্যুর কথা দিয়ে। যেমন :

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ—
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় দেখা গেল, প্রথম দৃশ্যের সুরু বনদেবী-গণের গানে—'সহে না সহে না কাঁদে পরান।' প্রথমে যে রূপ ছিল তা রীতিমতো নাটকীয়। পরিবর্তিত অবস্থায় সেই নাটকীয়তা বিলুপ্ত। কোরাসধর্মী এই গানটি সম্পূর্ণভাবে এই দৃশ্যটির চরিত্র বদলে দিয়েছে। সুরুতেই গীতিনাট্যটি বস্তুধর্মিতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি বেদনাঘন অথচ জীবনাতীত পরিমণ্ডল রচনা করেছে। পরিবর্তিত সংস্করণে 'সহে না সহে না' গানটির পরে প্রথম দস্যুর যে গানটি সন্নিবেশিত, আসলে তা কালমৃগয়ার বিদূষকের গান; পঞ্চম দৃশ্য থেকে নেওয়া। বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম দস্যুর মধ্যে বিদূষক রূপান্তরিত। লক্ষ্য করা দরকার, প্রথম থেকেই এই চরিত্র দুটির রূপ ছিল একই; কাজেই নামান্তর ঘটলেও চরিত্রের রূপান্তর বলতে যা বোঝায় তা ঘটে নি। তবে পরিবর্তিত রূপে চরিত্রটি

আরো বিকাশ লাভ করেছে। এই সংস্করণে বাল্মীকির 'শোন্ তোরা তবে শোন্' গানটির পর সকলের (দস্যুদের) 'ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়— মাথার উপরে রয়েছেন কালী সমুখ রয়েছে জয়' গানটির এই দুটি চরণ প্রথমে ছিল না। মূল গানটি যথারীতি ছিল —'তবে আয় সবে আয়···'। এ গানটির সঙ্গে পূর্বোক্ত চরণ দুটি সংযোজিত হওয়ার ফলে দস্যুদের চারিত্রিক দৃঢ়তা (সুরযোজনার দিক থেকেও) আরো সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রথম দৃশ্যেই বালিকার গান :

ওই মেঘ করে বুঝি গগনে।
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে।
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বনভ্রমণে।
ঘরে ফিরে যাব কেমনে॥

—গানটি নবসংযোজিত। তার বদলে বালিকার প্রবেশের সঙ্গে গান ছিল— 'এ কী এ ঘোর বন! এনু কোথায়' ইত্যাদি। ওই গানটি সংযোজিত হওয়ার ফলে বালিকার আবির্ভাবে বিষাদের সঙ্গে ক্লান্তি মিশ্রিত আবহাওয়াটি পূর্ণতা পেয়েছে। পথশ্রমের ক্লান্তির সঙ্গে পথহারা বালিকার হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশে ওই গানটি সহায়তা করেছে। এই দৃশ্যটি প্রথমে সমাপ্ত ছিল সকল দস্যুদের 'হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ' গানটির সঙ্গে, কিন্তু নবসংযোজনে দস্যুদের গানের পর বনদেবীগণের প্রবেশের একটি গান রয়েছে :

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।
আহা, ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চায়।

বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে— এ কী দশা হায়।
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে—
কে ওরে বাঁচায়॥

এই গানটির সঙ্গে প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি। সামান্য হলেও এ গানটির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বনদেবীদের এই ভূমিকার মধ্যে দিয়ে কবি যেন প্রতি দৃশ্যের মর্মবাণী উন্মোচন করেছেন। পরবর্তী গীতিনাট্যে মায়াকুমারীদের মধ্যেও একই তাৎপর্য খুঁজে পাই। আরো পরবর্তীকালে বিশেষতঃ সাংকেতিক নাটকে এই চেতনা বা বোধই অন্যভাবে প্রকাশমান।[৫৩]

দ্বিতীয় দৃশ্য সুরু হয়েছে বাল্মীকির 'রাঙাপদ-পদ্মযুগে' গানটির সঙ্গে কিন্তু প্রথমে কানাড়াতে একটি গান ছিল :

নিশুম্ভ-মর্দিনী অম্বে,
মহা-সমর-প্রমত্ত মাতঙ্গিনী, কম্পে রণাঙ্গন পদভারে একি!
থরহর মহী সমুদ্র, পর্বত ব্যোম,
সুরনর শঙ্কাকুল কে এ অঙ্গনা!

'রাঙাপদ-পদ্মযুগে' গানটি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা বলে ইন্দিরা দেবী মনে করেন।[৫৪] এরই সঙ্গে বালিকার কণ্ঠে নব-সংযোজিত নিম্নলিখিত গানটি প্রথমে ছিল না :

কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।
দয়া করো অনাথারে— কে আমার আছে—
বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়।

এই গানটির বদলে গারাভৈরবীতে অন্য একটি গান ছিল :

কী দশা হল আমার (হায়)
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো !
মুহূর্তের তরে, মাগো, দেখা দাও আমারে
জনমের মতো বিদায়।

বলা বাহুল্য, 'কী দোষে বাঁধিলে' গানটি পরের গানটির চেয়ে অধিকতর বেদনাব্যঞ্জক ; এবং এই সূত্রেই বলা যায়, পূর্বোক্ত করুণ রসকে ঘনীভূত করে তুলেছে ঐ গানটি। 'বাঙ্গালী' রাগে বাল্মীকির 'শোন্ তোরা তবে শোন্' গানটির সঙ্গে যথারীতি পরিবর্ধিত সংস্করণেও দ্বিতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি।

তৃতীয় দৃশ্য থেকে চতুর্থ দৃশ্যের অধিকাংশ নতুন সংযোজন কালমৃগয়া থেকে নেওয়া। তা ছাড়া তৃতীয় দৃশ্যে বাল্মীকি যখন 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে' গানটির সঙ্গে বিদায় নিলেন তার পরেই দস্যুদের প্রবেশের গান ছিল 'আর না, আর না, এখানে আর না।' কিন্তু পরিবর্তিত রূপে এর মধ্যবর্তী অংশে যে গানগুলি সংযোজিত তার মাধ্যমে দস্যুদের ভূমিকা আরো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বালিকার 'হা, কী দশা হল আমার'-বর্জিত গানটি এই অংশে স্থান পেয়েছে। 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী' গানটিও অক্ষয় চৌধুরীর রচনা বলে ইন্দিরা দেবী উল্লেখ করেছেন। বাল্মীকির 'অহো! আস্পর্ধা একি তোদের নরাধম!' এবং 'রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু' গান দুখানি সংযোজনার ফলে বাল্মীকি চরিত্রটি পূর্ণতা পেয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে পঞ্চম দৃশ্যের শেষ বনদেবীদের 'নমি নমি ভারতী' থেকে বাল্মীকির 'এবার ছেড়ে চলেছি মা' অংশটুকু প্রথমে ছিল না। এই দৃশ্যেই বনদেবীদের প্রবেশের 'বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী' গানটিও নব-সংযোজন। ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষ দুখানি গান— 'এই যে হেরি গো দেবী আমারি' এবং 'দীনহীন বালিকার সাজে' গান-দুটির মানে প্রথমে

গৌড়-মল্লারে একটি দীর্ঘ গান ছিল, যার সুরু হচ্ছে— 'হৃদয়ে রাখো গো, দেবী, চরণ তোমার।'[৫৫] গানটি বর্জিত হওয়ার ফলে নাটকীয় উৎকর্ষ বেড়েছে।

আলোচিত গীতিনাট্য দুটির কাহিনীগত প্রেরণা রামায়ণের। গীতিনাট্য মায়ার খেলার মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা গেল স্বতন্ত্র সৃষ্টির প্রয়াস। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা দরকার। ইতিমধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' এবং তার আগে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' ঠাকুর-পরিবারে ঘরোয়া পরিবেশে অভিনীত হয়েছিল। এ দুখানি গীতিনাট্যের কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা গীতিনাট্যেই সর্বপ্রথম মৌলিকত্ব দেখালেন সব দিক থেকে। গদ্যনাটক নলিনীর সঙ্গে এই গীতিনাট্যের সাদৃশ্য রয়েছে। মায়ার খেলাকে নলিনীরই রূপান্তর বলা যায়। কিন্তু এ রূপান্তর আগের মতো নয়। তবে পাত্রপাত্রীর নাম বদলালেও অর্থাৎ রূপান্তর ঘটা সত্ত্বেও এর পিছনে নলিনীরই প্রেরণা রয়েছে। আর এ কথা তো কবি জীবনস্মৃতিতে নিজেই স্বীকার করেছেন— 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।' অন্যান্য রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা করলে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, এ রূপান্তর ভিন্ন প্রকৃতির। নলিনী, নীরদ ও নীরদা যথাক্রমে প্রমদা, অমর ও শান্তায় পরিণত।[৫৬] মূল চরিত্রের পরিবর্তন না ঘটিয়েই গীতিনাট্যের চরিত্রগুলি রূপায়িত। বলা বাহুল্য, গীতিনাট্যের প্রয়োজনেই মায়াকুমারী, সখীর অবতারণা করা হয়েছে। মনে হয়, কুমার ও অশোক চরিত্রের খুব বেশী উপযোগিতা নেই। তাই যদিও নলিনীর মূল ভাবটিই এই গীতিনাট্যের উপজীব্য, তবু কাহিনী-বিন্যাসের দিক থেকে মায়ার খেলা অহৈতুকভাবে জটিল

হয়ে পড়েছে। এই ত্রুটির কারণ হয়তো এই যে, নাটকের আঙ্গিকের চেয়ে গীতরূপের প্রতিই কবির আকর্ষণ বেশী। পরবর্তীকালে মায়ার খেলাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করবার সময় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন হয়েছেন।[৫৭]

শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মনে চঞ্চলতা বা অতৃপ্তি যেন সদা জাগ্রত ছিল। তাই তিনি কোনো একটি রূপকে ঐকান্তিক ও অপরিবর্তনীয় বলে ভাবতে পারেন নি। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে, কোনো একটি বিশেষ ভাব, ঘটনা বা ক্রিয়ার একটিই নাট্যরূপ হতে পারে। কাজেই নাটকের রূপান্তরের প্রশ্নই ওঠে না। অন্যত্র যাই হোক, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার ফল নিঃসন্দেহে শুভময় হয়েছে। বস্তুতঃ প্রথম সংস্করণ বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়ার দৃশ্যবন্ধের শৈথিল্য, অপূর্ণতা এবং নাটকীয় উৎকর্ষের অভাব সুপ্রকট। দ্বৈত-মিলনের বা সংযোজনের ফলে দেখা গেল, পরিবর্ধিত রূপটি (রূপান্তর !) আঙ্গিকগত সংহতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই রূপান্তর ঘটিয়ে এক দিকে যেমন আঙ্গিকের ত্রুটি সংশোধন করেছেন তেমনি এ কথাও বোঝা যায়— তাঁর নাট্যচেতনা সংহতির পথে সমুত্তীর্ণ। কবি নিজেও এবিষয়ে সচেতন। তাই— 'এই গীতিনাট্যের অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।'

আঙ্গিকের এই রূপান্তর ছাড়াও বাল্মীকি-প্রতিভার রূপান্তর আর-একদিক থেকে উল্লেখযোগ্য— তা হচ্ছে ভাবের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ঘটেছে অবশ্য বাল্মীকি-চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই গীতি-নাট্যের প্রতিপাদ্য-কাহিনীর সঙ্গে মূল রামায়ণ বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অংশের তুলনা করলেই দেখা যাবে—

বাল্মীকি-চরিত্রটি নতুন রূপে অঙ্কিত। এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবির একটি বিশেষ বক্তব্য ফুটে উঠেছে। কাহিনী কাব্যের কাব্যনাট্য-গুলির বিশেষ করে গান্ধারীর আবেদন বা কর্ণকুন্তীসংবাদ-এর মধ্যেও দেখা যাবে চরিত্রগুলি এক-একটি ভাবের দ্যোতক। বাল্মীকি-চরিত্রও তাই। আগেই বলেছি, এই কাহিনীর উপজীব্য হচ্ছে দস্যু-বাল্মীকির কবি-বাল্মীকিতে পরিণতি। অর্থাৎ একটি নিষ্ঠুর হিংস্র প্রকৃতির মানুষ শেষে মানবপ্রেমের স্পর্শে মহৎ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-নাথের নাটকের মধ্যে দেখেছি— তিনি সব সময়েই অখণ্ড মানব-ধর্মকেই সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। এবং এই মানবধর্মের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বালিকার মতো এক শ্রেণীর চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন, যারা কলুষের মর্মমূলে আঘাত করেছে। প্রকৃতির পরিশোধের বালিকা, বিসর্জনের জয়সিংহ, রক্তকরবীর নন্দিনী, মুক্তধারার অভিজিৎ হচ্ছে তারই প্রতীক। বাল্মীকি-প্রতিভার বালিকাও তাই। জয়সিংহের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চেতনা ফিরেছে রঘুপতির, বালিকাকে হারিয়ে জীবনের সত্য অনুভব করেছে সন্ন্যাসী, নন্দিনীর জন্যেই (রঞ্জনের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে) বেরিয়ে আসতে হয়েছে রাজাকে ; আর অভিজিৎ ও তার মৃত্যুই বিশ্বজিৎকে নতুন পথের সন্ধান দিয়ে গেছে। সন্ন্যাসী, রঘুপতি, রাজার মতো দস্যু বাল্মীকিও একটা অন্ধ মোহের পিছনে ছুটেছিল। হিংসাই ছিল জীবনের মূল মন্ত্র। এমন সময়ে যেমন করে নন্দিনী যক্ষপুরীতে আবির্ভূত হয়েছে, বালিকার আবির্ভাব— তার করুণ মিনতির মধ্যে দস্যু-বাল্মীকি যেন তার নগ্ন মূর্তিকে দেখতে পেল। সেই মুহূর্তেই এল ধিক্কার, হাহাকারে ভরে উঠল মন। এতদিনকার মোহের আবরণ খসে পড়ল। মেঘের ধূসরতা দূর হতেই নীলাকাশ প্রসন্ন নয়ন মেলে তাকাল। প্রেমের জয় হল। বন্দিনী বালিকাকে মুক্তি দেওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই কবি-বাল্মীকির মুক্তিলাভ হল— এতদিন যে দস্যু-বাল্মীকির মধ্যে বন্দী হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, এই গীতিনাট্যের মধ্যেই উত্তর-কালের মানব বা প্রেমধর্মের বীজটি নিহিত। কবি-জীবনের সুরুতেই যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেলাম বাল্মীকির চরিত্রে, তা সত্যিই দুর্লভ ও বিস্ময়কর। যথার্থই তিনি এ বিষয়ে কৃত্তিবাস-বিহারীলালকে অতিক্রম করে গেছেন।[৫৮]

গীতিনাট্যের মঞ্চকলা ও রূপসজ্জা

রবীন্দ্র-নাট্যকলার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চকলার বিবর্তনও নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। এই ধারাবাহিক বিবর্তনের পথে মঞ্চকলা নিয়ে যে বিচিত্র সমীক্ষা ও পরীক্ষা করা হয়েছে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চোখে পড়ে এর এক প্রান্তে রয়েছে গীতিনাট্যের যুগ, অপর প্রান্তে নৃত্যনাট্যের পর্ব। বাল্মীকি-প্রতিভা তারই ভূমিকা রচনা করেছে।

বাস্তবিকপক্ষে নাট্যকলার সঙ্গে মঞ্চকলার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে কোনো দেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলা যায়। যে ভাবেই দেখা যাক না কেন, নাটককে যখন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে দৃশ্যকাব্য আখ্যা দিতে দেখি, তখনই মনে হয়— নাটককে দর্শকের সামনে দৃশ্যময় বা অভিনয় করাই নাট্যকারের লক্ষ্য।[৫৯] শুধুমাত্র জীবনচেতনা বা কাব্যচেতনা নয়, অভিনয়যোগ্যতা মঞ্চের উপযোগিতা দর্শকের উপস্থিতি ও রসবোধ— এসবের দিকে তাকিয়ে নাটক রচনা করতে হয়। এদিক থেকে নাট্যকারের স্বাধীনতা যেমন (রচনার দিক থেকে) সীমাবদ্ধ তেমনি দায়িত্ব অনেক বেশী।[৬০]

শুধু তাই নয়, দেশকালের পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ বলেই বিশেষ বিশেষ যুগে প্রত্যেক দেশেই বিশিষ্ট মঞ্চকলার সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সমতা রেখেই মঞ্চকলাকে অগ্রসর হতে হয়েছে— কোনো ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এবং এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এক যুগের সঙ্গে পরবর্তীযুগের ওতপ্রোতভাবে যোগ রয়েছে। এইভাবে মঞ্চকলার মধ্যযুগেরও শিল্পচেতনার ধারাবাহিক চিত্র দেখতে পাই। এই ধারাবাহিকতা বা পরিবর্তনের কথা ভেবেই সম্ভবতঃ Peter D. Arnott পরিহাসের সুরে বলেছেন মঞ্চকলা প্রায় পোশাকের মতোই দ্রুত রূপ বদলায়।[৬১] কিন্তু মঞ্চে আমরা কী দেখতে চাই? নাটকের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তার মধ্যে স্বভাবতই আমরা বাস্তবতা খুঁজি। অর্থাৎ ঘটমান অবস্থায় দৃশ্য বা অভিনয়কে প্রত্যক্ষ করতে চাই। এই প্রত্যক্ষরূপই হচ্ছে মঞ্চকলার বাস্তবতা। Arnott এইভাবে দু শ্রেণীর মঞ্চকলার কথা উল্লেখ করেছেন—'that of convention and that of illusion.' এই সঙ্গে তাঁর অভিমত হচ্ছে বর্তমান যুগ 'largely dominated by the theatre of illusion.'

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের মঞ্চকলার আলোচনা করতে বসে সেযুগে বাংলা মঞ্চকলার চেহারা কেমন ছিল এই প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের যাত্রা বা পালাগানের যুগ চলে গিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে যেমন নাটক বা অপেরার যুগ দেখা দিল, মঞ্চকলাও তেমনি পাশ্চাত্য রীতিরই অনুসরণ করছিল। য়ুরোপীয় অপেরা হয়তো অনেকেই ভালো চোখে দেখতে পারেন নি, কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, য়ুরোপীয় মঞ্চকলার যা কিছু

বিকাশ বা উৎকর্ষ তা অপেরাকেই কেন্দ্র করে। সপ্তদশ শতকে মঞ্চের যেসব কারুশিল্পী দেখা দিলেন, সকলেই অপেরার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে জাপানে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উদ্‌ভবের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চকলার এক যুগান্তর এল, এরই অনুসরণে য়ুরোপে Karl Lantenchläger ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ম্যুনিকে Residenz Theatre-এ সর্বপ্রথম এই রীতির প্রবর্তন করেন। এবং এর পর থেকেই বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই মঞ্চকলায় চূড়ান্তভাবে বাস্তবতা আনবার চেষ্টা চলতে থাকে। তা অবশ্য পরের কথা। সে যাই হোক, উনিশ শতকের বাংলা নাট্যাভিনয়ে তথা মঞ্চকলায় তারই অন্ধ অনুকরণ দেখা যায়। বাংলার সমাজ তখন দ্বিধাবিভক্ত। নব্য ও প্রাচীন -পন্থীরা নিজের নিজের আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী। নব্য ধনী তথা অভিজাত সমাজ পুরোমাত্রায় পাশ্চাত্যভাব বজায় রাখতে ব্যস্ত। জয় হল তাঁদেরই। বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে বাধা ছিল না। আর নাট্যাভিনয় ছিল তারই অঙ্গ, আভিজাত্যের বা বিলাসের অভিব্যক্তি। নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যেত সকলের সামনে। বাইরের 'ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাবার' দিকেই দৃষ্টি ছিল বেশী— সত্যিকার শিল্প-চেতনার অভাব ছিল বললে বোধ হয় ভুল হয় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নবীন বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দরে'র যে অভিনয় হয় তাতে দেখি— নাট্যাভিনয়কে 'বাস্তব' করে তোলার জন্যে যে বিচিত্র মঞ্চকলার ব্যবস্থা হয় তা 'ছেলেমানুষি' তো বটেই হাস্যকরও বলা চলে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দৃশ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশেষতঃ সুন্দরের সুরঙ্গ প্রবেশের দৃশ্যে এই ছেলেমানুষির চরম নিদর্শন রয়েছে! এই-সব দৃশ্য দর্শকদের বারবার স্থান বদল করে দেখতে হত। এমনি এক অন্ধ অনুসরণজাত কৃত্রিম বাস্তবতার

মোহ তৎকালীন মঞ্চকলাকে পঙ্গু করে তুলেছিল সুরু থেকেই। পাশ্চাত্য থিয়েটারের দৃশ্যপটের অনুকরণের প্রবণতা এমনি মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল যে এই দৃশ্যপট তৈরীর জন্যে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। 'সীন' তৈরী করাই ছিল তাঁদের ব্যবসা। তাঁদের বলা হত 'পটুয়া'। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মঞ্চে এঁদের রীতিমতো চাহিদা ছিল। এইসব পটুয়ারা রাজপথের ধারেই এইসব 'সীন' আঁকতেন।[৬২] রাস্তার দুপাশের বাড়ীর দেওয়ালে পট টাঙিয়ে তাঁরা তুলির স্পর্শে রাজপ্রাসাদ, কান্তার, নদনদী, নগরের রাজপথ প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলতেন। এইসব দৃশ্যপটের পরিকল্পনার পিছনে সত্যিকারের শিল্পবোধের পরিচয় খুব বেশী ছিল না।

যেমন প্রশস্ত রাজপথের সামনে জনতা কিন্তু পিছনে জনহীন গৃহ এবং পথ! এমনি নানা অসংগতিতে সে-সব দৃশ্যপট পূর্ণ ছিল। য়ুরোপীয় মঞ্চকলার অন্ধ-অনুসরণেরই ফল এসব। অবনীন্দ্রনাথ এমনিই এক পাবলিক ষ্টেজের বর্ণনা দিয়েছেন 'ঘরোয়া'তে— 'বসে আছি, ড্রপসীন পড়ল তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা, রাজপুত্তুর চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ, পিছনে পাহাড়ের সার, গ্রীক যুদ্ধের একটা কপি। কোনো সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়েছিল বোধ হয়,…' ইত্যাদি। বিস্ময়ের কথা, সেদিনকার বিদগ্ধ নাট্য-রসিকরাও এই অনুকরণের বা কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিয়েছেন।

প্রথম দিকে ঠাকুর-পরিবারের মঞ্চকলাও এ থেকে মুক্ত ছিল না। বাল্মীকি-প্রতিভার আগে যেসব নাট্যাভিনয় হয়েছিল, মঞ্চকলার দিক থেকে অনুরূপ মঞ্চকলারই পরিচয় পাই সেইসব অভিনয়ে। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয় :

'অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ

ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। ষ্টেজও যতদূর সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল।'[৬৩]

এই সঙ্গে :

'দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।'

পুনশ্চ—

'ঝড়বৃষ্টির একটি দৃশ্য ছিল— তাহাতে সত্য সত্যই ঝর ঝর করিয়া জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টি ধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল।'

অন্যত্র—

'সীনও যেখানে যেমনটি দরকার, পুকুরঘাট রাস্তা; ষ্টেজ আর্ট যতটুকু রিয়ালিষ্টিক হতে পারে হয়েছিল। একটা বনের দৃশ্য ছিল, অন্ধকার বনের পথ,··· সেই বনের সীন এলেই বাবামশায় অন্ধকার বনপথে জোনাকি পোকা মুঠো মুঠো করে ছেড়ে দিতেন।'[৬৪]

রঙ্গমঞ্চের এই ঐতিহ্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মঞ্চের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। বাংলার লৌকিক মঞ্চকলার বা নাট্যকলার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। হয়তো বা মঞ্চকলার ঐ কৃত্রিমতা

প্রথম থেকেই তাঁর চোখে পড়েছিল। তাই বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ এ কথা ভেবেই—'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালে নাটক ও অভিনয়ের যে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্পষ্টবোধের অগোচরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা বাংলাদেশের যাত্রাগান, কৃষ্ণলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস নহে, তাহা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় আদর্শে গড়া থিয়েটারের অনুসরণে রচিত নাটকের অভিনয়। এইসব অভিনয়ের ক্ষীণ স্মৃতি-কণিকাগুলি বালকের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত ছিল এবং উত্তরকালে পূর্ণাঙ্গ আর্টরূপে কবির জীবনে প্রকাশ পায়।'[৬৫]

বাল্মীকি-প্রতিভার মঞ্চকলা ঐ আদর্শেই রচিত। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বর্ণনাগুলি উদ্‌ধৃত করা গেল :

'বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় হবে, এবারে একটু অদলবদল হয়ে গেল। হ. চ. হ. এলেন সেবারে, তাঁর উপরে ভার পড়ল ষ্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে ছুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চমিথুন হল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সীন আঁকলেন কচুবনে বরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডালপালা এনে লাগিয়ে দিলেন।··· এই রকম তখনকার ষ্টেজ, আর রবিকাকা তাতে প্লে করেছেন, ভেবে দেখো কাণ্ডটা।'

'ষ্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে। দোতালার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে ষ্টেজের ভিতরে। নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সীন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে।'

'তখন এরকম ইলেক্‌ট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস-বাতি, কার্বন

লাইটের ব্যবস্থা হল। লাল সবুজ মখমলের পর্দা দিয়ে ষ্টেজটা সাজানো হল।'

'পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়্ কড়্ করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি, দুটো দম্বেল ছিল··· নিতুদা দোতালার ছাদ থেকে সেই দম্বেল দুটো গড় গড় করে এধার ওধার গড়াতে লাগলেন। সাহেব মেমরা তো মহাখুশী, হাততালির পর হাততালি পড়তে লাগল। যতদূর রিয়ালিষ্টিক করা তার চূড়ান্ত হয়েছিল।··· ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে দীনু ষ্টেজে এল। একজন আবার উঠে ঘোড়াকে একটু ঘাসটাসও খাওয়ালে। সে কী এ্যাকটিং যদি দেখতে।'[৬৬]

এই সূত্রেই কালমৃগয়া সম্বন্ধে এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে '··· সেবারে জ্যোতিকাকামহাশয়ের সত্যিকারের একটা পোষা হরিণ বের করে দেওয়া হল ষ্টেজে। তখনো ষ্টেজ সজ্জায় আমাদের হাত পড়েনি।' বলা বাহুল্য, মঞ্চকলার এই আঙ্গিকের পিছনেও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যা বলেছেন, একটা 'ছেলেমানুষি'র ভাব রয়েছে। প্রতিমা দেবীও বলেছেন, 'এইসব আঙ্গিকের মধ্যে যদিও অপরিণত আর্টের পরিচয় পাওয়া যায়, বস্তুতঃ তখনকার দিনে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে হলে এই ধরণের উপায়গুলির প্রয়োজন হত।'[৬৭] এবং সেইজন্যেই 'ঐ মেঘ করে বুঝি' গানটির সঙ্গে মেঘের গর্জন শোনাবার প্রয়োজনে দম্বেল গড়িয়ে 'রিয়ালিষ্টিক' এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন করা হয়েছিল! এই কারণেই 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে'-র সঙ্গে বৃষ্টির আবাহন করতে হয়েছিল ছাদের উপর থেকে।

মঞ্চের এই বাস্তবানুকৃতির প্রবণতার সঙ্গে রূপসজ্জার মধ্যেও পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণও লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চসজ্জায় দামী

ভেলভেট, সিল্কের কাপড় ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছিল। সেই সঙ্গে পোষাকের মধ্যেও রীতিমতো বনেদিয়ানা ফুটে ওঠে। বাল্মীকির পোশাক তৈরী হয়েছিল য়ুরোপীয় আদর্শে— 'পিঠের দিকে যে লম্বা জোব্বা মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে বিলিতী রাজরাজড়াদের mantle এর আভাস পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা।'[৬৮] দস্যুদের সাজসজ্জার মধ্যে যে 'বাস্তবতা' দেখি, তা মনগড়া দুটি কারণে— এক, তরুণ প্রযোজকগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব বা অল্পতা, আর সেই বাস্তবের রূঢ়তা ও স্থূলতা একটু শোভন সহনীয় না করে নিয়ে উপায় ছিল না; তাই তাদের কাবুলীওয়ালাদের মতো সাজ 'ইয়া গোঁফ এবং ইয়া পাগড়ি'। রীতিমতো ভীতিব্যঞ্জক সেই পোশাক! বাংলাদেশের দস্যু বা ডাকাতদের যে স্বাভাবিক বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে খালি গায়ে কালিঝুলি-মাখা! অথচ মঞ্চে পুরোপুরি এই সজ্জা শোভন নয়। এইজন্যেই বলছি, এবাস্তবতা মনগড়া বা মনঃকল্পিত।

এই মঞ্চকলার সঙ্গে চিত্রকলার একটা যোগ রয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে আমাদের চিত্রশিল্পে তখন রবিবর্মার যুগ। আজ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল যামিনী রায়ের যুগে রবিবর্মার শিল্প-স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় চিত্রশিল্পে রবিবর্মা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[৬৯] তাঁর রূপকল্পনার মধ্যে পশ্চিমী Illusion সৃষ্টির প্রবণতাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। অর্থাৎ যাকে বলে বিলিতী 'অ্যাকাডেমিক পেন্টিং' সেইটেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই-জন্যেই তাঁর শিল্পে প্রাচ্যভাবের একান্ত অভাব দেখা যায়। তখনো এদেশের প্রাচীন রূপকলা বাংলা বা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে আবিষ্কৃত হয়নি বা স্বীকৃতি পায় নি, কাজেই তৎকালীন বাস্তবানুকারী

কলাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই গীতিনাট্যের লক্ষ্মী সরস্বতীর রূপসজ্জার মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করি, যদিও পৌরাণিক রীতির অনুসরণে তা উপস্থাপিত করা হয়েছিল। লাল ও সাদা শাড়িতে জরির কাজ ছিল। বনদেবীদের সাজ হিসেবে নানা-রঙের শাড়ি, লতাপাতা, এলোচুলে ফুল ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বলা বাহুল্য, এখানেও ঐ প্রভাব বিদ্যমান।

পরবর্তীকালে অবশ্য সাজসজ্জার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। দস্যুদের আগের রূপসজ্জার বদলে দেখা দিল ধুতি, ফতুয়া; পাগড়ির বদলে মাথায় 'একটা ফেটি বাঁধা'। ইন্দিরা দেবীর অভিমত— এইসব অভিনয়ের আদ্য মধ্য অন্ত্যরূপের রূপসজ্জা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। খুবই স্বাভাবিক যে আদিযুগে মঞ্চকলা বা সাজসজ্জার এই আদর্শ পরবর্তীযুগে অনুসৃত হয় নি। বস্তুতঃ Arnott রঙ্গমঞ্চের কথা বলতে গিয়ে যে Illusion-এর কথা বলেছেন, এই পর্বের মঞ্চকলায় ঐ আদর্শই লক্ষ্য করি।

এই গীতিনাট্য (২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮১) প্রথম অভিনীত হয়। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২, শনিবার ঐ রঙ্গমঞ্চেই (জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী) পরবর্তী গীতিনাট্য কালমৃগয়া অভিনীত হয় একই মঞ্চ-কলার আদর্শে। তৃতীয় গীতিনাট্য মায়ার খেলা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মঞ্চস্থ করা হয়। মঞ্চশিল্পের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখি না। পোশাকে আগেকার জৌলুষ ছিল 'সখাদের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙের সাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি, তার সঙ্গে ঈষৎ গোঁফের রেখা। আর মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মুণ্ডে ইলেকট্রিক আলো জ্বল্‌ছিল আর নিভছিল, বোধ হয় বিলিতী পরীর অনুকরণে। তখন সব বিষয়ে বিলিতী অনুকরণটাই প্রবল ছিল।'[৭০]

এ থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, য়ুরোপীয় মঞ্চকলার

আদর্শানুসরণের ফল বলেই কোনো মৌলিকত্ব বা প্রাচ্যভাব দেখা যায় না এই পর্বের মঞ্চকলায়। য়ুরোপীয় অপেরার মঞ্চকলায় বিভিন্নভাবের উপযোগী বিশেষ বিশেষ রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[৭১] এইসব দৃশ্যপটে বাস্তবতাকে রূপ দেবার প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মঞ্চকলায় প্রতীকত্ব বা সাংকেতিকতাও দেখা গেছে যেমন— ভিয়েনাতে অভিনীত রূপকধর্মী অপেরায়। সে যাই হোক, য়ুরোপীয় মঞ্চকলাই যে উনিশ শতকের রঙ্গমঞ্চের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই সূত্রেই বলতে পারি, এই গীতিনাট্যগুলি নাট্যকলার দিক থেকে উৎকর্ষ লাভ করলেও মঞ্চকলার দিক থেকে এই গীতিনাট্যগুলিতে কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা দেখা যায় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনো মৌলিক নির্দেশের কথা জানা যায় না। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ষ্টেজসজ্জায় তখনো তাঁদের হাত পড়ে নি। মনে হয়, প্রকারান্তরে তিনিও এই কথাই বলতে চেয়েছেন। ঘরোয়া পরিবেশের গণ্ডী অতিক্রম করে বাস্তবতার মোহ কাটিয়ে রবীন্দ্র-মঞ্চকলা পরবর্তী-কালে কিভাবে বিবর্তনের পথে এগিয়ে গেছে, যথাসময়ে সে দিকে আলোকপাত করা হবে।

গীতিনাট্যের কাব্যবস্তু

কাব্যের মানদণ্ডে গীতিনাট্যের বিচার যুক্তিসংগত নয়। কেননা এখানে গীতিরসই মুখ্য, কাব্যরস নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলছেন— 'বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে…।' গীতিনাট্যগুলি সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে একথা প্রযোজ্য।[৭২] গান ও কবিতার মূল পার্থক্য হচ্ছে— গানে শব্দগত ধ্বনি ছাড়াও স্বরধ্বনির মিলন ঘটে। এবং তারই ফলে প্রসঙ্গান্তরে আনন্দবর্ধন

বা অভিনবগুপ্ত যাকে 'রসধ্বনি' বলেছেন তারও উদ্ভব হয়। কথা ও সুরের এই যৌগপত্যের কারণে পুরোমাত্রায় কথা বা শব্দগত ধ্বনির মধ্যেই ছন্দ বা তাল আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই গান ঠিক সুনিয়মিত ছন্দে রচিত পাঠযোগ্য কবিতা নয় (প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের একাধিক গান রয়েছে যেগুলো কবিতা হিসেবেও আস্বাদযোগ্য। কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে গানের ও কবিতার ছন্দ এক নয়)। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যথার্থ। কিন্তু অন্যদিক থেকে হয়তো সাহিত্যগত মূল্যায়ন করা চলে— তা হচ্ছে ভাববিশ্লেষণ বা কবিমানসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

গীতিনাট্যের যুগটি আসলে একটি দশকের পরিসীমায় বিধৃত (মোটামুটিভাবে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ)। এর একপ্রান্তে রয়েছে ভগ্নহৃদয় অপর প্রান্তে মানসী। প্রাক্‌-মানসী পর্ব রবীন্দ্র-কাব্যের ভূমিকা বা প্রস্তুতিপর্ব। কবি নিজেও সেকথা বলেছেন; তাঁর মতে মানসী থেকেই তাঁর কাব্যরসরূপ লাভ করেছে।[৭৩] এখানে এই পর্বের কাব্যপরিচয় প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু এই সময়ে কবিমানসের স্বরূপ বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য :

'ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন এক সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায়, এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি পৃথিবী হয়ে ওঠে।'

এরই সূত্র ধরে :

'আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ

বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণ-বহির্ভূত অদ্ভুত-মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন, অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না।'[৭৪]

নিজেকে না-জানার, অপরিচিত পৃথিবীর আনাচে কানাচে চোখ মেলে তাকাবার এই যে প্রবণতা যার সঙ্গে যুগপৎ বিস্ময় আনন্দ ও বেদনা জড়িত— তাকেই তো বলি রোমান্টিক মনের লক্ষণ। মনের চার দিকে একটা অহৈতুকী ব্যাকুলতা ঘুরে বেড়ায়— সব কিছুর মধ্যেই মন খুঁজে পায় অদৃশ্য আহ্বান— সীমা থেকে অসীমের দিকে তারই অলক্ষ্য ইঙ্গিত। যে-কোনো কবিকে বা শিল্পীকে এমনি একটি মানসস্তর অতিক্রম করে তবে সৃষ্টির পালা সুরু করতে হয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, যে-কোনো কবি বা শিল্পীর জীবনে এই প্রস্তুতিপর্ব নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় মন সব কিছুকে গ্রহণ করবার জন্যে উন্মুখ ও প্রস্তুত থাকে বলেই বন্যার জলের মতো বিচিত্র সম্পদ মনের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। বন্যার জল সরে গেলে যেমন আসল পলিমাটি পড়ে থাকে তেমনি সংহত যৌবনের আবির্ভাব ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিচিত্র সম্পদের পলিমাটিতে মনের কোণে সুনিভৃতে সোনার ফসল ফলে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নয় বরং এই সত্য গভীরভাবে উদ্‌ঘাটিত। জীবনের প্রভাত-লগ্নে

যা-কিছু তিনি অনুভব করেছিলেন— যে অভিজ্ঞতা তিনি প্রথম জীবনে লাভ করেছিলেন— ব্যথা, বেদনা, শিল্পানুভূতি, সাহিত্যপাঠ, সুখদুঃখ— এ-সবই কবির সারা জীবনের সমস্ত সাহিত্যের যে কী সম্পদ ও উপাদানরূপে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল, তা রবীন্দ্র-পাঠকের অজানা নয়।

একটা দৃষ্টান্ত শুধু দিই। বৌঠানের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে 'পুষ্পাঞ্জলি' রচিত। জীবনের শেষপর্বে, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, 'লিপিকা'র মধ্যে এইসব লেখার যেন কতদিন বাদে ঘুম ভেঙেছে নতুন করে। এক কথায়, কবি নিজেও হয়তো সচেতন ছিলেন না— সম্ভবতঃ তাঁর অগোচরেই তিনি যা বলেছেন, তার মধ্যে দিয়ে অনাগত কালের পদধ্বনি শোনা যায়।

বাল্মীকি-প্রতিভা থেকে মায়ার খেলা পর্যন্ত এই পর্বটিকে সংকুচিত করে এর মধ্যে কবিমানসের সন্ধান করতে গেলে ঐ কথাগুলিই মনে পড়ে। বস্তুতঃ বাল্মীকি-চরিত্রে আমরা কোন্ মনোধর্মের পরিচয় পাচ্ছি ?

দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই বাল্মীকির মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা জেগেছে :

এ কেমন হল মন আমার।
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে।
পাষাণ হৃদয় গলিল কেন রে।
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে।
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে॥

এবং-

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই, কেন প্রাণ কাঁদে রে!

বাল্মীকি-চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র কিভাবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাটকে দেখা দিয়েছে, 'রূপান্তরের' আলোচনায় সে কথা উল্লেখ করেছি। সে কথা স্মরণ করে বলতে পারি, আসলে এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের এক সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। পাপ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত এই যে, আংশিকের প্রতি আসক্তিবশতঃ সমগ্রের প্রতি অন্যায়। বাল্মীকির প্রথম জীবনে তারই প্রতিফলন দেখি। কিন্তু কবি বিশ্বাস করেন— দুঃখের তপস্যার মধ্যে দিয়েই মানুষের সত্যানুভূতি ঘটে। তাই শেষ পর্যন্ত বাল্মীকিকে 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে' ঘুরে ঘুরে সেই দুঃখের তপস্যায় মগ্ন হতে হয়েছে। এবং অবশেষে সিদ্ধিলাভের মধ্যে বাল্মীকির কাছে জীবনের সত্যরূপ ধরা পড়েছে। সরস্বতীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ!

আকারে না হোক, ভাবের দিক থেকে এই গীতিনাট্যে বাস্তবিকপক্ষে মহাকাব্যিক সমারোহ রয়েছে। কবি অজ্ঞাতসারেই নিজের জীবনের ভাষ্যকার হয়ে পড়েছেন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ঠিকই বলেছেন— 'কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আশ্চর্যভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বিস্ময়কর ভাবে prophetic।"[৭৫]

কালমৃগয়া এ দিক থেকে বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে তুলনীয় নয়। নাট্যরসের মতো ভাবের দিক থেকেও বিশেষ কোনো গভীরতা চোখে পড়ে না। একটা ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে নেই তা নয়। অন্ধমুনি দশরথের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েও শেষে ক্ষমা

করেছেন। এই ক্ষমা বা প্রেমধর্মই এখানে ব্যক্ত। নিঃসন্দেহে ভাবের দিক থেকে এই আদর্শবোধ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যত্রও রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিকল্পনার এমন কোনো চমৎকারিত্ব বা গভীরতা এখানে নেই যা থেকে বলতে পারি— এর প্রভাব অন্যত্র ছড়িয়ে আছে।

সে দিক থেকে বরং মায়ার খেলা অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিকভাবে কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনীর ভাবগত স্বাজাত্য ছাড়াও এই গীতিনাট্যের উপজীব্য প্রেম সম্বন্ধে কবির ধারণাটি উত্তরকালে নানা লেখায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এ থেকে অবশ্য এই ধারণা হয়তো যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে যে— সেগুলি সর্বতোভাবে এই গীতিনাট্যের প্রভাবসঞ্জাত। কিন্তু এ কথা বোধ হয় ঠিক যে, মায়ার খেলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবির মানস-সংযোগ সুনিবিড়। এই কাহিনীর উপজীব্য— প্রেমের বিচিত্র রূপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। অমর শান্তা ও প্রমদাকে ভালোবেসেছে। প্রমদাও অমরকে ভালোবাসে, তবে সে ভালোবাসা চপল; নিজেকে সখীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। স্বভাবতই প্রত্যাখ্যান ভেবে অমরকে ফিরতে হয় শান্তার কাছে। শেষে প্রমদা যখন আবার দুজনের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হল— অমর ও শান্তার কাছে তার 'গোপন কথা' প্রকাশিত হল। গভীর বেদনা বুকে নিয়ে ফিরতে হল তাকে। প্রমদা তাই মধ্যবর্তিনী, বিচিত্র প্রেমের মূর্তিমতী। নলিনীর সঙ্গে নায়ক নীরদের মিলন ঘটাবার জন্যে নীরজার মৃত্যু ঘটাবার প্রয়োজন হয়েছিল। এই গীতিনাট্যে বিচ্ছেদ আরো বেদনা-দায়ক, ট্র্যাজেডির রস এখানে স্বতোৎসারিত। এ প্রেমকে কী আখ্যা দেব? নরনারীর বৈচিত্র্যময় প্রেমের স্বরূপ হল— প্রেমের বিশিষ্ট আধারে সকলের সমান অধিকার থাকে না। নারী ও

পুরুষ— প্রত্যেকের এক-একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, যেখানে তারা সহজ, যেখানে তারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারে, একাত্মবোধ করে। যে মুহূর্তে তারা সেই স্থান থেকে চ্যুত হয়, সেই মুহূর্তেই অনিবার্যভাবে ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসে। প্রেমের সুনির্দিষ্ট ভূমিকায় নারী ও পুরুষের সার্থকতা। অমর ও শান্তা সেই ভূমিকাতেই পরস্পরকে কাছে পেয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীও এই গীতিনাট্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে অন্য দিক থেকে বলেছেন যে, এখানে প্রেম সম্বন্ধে পরিণত ধারণার পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে। সে ধারণা হচ্ছে প্রথমতঃ, প্রেমের পরিপূর্ণতার জন্যে বিরহ ও দুঃখের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ প্রেমের মোহ বা রোমান্সের চেয়ে মানুষের পক্ষে আশ্রয়ের প্রয়োজন বেশী।[৭৬] এই মন্তব্য গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেমের চরিতার্থতার জন্যে মোহকে অতিক্রম করে দুঃখের বা বিরহের তপশ্চর্যায় মগ্ন হতে হবে— এই ভাবটি অবশ্য কালিদাসের মধ্যেও আছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই তত্ত্বটিই প্রতিষ্ঠিত। শান্তা সেই বিরহের প্রদাহে অবগাহন করেই অমরকে পেয়েছে। আর এই বিরহের যন্ত্রণা বুকে নিয়েই ফিরতে হল প্রমদাকে।

বাস্তবিকপক্ষে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে পরস্পরের কাছে কী আশা করে? একটি সুস্মিত জীবন, একটি নিভৃত নীড়; প্রেম তারই রাখীবন্ধন। দুজনকে বেঁধে রাখে। কাজেই এ প্রেম শুধু তো কল্পনা নয়, এ যে জীবনের একান্ত প্রয়োজন; চোখের নেশা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর, প্রয়োজন বলেই মোহের বন্ধনে বাঁধা পড়লে তো চলবে না। চাই আশ্রয়, যেখানে প্রেম নিত্যনূতন কাব্য রচনা করে জীবনে। এইজন্যেই মোহগ্রস্ত প্রেম কালিদাসেরও স্বীকৃতি পায় নি, রবীন্দ্রনাথেরও অভিপ্রেত নয়। দুঃখের আগুনে

মোহকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে তবেই প্রেমের যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব। অমরও এইভাবে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ঐ প্রসঙ্গেই মানসীর কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ মানসীর যুগে লেখা বলেই মায়ার খেলার মধ্যে এই কাব্যের ভাবগত স্বাজাত্য বা প্রভাব রয়েছে। ১২৯৪-এর সুরু থেকে ১২৯৭-এর শেষ পর্যন্ত (প্রথম প্রকাশকাল ১০ পৌষ ১২৯৭) এই কাব্য-গ্রন্থের রচনাকাল। প্রথম দিকের কবিতাগুলি লেখা হয় পার্ক স্ট্রীটের বাসায়, মাঝে কিছুদিনের জন্য দার্জিলিঙে অবসর যাপন; পরে গাজিপুর সোলাপুর এবং লণ্ডনে গমন। গাজিপুর থেকে কলকাতায় ফেরার পর মায়ার খেলা রচিত হল। এ থেকে বোঝা যাবে—মানসীর ভাবাবেশের পরিমণ্ডলেই মায়ার খেলার জন্ম।

মানসীর বেশ-কিছু কবিতার মধ্যে একটা বেদনার ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের মূল উপজীব্য হচ্ছে প্রেম। সেই প্রেম যদি বলি বিরহ-ভারাক্রান্ত তা হলে বোধ হয় ভুল হয় না। আবেগ-মিশ্রিত দুর্মর বেদনা বিরহ শোক ও ব্যাকুলতা প্রচ্ছন্নভাবে অথবা অপ্রচ্ছন্নভাবে এই কাব্যকে আশ্রয় করে আছে। জীবনের গভীর থেকে উৎসারিত এই আর্তিই মায়ার খেলার মধ্যেও ফুটে উঠেছে। অমর ও শান্তার প্রেম আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু প্রমদার? তার প্রেম কি সত্যিই ব্যর্থ হয়েছে? শেষ মুহূর্তে তার লীলাময়ীর ছদ্ম আবরণ খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেকার সেই চিরকালের নারীরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অমরের কাছে যেমন প্রমদার সেই প্রেমের গভীরতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শান্তার কাছেও তেমনি সেই প্রেমেরই আর-এক রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। অমরের প্রেমনিষ্ঠায় শান্তার সন্দেহ করার কারণ যেমন নেই, সেই সঙ্গে

সে বুঝেছে— একদিন অমর প্রমদাকেও মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল। অমর নিজেও কি তা দেখতে পায় নি? সে কি প্রমদার আর্ত অন্তরের হাহাকার শুনতে পায় নি? পেয়েছিল, ফেরার পথ ছিল না। শান্তা সবটুকু বেদনাকে স্বীকার করে নিলে। প্রমদাকেও ফিরতে হল। ফিরে যাবার আগে সে বলেছে 'তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে।' ব্যথাভরা অশ্রু নিয়েই সে ফিরেছে। তবু তার প্রেম অনির্বাণ। বেদনার মধ্যে দিয়েই সে দুজনের মধ্যে জেগে রইল।

বস্তুতঃ এই পর্বে কবির এই প্রেমচেতনাই এই গীতিনাট্যে ফুটে উঠেছে। প্রেম বিচিত্র বলেই বাইরে থেকে তার সবটুকু পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা মনের অন্তরালে সে তার আপন বাণী লিখে যায়। এই বিচিত্র প্রেমজালে নরনারী ধরা পড়ে; ধরা দিতে বাধ্য হয়। অবশেষে একটু একটু করে সেই রহস্যের আবরণ সরে যেতে থাকে; তখন সেই প্রান্তভূমিতে দাঁড়িয়ে পুলক ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পরস্পরকে চিনতে পারে। এই তো প্রেমের স্বরূপ, প্রেমের বিচিত্রতা! আর বিশ্ব জুড়ে এমনিই এক ফাঁদ পাতা রয়েছে প্রেমের—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।

গীতিনাট্যের প্রকৃতি ও পরিসীমা

পূর্ববর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে গীতিনাট্যগুলির প্রকৃতি ও পরিসীমা, সেই সঙ্গে পূর্বভাষণে উল্লিখিত মূল সুরের যাথার্থ্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

নাটকের বা গীতিনাট্যের দুটি প্রধান উপাদানের কথা বলা হয়েছে— অভিনয় ও কথা বা গান। এই প্রসঙ্গেই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণীয় :

১. অভিনয়কে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়— সাধারণ অভিনয় ও নৃত্য-অভিনয়।

২. সাধারণ অভিনয় গদ্যের মতো— ছন্দ আছে কিন্তু তা প্রচ্ছন্ন বা 'অনিয়মিত' ; পক্ষান্তরে নৃত্য-অভিনয় কবিতার মতো, ছন্দ ব্যক্ত বা সুনিয়মিত।

৩. গীতিনাট্যের কথা-অংশ কবিতা বলে ছন্দোময় ; গানে পরিণত হওয়ার ফলে এই ছন্দোময়তার তীব্রতা গভীরতা ও বৈচিত্র্য বেড়ে যায় (কবিতা গানে পরিণত হয়, অর্থাৎ কথা-ছন্দও সুর-ছন্দে বা স্বরছন্দে পরিণত হয়।)

৪. গদ্যে লেখা সাধারণ নাটকেও ছন্দ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না। অমিত্র বা মিত্র পয়ারে লিখিত নাটকে ছন্দ ঈষৎ ব্যক্ত। মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তে রচিত হলে তা আরো ব্যক্ত বিচিত্র ও মুখ্য হয়ে পড়ে। এবং যখন তা গানে পরিণত হয়— সেই মুহূর্তে ছন্দের বেগ, তীব্রতা, মাধুরী— সবই বহুগুণে বেড়ে যায়।

বস্তুতঃ গীতিনাট্যের একটি অঙ্গ ছন্দোময় হয়ে উঠেছে— তা হচ্ছে গানের দিক, যদিও তা অভিনয়ের (যে গায়কীর কথা আগে আলোচনা করেছি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক কথায়, গানের (কথা ও সুরের) ছন্দ অভিনয়ের ছন্দ দ্বারা বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন— 'গীতিনাট্য যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয়, তাহাতে স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হয় না।'[৭৭] এখানে স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গীতিনাট্যের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে একটা

অনিয়মিত ছন্দোময়তা। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া সমজাতীয় রচনা। প্রকৃতি ও প্রকরণের দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। এই দুখানি গীতিনাট্যে, আগেই বলেছি, একই প্রেরণা থেকে কথা ও সুরের আবির্ভাব ঘটে নি। অর্থাৎ কাব্যচেতনা ও সঙ্গীতচেতনা এই দুখানি গীতিনাট্যে সাযুজ্যলাভ করে নি। মায়ার খেলা এ দিক থেকে স্বতন্ত্র, সে কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গীতিনাট্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— কথা ও সুর একই প্রেরণা-সঞ্জাত।[৭৮] সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে কবির ছন্দশ্চেতনা শুধু যে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, তা পরিপূর্ণ মিলনের জন্যেও প্রতীক্ষা করেছে। এরই রূপান্তর ঘটেছে নৃত্যনাট্যে—যেখানে অভিনয় পর্যন্ত (অর্থাৎ নৃত্য, কবির কথায় 'অঙ্গভঙ্গীর কবিতা'[৭৯]) ছন্দোময় হয়ে উঠেছে। অঙ্গভঙ্গীর ছন্দ যখন রসের ধারক বাহক ও প্রকাশক হয় তখনই তাকে বলি নৃত্য। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যবর্তী পর্ব তারই আয়োজন-পর্ব। অতএব দেখা যাচ্ছে, গীতিনাট্য সেই সর্বৈব বা অবিভাজ্য ছন্দোময়তার প্রথম পদক্ষেপ।

উল্লেখপঞ্জী

১ তত্র ত্বভিনয়স্যৈব প্রাধান্যমিতি কথ্যতে।
আঙ্গিকো বাচিকস্তদ্বদাহার্যঃ সাত্ত্বিকোঽপরঃ ॥ ৩৮ ॥
চতুর্দ্ধাভিনয়ম্—(অভিনয়দর্পণ)

প্রসঙ্গতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা স্মরণীয় (৮ম অধ্যায় ৫-১০ শ্লোক)।

দ্রষ্টব্য : *Mirror of Jesture* – A. Coomerswamy.

২ অভিনয়দর্পণ—অশোকনাথ শাস্ত্রী।

৩ নৃত্যে নবরসের ভাবদ্যোতক বিভিন্ন দৃষ্টি বা মুখভঙ্গীর কথা স্মরণীয়।

দ্রষ্টব্য : *Indian Dancing* (Ram Gopal & Scrozh Dadachanji) এবং Marg, Vol. XI, Dec. 1957, No. 1.

৪ Anubrtta— looking up and down. Uses—depicting anger, affectionate calling.

Alokita—A quick circular open look. Uses—to see a moving wheel, request, etc. (Marg, Vol. XI, Dec. 1957, No. 1.)

৫ "So, while poetry attempts to convey something beyond what can be conveyed in prose rhythms, it remains, all the same, one person talking to another ; and this is just as true if you sing it, for singing is another way of talking." (*On Poetry and Poets*—T. S. Eliot.)

৬ গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ—জীবনস্মৃতি।

৭ জীবনস্মৃতি।

৮ "... music is but an idealization of the natural language of emotion ; and that consequently, music must be good or bad, according as it conforms to the laws of this natural language. The various inflections of voice which accompany feelings of different kinds and intensities, are the germs out of which music developed..."

মূল প্রবন্ধ হার্বার্ট স্পেনসর-রচিত *The Origin and Function of Music.* এখানে 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

৯ প্রত্যয়গুলি ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১০ 'গীতিনাট্যের রূপান্তর' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১১ প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য—'গান' সংকলন-গ্রন্থ।

১২ রবীন্দ্রসংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

১৩ তালের উল্লেখ নেই।

১৪ এই মন্তব্য শ্রদ্ধেয় শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার ভিত্তিতে করা হয়েছে।

১৫ স্বরলিপি দ্রষ্টব্য (স্বরবিতান ৪৮: মায়ার খেলা) ১. প্রমদা ২. সখীগণ ৩. প্রমদা ও সখীগণ।

১৬ স্বরলিপি দ্রষ্টব্য (মায়াব খেলা)

১৭ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের সহচরীবৃন্দসহ চিত্রাঙ্গদার শিকার-আয়োজনের দৃশ্যটি তুলনীয়।

১৮. "The Actor should always seek the form that would best bring out the content of a given play, a form that harmonized with its style and was in tune with the author's conception. Everything had to suit the creative method accepted for the play as a whole."—*The Vakhtangov School of Stage Art*—Nikolai Gorehakov.

১৯ "Violating rhythm and symmetry means killing oneself as artist"—তদেব

২০ 'তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে'
'অন্ধজনে দেহ আলো'
'কাঙাল আমারে'
'তুমি এসো হে'
'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু'
'আমার শেষ পারানির কড়ি'
'আমারে কে নিবি ভাই'

২১ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৪

২২ রবীন্দ্রসংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

২৩ 'মানময়ী' ও 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যে নিম্নলিখিত রাগরাগিণী ও তালগুলি ব্যবহৃত :

ক. বেহাগ, বসন্তবাহার, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, পিলু, দেশ, কাফি,

কালাংড়া, গারা, লচ্ছাসার, বাগেশ্রী, ললিত, কালাংড়া-পরজ, জয়জয়ন্তী, ভৈরবী, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, দেশমল্লার, বেলোয়ার, বিভাস, পঞ্চম-বাহার, পরজ, সোহিনীবাহার, খট-রামকেলী, কুকুভ, ভূপালী, ভৈঁরো, টৌড়ী, মিশ্র কেদারা, শংকরা, সাহানা, ছায়ানট, ইমন-কল্যাণ।

খ. ঝাঁপতাল, কাওয়ালী, খেমটা, একতালা, যৎ, দাদরা, আড়াঠেকা।

২৪ রাগ ও রূপ (১ম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

২৫ রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী।

২৬ "Indian music is a transcendental inward art that searches the relation of man to the universe in quest of permanence, being and rest, in accordance with metaphysical profundity of the Hindu people." (*The Music of Asia*—William L. Purcell.—The American Record Guide, March 1960.)

২৭ রবীন্দ্রসংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

২৮ 'পরিশিষ্ট' অংশে গানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯ রাগ ও রূপ (১ম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী শুদ্ধ এবং কাফি-মিশ্রিত দুরকম সিন্ধুর রূপের পরিচয় দিয়েছেন।

৩০ স্ত্রাভিন্‌স্‌কির উক্তি স্মরণীয় :

"The Laws that regulate the movement of sounds require the presence of a measurable and constant value: meter, a purely material element, through which rhythm, a purely formed element is realized."—*Poetics of Music.*

৩১ "...to establish order in the movement by dividing up the quantities furnished by measure."—তদেব

৩২ "If one only need break a habit to merit being labled revolutionary, then every musician who has something to say and who in order to say it goes beyond the bounds of

established convention would be known as revolutionary." —তদেব

৩৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : সূচনা।

৩৪ তদেব : সাহিত্যচর্চা ও সমাজ সংস্কার।

৩৫ "এইভাবে বিহারীলালের নিকট হইতে নাটিকার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট হইতে সুরযোজনা সম্বন্ধে সহায়তা লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য রচিত হইল।" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড— শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

৩৬ "দস্তুরমতো গীতবিপ্লব··· তাল বেতালের নৃত্য আছে, ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই।"— জীবনস্মৃতি

৩৭ দ্রষ্টব্য : *Opera*—Edward J. Dent

৩৮ পরিশিষ্ট অংশে এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৯ দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট

Soprano—The female voice of the highest register.

Mezzo soprano—The voice between a soprano and a contralto in range.

Tenor—adult male voice intermediate between the bass and the alto ইত্যাদি। (Collin's Music Encyclopedia)

৪০ মূল গানে (Nancy Lee) কণ্ঠস্বর ও পিয়ানোর যুগ্ম সংযোজন আছে।

৪১ *The Metropolitan Opera Guide*—(Opera becomes Music Drama)— Mary Ellis and Robert Lawrence. প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণীয় : "···Wagner had transformed the opera orchestra from a body of accompanists into a symphonic unit his—most important contribution to the evolution of opera."

৪২ রবীন্দ্রসংগীত (গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য)—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

৪৩ প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় "...ইহারাই নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকের 'গানের দল' এ পরিণত হইয়াছে।"—রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৪৪ "...Schiller decided to introduce the ancient chorus, which would serve as a living wall, built by tragedy around itself, so as to shut itself off from the world of reality."—*A Source Book of Theatrical History*—A. M. Nagler.

A. M. Nagler 'the function of chorus' প্রসঙ্গে শেষে মন্তব্য করেছেন—"It is by holding as under the different parts and sleeping between the passions with its composing views, that the chorus restores to us freedom, which would else be lost in the tempest. The characters of the drama need this intermission in order to collect themselves ; for they are no real beings who obey the impulse of the moment, and merely represent individuals— but ideal persons and representatives of their species, who enunciate the deep things of humanity."

৪৫ এই কবিতাটি (দীনহীন বালিকার সাজে) পূর্ববর্তী গানের সুরের রেশের সঙ্গে আবৃত্তি করা হত।

বাগ্‌দেবী সরস্বতী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার প্রভাবই হয়তো এই কবিতায় প্রকাশিত।

৪৬ "সাহিত্যিকগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের রচনার মূল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকেন, লইয়া নিজেদের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে পরিবর্জন পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন অর্থারোপ করিয়া থাকেন। এইসব প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরাতন কাহিনী তাঁর স্বকীয় হইয়া উঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় থাকিয়া যায়।"

—রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৪৭ পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থপরিচয়—জীবনস্মৃতি (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা)

৪৮ পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

৪৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী ॥ অচলিত সংগ্রহ (১ম খণ্ড) গ্রন্থপরিচয়।

৫০ গীতবিতান (৩য় খণ্ড) গ্রন্থপরিচয়।

৫১ জীবনস্মৃতি।

৫২ রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫৩ দ্রষ্টব্য ৪৪-সংখ্যক পাদটীকা (The Function of Chorus)

৫৪ গীতবিতান (৩য় খণ্ড) গ্রন্থপরিচয়।

৫৫ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী। অচলিত সংগ্রহ (১ম খণ্ড) গ্রন্থপরিচয়।

৫৬ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ (১ম খণ্ড)— শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

দ্রষ্টব্য : বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ (গীতিনাট্য মায়ার খেলা)

৫৭ দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের 'নৃত্যনাট্যের রূপান্তর' আলোচনা।

৫৮ 'বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা'— শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)।

৫৯ The Sanskrit Drama (*The Indian Theatre* Ch. XV) A. B. Keith বলেছেন—"The Sanskrit drama of the theorists is, despite its complexity, essentially intended for performance, nor is there the slightest doubt that the early dramatists were anything but composers of plays meant only to be read."

৬০ "A dramatist...writes for an audience to reach which his work must comply with the practical condition of the theatre of his time."

—*An Introduction to the Greek Theatre*—Peter D. Arnott

৬১ "Theatrical fashions change almost as quickly as fashions in dress."—তদেব (Convention versus Illusion)

৬২ সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ— হেমেন্দ্রকুমার রায়।

৬৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

৬৪ ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ।

৬৫ রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৬৬ ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ।

৬৭ নাট্যধারা—গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০।

৬৮ রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী।

৬৯ দ্রষ্টব্য : ছিন্নপত্রাবলী ৯৪ সংখ্যক পত্র।

৭০ রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

৭১ Types of Operatic Settings
(*Sources of Theatrical History*)—A. M. Nagler

৭২ "…যে গীতিনাট্য ছাপানো হয়েছে তার গানগুলিকে কেউ যেন কবিতা বলে সন্দেহ না করেন।" —ভূমিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড।

৭৩ ভূমিকা : সঞ্চয়িতা।
রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন আলোচনা স্মরণযোগ্য।

৭৪ জীবনস্মৃতি : ভগ্নহৃদয়।

৭৫ রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

৭৬ তদেব

৭৭ সঙ্গীত ও ভাব (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)

৭৮ "মায়ার খেলায় তিনি প্রথম সুরকে পেলেন, কথাকেও পেলেন। ওতে ওঁর নিজের কথার সঙ্গে সুরের পরিণয় অদ্ভুত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে একেবারে ওঁর নিজস্ব সুর।"—ঘরোয়া।

৭৯ সঙ্গীত ও ভাব (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)

তৃতীয় অধ্যায়

সেতুবন্ধ : নৃত্যনাট্যের আয়োজন-পর্ব

মায়ার খেলার পর থেকে প্রাক্-শিশুতীর্থ পর্যন্ত পর্বটিকে (আনুপূর্বিক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে উত্তরণের মধ্যবর্তী আয়োজন-পর্ব বলা যায়। মূলতঃ কাব্য, গৌণভাবে নাটক ও গান, পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছে এই পর্বে। গীতিনাট্যের যুগে রবীন্দ্র-কাব্য সবেমাত্র প্রবেশিকা শ্রেণী অতিক্রম করেছে; এই সময়ে কিন্তু কাব্যকেই কবিমনের প্রধান বাহনরূপে দেখি। বলা বাহুল্য, এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক বা ঋতুনাট্যও রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রসঙ্গেও তাই বলা যায়— প্রথম যুগের যেটুকু সংকোচ ছিল, তা সম্পূর্ণভাবেই ঘুচে গেছে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছে কাব্যকে কেন্দ্র করেই। কাব্য, নাটক বা সঙ্গীত— আঙ্গিকের নতুন নতুন পরীক্ষায়, সুর-সমাবেশের নানা বৈচিত্র্য— এই পর্বেই লক্ষ্য করি। সামগ্রিকভাবে এইসব কলা-বৈচিত্র্য ও রূপায়ণ নৃত্যনাট্যের ভূমিকা রচনা করেছে অর্থাৎ এই পর্বটি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সেতুবন্ধ।

মানসী রচনার কালে বা প্রাক্-গীতাঞ্জলি যুগে রবীন্দ্রনাথের মন অহৈতুকী রোমান্টিক চেতনায় ভারাক্রান্ত। একটা দ্বন্দ্ব, একটা অকারণ বিশ্ববোধের ব্যাকুলতায় কবিমন দ্বিধা-বিভক্ত। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা প্রাসঙ্গিক চিঠিখানি স্মরণযোগ্য।[১] 'কড়ি ও কোমলে' এসে আঙ্গিকের দুর্বলতা, ভাবগত শৈথিল্য ও ছন্দের অপটুতা ঘুচে গেল। বিশেষভাবে লক্ষণীয়— সোনার তরী, যেতে নাহি দিব, বসুন্ধরা এবং নিরুদ্দেশ যাত্রা— এইসব কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি কবির যাত্রাপিপাসু মনের দ্যোতক। 'চিত্রা'

কাব্যে এই যাত্রার কথাই নতুনভাবে দেখা গেল 'জীবনদেবতা'র গতিশীল ব্যক্তি-স্বরূপের কল্পনার মধ্যে। অরূপানুভূতির-চেতনা-সন্দীপ্ত চৈতালি কাব্যের অন্যতম দিক প্রকৃতিপ্রীতি, বিশেষভাবে তপোবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ। গীতাঞ্জলির পূর্ববর্তী কাব্যধারা নানা বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করলেও নৈবেদ্য ও খেয়াতেও কবিমন সুদূরের পিয়াসী, অর্থাৎ অরূপানুভূতি তীব্রতর। গীতাঞ্জলির মধ্যে তারই চরম বিকাশ। ১৩১৩-১৩১৭ সাল পর্যন্ত যে অদৃশ্য যাত্রাধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্র-কাব্যে, তার কিছু পরেই (১৩২১ সালে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে) বলাকায় সেই যাত্রার পদধ্বনি সুস্পষ্ট— বলা উচিত, এই গতিশীল জীবনবোধই কাব্যরূপ নিয়েছে।[২] কবি তাঁর সমস্ত কাব্যের মূল সুরের কথা বলতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, তা আসলে এই যাত্রা— সীমা থেকে অসীমের অভিমুখে এই যাত্রা বাস্তবিকপক্ষে গতিময়তারই প্রকাশ। বলাকার মুক্তছন্দ তারই অনুযায়ী ও অনুগ। বন্ধনমুক্তির অদম্য বাসনা ভাবে ও আঙ্গিকে রূপায়িত। গদ্যকাব্যের যুগে কবি সেই মুক্তি পেলেন— তাঁর ব্রাত্য 'পঞ্চক'-মন তৃপ্তিবোধ করল। গদ্যকাব্যের মূলকথা হল— গদ্য ও কবিতার (পদ্যের) মধ্যে ভাসুর-ভাদ্দরবৌয়ের সলজ্জ সংকোচ[৩] ঘুচিয়ে কাব্যের সীমানাকে প্রশস্ততর করে অতিনিরূপিত ছন্দের গণ্ডীকে অতিক্রম করা। এক কথায়, কাব্যিক অনুশাসনের শৃঙ্খলকে মেনে না নেওয়ার মনোভাবই গদ্যছন্দের মধ্যে ক্রিয়াশীল। কবিতার এই আঙ্গিকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার পরিবর্তনও লক্ষণীয়। প্রায় সর্বত্রই যেমন বিষয়বস্তু তেমনি ভাষার মধ্যেও একটা সহজ সরল নিরলংকৃত আটপৌরে ভাব, বেশ একটা ঘরোয়া মনের ছাপ রয়েছে। পাড়া-জ্বালানো ছেলেটা ও নেড়ী কুকুরের সঙ্গে সাধারণ মেয়ে মালতীর কাহিনী, কিন্তু গোয়ালার গলিতে হঠাৎ-

আলোর-ঝলকানির মতো আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির সহমর্মিতা-বোধ— সর্বরিক্ত সর্বমুক্ত হয়ে এক কূল থেকে আর-এক কূলে যাত্রা— এ-সবের মধ্যে কবির একটি অনাড়ম্বর মানস-উল্লাসের কলতান শোনা যায়। অথচ এর মধ্যে রসপিপাসু চিত্রময় কবিচেতনাই ফুটে উঠেছে। বন্ধনমুক্তির এই যে অনাড়ম্বর মানসোল্লাস, যা রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্বের অন্যতম দিক এবং যা প্রধানতঃ চিত্রধর্মীও বটে, তা অন্য এক রূপময় জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং সেই জগৎ হচ্ছে নৃত্যলোক। সেই নৃত্য-জগতের মূল চেতনা হল রূপময় বিচিত্রগতি ছন্দোবোধ। এইভাবে মানসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্ব অতিক্রম করে রবীন্দ্র-কাব্য তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত।

যেমন কাব্য, তেমনি নাটক। এবং এই পর্বে তার ব্যাপ্তির ইতিহাসটিও কম বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। এই পর্বটি মূলতঃ কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য, ঋতুনাট্য এবং সাংকেতিক নাটকের যুগ। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যধারাকে অনুসরণ করেন নি। কয়েকটি প্রহসন, যেমন— গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা, শোধবোধ, বৈকুণ্ঠের খাতা ছাড়া, সবগুলি কোনো-না-কোনোভাবে রূপকল্পে বা সাংকেতিকতায় প্রোজ্জ্বল। মূলতঃ তিনটি ধারায় এগুলি ভাগ করা চলে। প্রথমতঃ কাব্যনাট্য এবং নাট্যকাব্য ; বিসর্জন, রাজা ও রানী, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, সতী, নরকবাস। দ্বিতীয়তঃ ঋতুনাট্য— শারদোৎসব, বর্ষামঙ্গল, সুন্দর, নবীন, বসন্ত, শেষবর্ষণ, নটরাজ, ঋতুরঙ্গ। তৃতীয়তঃ সাংকেতিক বা রূপক (রূপকল্পময়) নাটক— প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, অরূপরতন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, কালের যাত্রা প্রভৃতি।

চৈতালির পর কথা ও কাহিনীর কথা স্মরণ করে Edward Thompson বলেন যে, এর মধ্যে নাকি তৎকালীন রাজনৈতিক আব-হাওয়ার প্রভাব রয়েছে।[৪] আসলে কিন্তু এর মধ্যে কবির প্রাচীন ভারতে মানস-ভ্রমণের প্রতিক্রিয়াই অনুভূত হয়।[৫] বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সোনার তরী পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের পটভূমিকা বাংলাদেশ, তারপরেই কবি তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন প্রাচীন ভারতের অতীত-লোকে। সৌন্দর্যমুগ্ধ এই কবিমানসের প্রকাশ ছন্দোময় কাব্যনাট্যে বা নাট্যকাব্যে।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ গীতিকবি। তাই তাঁর মন ও মেজাজ যতটা তত্ত্বসহিষ্ণু, ঠিক ততটা তথ্যাসহিষ্ণু। নাটকের মূল কথা বস্তু-তান্ত্রিকতা। কাব্যের বিপরীত কক্ষে তার স্থিতি। নাট্যকাব্য কাব্য ও নাটকের যৌগিক রীতির সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ কেন প্রচলিত নাট্যধারার অনুসরণ করেন নি, তার পিছনে সম্ভবতঃ দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ বস্তুতন্ত্র নাট্যকৌশল তাঁর মনোধর্মের অনুকূল নয়।[৬] কাহিনীর অনিবার্য গতির সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক বিকাশের সাদৃশ্যসাধনের প্রতি যে নিরাসক্ত দৃষ্টি থাকা দরকার, তাতেও তাঁর মানসিক প্রবণতা নেই। সর্বোপরি একটি মন্ময়-অস্থিরতা[৭] কবির মনকে বস্তুজগৎ থেকে ভাবময় অন্তর্লোকে সরিয়ে এনেছে। এই অস্থিরতার জন্যেই বোধহয় একই নাটকের বারবার রূপান্তর ঘটেছে। একে কী বলব? সম্ভবতঃ মনের নিভৃত স্তরে এমনি করেই নাটকের নতুন আঙ্গিক-সৃষ্টির অন্বেষণে মগ্ন হয়েছেন কবি। অর্থাৎ তাঁর নাট্যধারা একটি চরম সার্থক শিল্পরূপের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, য়ুরোপে নাট্যকাব্য বা সাংকেতিক নাটকের যে নব আন্দোলন সুরু হয়েছিল—তা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়।

নাট্যকাব্যের কথা বলতে গিয়ে T. S. Eliot বলেছেন যে, মানুষের গভীর আবেগ-প্রকাশের সবচেয়ে বেশী সুযোগ আছে ছন্দোবদ্ধ পদ্যের মধ্যে; যদি সেইসব আবেগগুলিকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে হয়, তা হলে আমরা কাব্যেরই আশ্রয় নিই।[৮] রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গান্তরে স্বীকার করেছেন যে মানুষ যখন গভীর আবেগভরে কথা বলে, তখন স্বভাবতই তার মধ্যে আপনা থেকেই একটা অতিরিক্ত ছন্দ ও সুর এসে পড়ে।[৯] সেইজন্যেই আবেগপ্রধান কোনো ভাবকে রূপ দিতে গেলে, বিশেষতঃ যা মন্ময়, ছন্দোবন্ধের আবশ্যক।

উনিশ শতকের শেষ পর্বে ডাবলিন থিয়েটারকে কেন্দ্র করে ইয়েট্স্, সিঞ্জ্-প্রমুখ নাট্যকারদের মধ্যে দিয়ে য়ুরোপে নাট্যকাব্যে যে আন্দোলন সুরু হল, তার মূল কথাই ছিল গদ্যের অচলায়তন থেকে নাট্যসাহিত্যকে মুক্তি দেওয়া। আন্দোলনে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মতে, মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এর উপাদান সঞ্চিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে আবেগময় সংলাপের কথা বলেছেন, তার মধ্যেও এই বক্তব্য নিহিত। ষ্টিফেন ফিলিপ্স্এর চেষ্টার পর কিন্তু নাট্যকাব্য সম্পর্কে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। তার উপর, Repertory Theatre এবং Little Theatre-এর আন্দোলনের মধ্যে তৎকালীন নাট্যধারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। অষ্টিন ক্লার্ক নাট্য-কাব্যের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, সমস্যা শুধু এই নতুন আঙ্গিক নিয়েই নয়— তার সঙ্গে জড়িত অভিনেতা, প্রযোজক, এমন-কি দর্শকও, যাঁরা কয়েক ঘণ্টা ধ'রে এসব দেখবেন। ক্লার্ক বলতে চেয়েছেন যে 'Spoken Poetry'র সমস্যাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।[১০] কিন্তু তা কি ভিত্তিহীন নয়? বি. নিকল্স্ ঠিকই বলেছেন যে, এটা একটা সমস্যাই নয়; 'verse speaking'

শিল্প-রীতি হিসেবে আদৌ নতুন তো নয়ই, বরং এটা বিস্মৃত শিল্পকলা।[১১]

যাই হোক, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, এই নাট্যকাব্যের আন্দোলনে এগিয়ে এলেন ইয়েট্স্, এলিয়ট, অডেন, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার -প্রমুখ কবিবৃন্দ। নাট্যকাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁরা দর্শকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেন। ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে বলতে চেয়েছেন যে, মঞ্চের উপযোগিতার কথা চিন্তা করতে হয় বলেই কবিদেরকে নাট্যকাব্যের প্রযোজনা ও মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়েছে।[১২] বস্তুতঃ কাব্যচেতনার এই পালাবদল নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই নাট্যকাব্যের কথা ভেবেই প্রেসিলা থাউলেস্ বলেছেন যে, এর দৃশ্যগত অভিনয়, এমন-কি চিত্তাকর্ষক রোমান্টিক আবেদন অবশ্যই থাকা চাই।[১৩] এদিক থেকে এলিয়টের The Rock ও Murder in the Cathedral উল্লেখযোগ্য। ইয়েট্সে এই ধারার প্রাক্-সূচনা। কবিদের নাট্যপ্রতিভার অভাব আছে, এই প্রচলিত ধারণাতে তিনি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। ফ্লোরেন্স ফার-এর সংস্পর্শে এসে তিনি 'the art of spoken poetry' সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন এবং মঞ্চের সংস্কারকল্পে বলেন যে, মঞ্চের উপর অঙ্গভঙ্গীর থেকেও কথার দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে হবে।[১৪] বস্তুতঃ ইয়েট্সের নাটকে এর প্রমাণ আছে, অর্থাৎ কাব্যধর্মিতাই তাঁর নাটকের প্রধান গুণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি মঞ্চ ও দর্শকের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। নাট্যকাব্যের আন্দোলনে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, আর-এক নতুন পর্বের সূচনা করলেন 'Four Plays for the Dancers'-এ,[১৫] যেখানে তিনি কাব্য সঙ্গীত ও নৃত্যকে একত্র মেলাতে

চেয়েছেন। এর পিছনে ছিল জাপানের নো-নাটকের প্রভাব। আর্নেষ্ট্ ফেনোলোজা -কর্তৃক অনূদিত এবং এজ্‌রা পাউণ্ড্ -কর্তৃক সমাপ্ত সংকলনের ভূমিকায় ইয়েট্‌স্ স্পষ্ট করেই বললেন তিনি এক নতুন ধরণের নাটকের আঙ্গিক আবিষ্কার করেছেন।[১৬]

জাপানের এই নাট্যকলার বিশেষ লক্ষণীয় দিক হচ্ছে সুপরিমিত দর্শকের কাছে অভিনয়; মঞ্চ ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধানহীনতা। ইয়েট্‌স্‌ও এই আদর্শে বিশ্বাসী। এই ধরণের নাটকে মূলতঃ দুটি প্রধান চরিত্র থাকে— Skiti ও Waki ; তারা কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে ও নাচে। তার সঙ্গে রয়েছে মুখোষের ব্যবহার। দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালন, সমবেত-সঙ্গীত এবং চরম মুহূর্তে নৃত্য। ইয়েট্‌স্ বলেছেন যে, এর উপজীব্য ছন্দোময়তা— ছন্দকে রূপায়িত করা। এর মধ্যে বস্তুধর্মিতা প্রায় অনুপস্থিত এবং সম্ভবতঃ তিনি এই জন্যেই এই নাট্যকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। জাপানী নৃত্যশিল্পী Itow-র সহযোগিতায় তিনি তাঁর নৃত্যনাট্যকে রূপ দেন। য়ুরোপীয় নৃত্যজগতে সে এক যুগান্তর।

বাস্তবিকপক্ষে, এই নাট্যান্দোলনের মূল কথা হল বাইরের বস্তু-জগৎ থেকে সরে গিয়ে ভাবময় অন্তরজগতে আশ্রয় নেওয়া। য়ুরোপীয় প্রতীকী আন্দোলনের মধ্যেও এই প্রবণতাই দেখি। ইয়েট্‌স্ নাট্যকাব্যের সূত্র ধরেই নৃত্যনাট্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েট্‌সের মনোধর্মের সাদৃশ্যের কথাও স্বীকার্য। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ইয়েট্‌স্‌ও কাব্য সঙ্গীত ও নৃত্যকে একসঙ্গে নাট্যশিল্পের আধারে ধরে রাখতে চেয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভালো, ইয়েট্‌স্‌ও প্রধানতঃ কবি ছিলেন বলেই কাব্যকে অবলম্বন করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো সুরকার বা সঙ্গীতজ্ঞ নন বলে সুরারোপ করতে পারেন নি, অর্থাৎ

এগুলি একই প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হতে পারে নি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্থক্য। Four Plays for the Dancers-এর দিকে লক্ষ রাখলেই দেখা যায়, ইয়েট্স্ কাব্য সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে একটি ছন্দোময় ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথেরও তাই অভিপ্রেত। এক কথায় বলা চলে, য়ুরোপে ইয়েট্স্ যেমন এক নবনাট্য-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে একটি নতুন পর্ব রচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার বিবর্তনও অনুরূপ তাৎপর্য বহন করছে। রবীন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে বস্তুজগৎ থেকে সরে যেতে যেতে নির্বস্তু সংকেতময় জগতে নিমগ্ন হয়েছেন। অর্থাৎ বাইরের দৃশ্যমান জগতের অন্তরে যে জগতের অস্তিত্ব— তাকে রূপ দেবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। হয়তো কবির মতে সেইটেই বস্তুজগতের সত্য রূপ।[১৭] য়ুরোপের ঐ নাট্য-আন্দোলনের পিছনে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই তাঁকে এই নতুন নাট্যধারা সৃষ্টির কাজে প্রণোদিত করেছে। য়ুরোপের এই নব আন্দোলন-স্রষ্টাদের যৌথ চেষ্টায় যা ক্রমপরিণতির দিকে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার গুণে (একাধারে তিনি কবি, সুরকার এবং নৃত্যরূপরসজ্ঞ) এঁকক চেষ্টাতেই তার বিকাশ ঘটেছে। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে য়ুরোপীয় নাট্যধারার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর হয়তো পড়েছে এবং অন্তঃশীল নদীপ্রবাহের মতো এমনি এক প্রেরণা রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

অবশ্য নাট্যকাব্য বা সাংকেতিক নাটকের ক্ষেত্রে ঠিক কতখানি তিনি য়ুরোপীয় নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বলা কঠিন।[১৮] য়ুরোপীয় প্রতীকী নাটকের মতোই তাঁর নাটকের প্রধান গুণ হচ্ছে— দৃশ্যসন্নিবেশের সংহতি, নাটকীয় চরিত্রগুলির

বিশেষ দেশকালের সীমাতিক্রমণ এবং সর্বোপরি মিতভূষণ সুষমা ও লাবণ্য। ঋতুনাট্যগুলি এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাংকেতিক নাটকের মতোই এগুলি নিরাভরণ নিরাবরণ সৌন্দর্যময়। এই নাটকগুলির বিশেষ লক্ষণীয় দিক গান— গীতি-গৌরবই এর মুখ্য দিক। এক দিক থেকে এগুলিকে গীতিনাট্য বলা যায়, কিন্তু অপেরা তো নয়ই, চাই কি, বলা চলে এই ধারাটি সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র। মানুষের ভূমিকা গৌণ, প্রকৃতি নিজেই মঞ্চে অবতীর্ণ। কাহিনী একটা যে নেই তা নয়, সে শুধু গানগুলি এক সূত্রে ধরে রাখবার জন্যেই।

রবীন্দ্রনাট্যধারার এই বিবর্তনের দিকে লক্ষ রাখলেই দেখা যাবে, কিভাবে তাঁর নাট্যকলাকে সম্পূর্ণ রূপময় করতে চেয়েছেন। প্রথম পর্বের প্রচলিত পঞ্চমাঙ্ক রীতির দৃশ্যবাহুল্য ও বারবার দৃশ্যবদলের জড়িমা ঘুচে গিয়ে এল সাংকেতিক নাটকের পালা। তৃতীয় স্তরে নাটকের আঙ্গিক আরো রূপান্তরিত। পাত্র-পাত্রীর আবির্ভাব ঘটেছে, প্রস্থানও রয়েছে কিন্তু বাহুল্য একেবারে নেই। এই সঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার, গীতিনাট্যের পর নাট্যকাব্যে যেমন গান নেই, তেমনি সাংকেতিক নাটকে ধীরে ধীরে গানের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে নৃত্যনাট্যে তা অবশেষে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ নাটকের বক্তব্য গানের ভিতর ফুটে উঠেছে তো বটেই, তা ছাড়াও সংলাপের বক্তব্য পুনর্বার গানে রূপান্তরিত। এই বিবর্তন যেন গীতিনাট্যের দিকেই প্রত্যাবর্তন, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। কেননা, শেষ দিকে দেখব— গান সংলাপেরই ভূমিকা নিয়েছে বটে কিন্তু তা নৃত্যকেন্দ্রিক।

ইয়েট্‌সের Four Plays for the Dancers-এর ধারাটি যদি অব্যাহত থাকত তা হলে আমরা য়ুরোপীয় নৃত্যনাট্যের আর-এক

রূপ দেখতে পেতাম। আগেই য়ুরোপীয় অপেরা-প্রসঙ্গে বলেছি, ফরাসী অপেরার সঙ্গে ব্যালের নিবিড় যোগ আছে। সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ ও উপযোগিতাই ব্যালের উদ্‌ভবের কারণ, তাই য়ুরোপীয় নৃত্যনাট্য বাণীহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের পিছনে পূর্বালোচিত বিবর্তনের প্রভাব বিগুমান। কাব্যের মতোই নাটকের আঙ্গিকের পরিবর্তনও নৃত্যনাট্যের ভূমিকা রচনা করেছে। রবীন্দ্র-নাটকে গানের স্থান ও উপযোগিতা কতখানি তা সুধী-পাঠকের জানা আছে। এক কথায়, এইসব নাটকের গানগুলি[১৯] নাটকের অবিচ্ছেগু অঙ্গ। শারদোৎসব বা ফাল্গুনীর গানগুলি নাটকের কথা ভেবেই লেখা। শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর, নবীন[২০] প্রভৃতির রসরূপকল্পনায় ও পরিবেশনে গানই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ গানই স্রষ্টার রূপানুভূতি ও রসব্যগ্রতার যা কিছু আনন্দবেদনা ও ছন্দ ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে— অন্য পাত্র-পাত্রী, সূত্রধার, রাজা, পাত্র-মিত্র, অমাত্য কেউ যদি থাকেন, তাঁদের বাহুল্য বলা চলে; খুবই গৌণ তাঁদের ভূমিকা। বিশেষতঃ বসন্ত, সুন্দর বা নবীন এমন এক-একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রেরণা থেকে প্রসৃত (একই কাল-পর্বে অধিকাংশ গান লেখা; সুর ও কথা নিয়ে যৌবনে-গঠিতা পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা উর্বশীর মতোই তাদের স্বতঃ আবির্ভাব!) যে, প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি অবিচল ভাবস্থিতির আশ্রয়ে কবিচিত্তের একটি নিয়তগতি সহজভাবে অখণ্ডভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানেই তাদের বৈশিষ্ট্য (এ কথা বলাই বাহুল্য, মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্র-নাথের উল্লিখিত সৃষ্টিগুলির ঠিকমতো পরিচয় পাওয়া যাবে না। ঐগুলি পাঠোপযোগী বা পাঠের উদ্দেশে রচিত কাব্য বা নাট্য নয়)। যাই হোক, ঋতু-নাট্যের গীতি-গ্রন্থনার মধ্যে যে নাটকীয়তার

অভাব রয়েছে, শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, নৃত্যের সহযোগিতায় তার ভিতর নাটকীয়তা আনা হয়েছে। এইভাবে দেখতে পাচ্ছি, এই পর্বের নাট্যধারাও পূর্বে উল্লিখিত অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে।

এইসঙ্গে গানের আঙ্গিক ও সুরযোজনার বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ধারাটিও উল্লেখযোগ্য। আগে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছি যে মায়ার খেলার সুরারোপের মধ্যেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-গীতির মৌলিকত্ব দেখা গেল। তার পর থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত ধীরে ধীরে স্বকীয়তা লাভ করেছে। অবশ্য মধ্যবর্তী পর্বে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কোনো গানের আদর্শানুসরণের বিশেষ দৃষ্টান্ত না থাকলেও আসলে এই যুগ নানা-বিধ সুর ও গীতরূপের নানাবিধ পরীক্ষার যুগ। এই পর্বের বিশেষ লক্ষণীয় দিক হচ্ছে — তিনি তাঁর গানে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে যথেচ্ছ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির গানগুলি রাগ-রাগিণীতেই রচিত। আঙ্গিকের দিক থেকে লক্ষণীয়— চারটি তুকে ধ্রুপদীয় রীতিতে এইসব গানের অধিকাংশ রচনা করা হয়েছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বাদেশিক ভাবের প্লাবন এসেছিল, তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে বাউল সারি ইত্যাদি বাংলার লোক-সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখি। এর ফলে দেশাত্মবোধক এক জাতীয় গান পাচ্ছি— যা এইসব সুরের আশ্রয়ে রচিত। আমার নিজের বিশ্বাস, এর পর থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং এর পরই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পূর্ণ মৌলিক রূপ প্রকাশ পেল। বিজ্ঞানে বিভিন্ন উপাদানের মিলে-যাওয়াকে বলে জটিল বা যৌগিক মিশ্রণ। এই মিশ্রণের ফলে উপাদানগুলি তাদের স্বধর্ম হারায়। হারায় বটে কিন্তু তার বদলে একটি নতুন পদার্থ

পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত এ পর্যন্ত ভারতীয় রাগ-রাগিণীর আশ্রয়ে বেড়ে উঠছিল। সেইসব রাগ-রাগিণীর সঙ্গে বাংলার এইসব পল্লী-গীতির মিলনের ফলে তেমনি একজাতীয় যৌগিক স্বর-সৃষ্টি হল। বলা বাহুল্য, এর পর থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছে অর্থাৎ পরিপূর্ণ সৃষ্টির পর্যায়ে সমুত্তীর্ণ। পরবর্তী গানের ধারায় বাউল (এবং কীর্তন) গানের গূঢ়সঞ্চারী প্রভাব নিঃশব্দে সক্রিয় রয়েছে। আর এ এমন এক প্রভাব (নবজন্ম কিম্বা নব আবির্ভাবও বলা চলে)— যা ঠিক তর্কশাস্ত্রের চুলচেরা বিতর্কের মধ্যে প্রমাণ করা যাবে না। যাই হোক, এর অব্যবহিত পরেই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত ফাল্গুনীর গানে তার সুস্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়ে। এইসব গানের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৃত্যের আবেগবহুল ছন্দোময়তা। বাউল গানের সঙ্গে নৃত্য-ভঙ্গী ওতপ্রোতভাবে জড়িত, গান থেকে নৃত্যকে বাদ দেওয়া যায় না। এই নৃত্যছন্দ বাউল সুরের মধ্যেই বিরাজমান। ফাল্গুনীর পর ঋতুনাট্যের গানের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এইসব গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিত্রধর্মিতা। অর্থাৎ এইসব গানে ভাবের দিক নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তাকে আড়াল করে রূপময়তা বা দৃশ্যধর্মিতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর ঋতু-নাট্যের অঙ্গীভূত বলেই সম্ভবতঃ এইসব গানে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপটি উদ্‌ঘাটিত। এদিকে লক্ষ্য রেখেই কয়েকটি ঋতুনাট্যের গানের দৃষ্টান্ত স্মরণ করা গেল :

ক. বর্ষামঙ্গল (১৯২১)

তিমির-অবগুণ্ঠন বদন তব ঢাকি
মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর
ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের

খ. বসন্ত (১৯২৩)

বাকি আমি রাখব না
যদি তারে নাই চিনি গো
দখিন হাওয়া জাগো জাগো
সহসা ডালপালা তোর
সে কি ভাবে
ও আমার চাঁদের আলো
আজ খেলা ভাঙার খেলা
ভাঙন ধরার ছিন্ন করার রুদ্রনাটে

গ. শেষবর্ষণ (১৯২৫)

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
পথিক মেঘের দল জোটে ওই
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
একলা বসে বাদল-শেষে
দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়

ঘ. নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৭)

নৃত্যের তালে তালে
ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন
এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার

শারদোৎসবের যুগ থেকে নাটকের গানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুযোগমত নাচের আঙ্গিকে অভিনীত হত। অবশ্য তা বিশেষ

কোনো নৃত্যের ধারাকে অনুসরণ করে নয়। বসন্ত থেকে ঋতুনাট্যের গানগুলিও নৃত্যের আঙ্গিকে অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়।[২১] ১৯২৬ সালে রচিত নটীর পূজার শেষ গান 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' সম্পূর্ণভাবে নৃত্যের মাধ্যমে অভিনীত হয়েছিল; এই নাটকের অন্যান্য গানেও নৃত্যের আভাস ফুটে উঠেছিল। নৃত্যকেন্দ্রিক এই গানটি সমস্ত নাটকের কেন্দ্রীয় সুর। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে; আপাতত শুধু বলা দরকার— সর্বপ্রথম এখানেই গানের সঙ্গে নৃত্যকে একসঙ্গে সচেতনভাবে মেলাবার চেষ্টা করা হয়েছে, নৃত্যকে নতুনভাবে দেখতে পাওয়া গেল। এর আগে গানের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গী বা নৃত্যের আভাস থাকলেও এই গানটির মধ্যেই নৃত্যকে নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখতে পেলাম। অর্থাৎ গানের ক্রমবিবর্তনের শেষে দেখা যাচ্ছে— নৃত্য গানের ভূষণ হয়ে পড়েছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের আগেই কিন্তু শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চা সুরু হয়েছে। সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, সে ইতিহাস রীতিমত বিস্ময়কর। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নৃত্যেরও স্থান ছিল এবং তার মূল কথা হচ্ছে— কবি শিক্ষাকে পরিপূর্ণ আনন্দময় করতে চেয়েছিলেন।[২২]

বাস্তবিকপক্ষে গীতিনাট্যের যুগে নৃত্যের কথা ভাবা হয় নি। শুধু অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে নৃত্যের ভঙ্গিমা কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছিল মাত্র। গীতিনাট্যের গায়কীর আলোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আগেই বলেছি, শারদোৎসবের পর্ব থেকেই গানের সঙ্গে নৃত্যের আভাস ফুটে ওঠে। শান্তি-নিকেতনে নৃত্যের চর্চা সুরু হয়েছে আরো পরে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে

'বিচিত্রা'তে প্রায়ই নৃত্যের ব্যবস্থা হত। যাই হোক, এই সময় বা তারও আগে বাংলাদেশে নৃত্য বলতে যা বোঝাত তা কোনো-দিক থেকেই উন্নত রুচির ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই দেখতে পাই, বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় বাইজীনাচ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, মুখ্যতঃ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এরই পাশাপাশি এই যুগের একাধিক গীতিনাট্যে দেখা যায়—নৃত্যের তকমা এঁটে ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানীর নাচ, কালু-ভুলুর নাচ, মেথর-মেথরানীর নাচ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। ঠাকুর-পরিবারেও অন্যান্য ধনী-পরিবারের মতো বাইজী-নৃত্যের প্রচলন ছিল।[২৩] হয়তো এইসব দৃষ্টান্ত দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে নৃত্যকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত হবার পর শান্তিনিকেতনের পটভূমিকায় নৃত্যচর্চার সুযোগ পাওয়া গেল। প্রথম দিকে এই নৃত্যচর্চার স্মৃতি সত্যিই কৌতুককর। প্রতিমা দেবীর মতে রবীন্দ্রনাথ কোনো-একটা উপলক্ষে ত্রিপুরা যান; সেখানে যে নৃত্য দেখেন তাতেই কবি সর্বপ্রথম নৃত্যচর্চার সম্ভাবনা ও সার্থকতা খুঁজে পান। বলা বাহুল্য, এ নৃত্য তৎকালীন বাংলা দেশের খোলা পথের খোলা মঞ্চের নৃত্যধারা নয়। অতঃপর শান্তি-নিকেতনে লোকচক্ষুর আড়ালে এই নৃত্যচর্চা এগিয়ে গিয়েছে। যদি বলি এই অনুশীলনের সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত নৃত্যধারার কোনো যোগ ছিল না তা হলে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

শান্তিনিকেতনে প্রথম নৃত্যচর্চা সুরু হয় মেয়েদের দিয়ে নয়, ছেলেদের দিয়ে। ছেলেদের কাছে তখন তা ছিল একাধারে শরীরচর্চা ও নৃত্য! সাধারণতঃ দেখা যায়—শিল্পের সম্পূর্ণ রূপটি দেখতেই আমরা অভ্যস্ত; প্রস্তুতি-পর্বের গুরুত্ব দিই না। শান্তি-নিকেতনের নৃত্যচর্চাও কিভাবে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে

পরিণতিতে পৌঁচেছে তা না জানলে তার স্বরূপ বোঝা যাবে না। এই নৃত্যচর্চার প্রথম দিকে অনুশীলনের সময় চারি দিকে একটা গণ্ডীর মতো সীমানা তৈরী করা হত, যাতে শিক্ষার্থীরা তার বাইরে চলে না যান। তা ছাড়া, যাতে কুঁজো হয়ে না পড়ে, দেহ যাতে সোজা থাকে, তার জন্য পিঠের সঙ্গে কাঠি বেঁধে খাড়া রাখবার চেষ্টা করা হত।[২৪] সে এক রীতিমত প্রাণান্তকর প্রয়াস! বুদ্ধিমন্তের যুগে এই ব্যবস্থা ছিল! সহজেই অনুমান করা যায়— এর আসল কথা হচ্ছে চেষ্টা করে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানো, নৃত্য সম্বন্ধে তখনো তেমন অনুকূল মনোভাব ছিল না। এর পর ধীরে ধীরে পরিবেশ বদলাতে থাকে। মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে এই নৃত্যচর্চায় ব্রতী হতে থাকেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মেয়েদের নাচের চর্চা সুরু হয়েছিল কাথিয়াবাড় ও গুজরাটের লোকনৃত্যের আদর্শে। এই সময় বিশেষ বিশেষ আদর্শের নৃত্যপদ্ধতিতে খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে নৃত্য রচিত হয় বা কোনো বিশেষ নৃত্যের উপলক্ষে গান রচিত হয় কিংবা কোনো বিশেষ গানকে নৃত্যরূপ দেওয়া হয়। দু-একটি গান স্মরণীয়— যেমন 'মোর বীণা উঠে', 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে' ইত্যাদি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেছেন যে 'শেষবর্ষণ'এর কয়েকটি গান মেয়েরা নৃত্যে অভিনয় করেছিলেন। অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার, গীতিবহুল এইসব ঋতুনাট্যে নৃত্য যে ভাবে স্থান পেল তার মধ্যে নাটকীয়তা প্রকাশের কোনো অবকাশ বা প্রয়াস ছিল না। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় শুনেছি— নিছক গানের সঙ্গে নাটক জমানো যেত না বলেই আরো বেশী তাকে আকর্ষণীয় করবার জন্যই নৃত্য সংযোজন করা হত। নৃত্যকে নাটকীয়তার কাজে লাগাবার প্রয়াস আরো পরবর্তীকালের ঘটনা। 'নটীর পূজা'য় নৃত্যকে শুধু প্রক্ষিপ্তরূপেই

নয়, নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রথম দেখা গেল। শ্রীমতী নটী; তারই পূজা— নটীর পূজা। তার দেহমন বুদ্ধের চরণে নিবেদিত। নৃত্য সেই পূজার্চনার উপকরণ ও উপজীব্য। নাটকের শেষ মুহূর্তে তাকে নাচবার আদেশ দেওয়া হল। শ্রীমতী বুঝল— যে সাধনা তার জীবনের পরম ঐশ্বর্য, সেই অর্ঘ্যেই বুদ্ধের বেদীর সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে। সংকোচ রইল না। সব আভরণ আবরণ খসিয়ে দিয়ে সেই নৃত্যের অঞ্জলিতেই তার কৃত্য শেষ করল। নটীর সজ্জা ও প্রসাধন ঘুচে গিয়ে বেরিয়ে এল ভিক্ষুণীর স্বরূপ। কাজেই ভাবের দিক থেকে যেমন-আঙ্গিক বা শিল্পকৌশলের দিক থেকেও এই নাচটি সমস্ত নাটকের সঙ্গে বাগর্থের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয় কি? তাই বলছি— এখানেই নৃত্যকে সর্বপ্রথম নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-রূপে দেখা গেল।

এই সময় বাংলাদেশের (কলকাতার?) সমাজে কবির এই নৃত্যচর্চার প্রয়াস যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কবিগুরুর ভাগ্যে অনেক বিরূপ মন্তব্যের শাস্তিলাভ ঘটেছে। কিন্তু এই নৃত্যচর্চাকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন দেখা দিল, তার প্রতিক্রিয়ার কিছু নমুনা স্মরণযোগ্য :[২৫]

ক. যাঁহারা তোমাদের মাতৃস্থানীয়া, যাঁহারা তোমাদের ভগ্নী-স্বরূপা তাঁহারা নৃত্যাভিনয় করিতে আসিয়াছেন, তোমরা লজ্জায় মস্তক অবনত কর, ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত কর— ক্ষোভে দুঃখে বক্ষে করাঘাত কর। তোমাদের যদি অর্থ থাকে তবে তাহা বন্দীর ধন-ভাণ্ডারে দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। আর পাপের প্রশ্রয় দিও না।

খ. কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গৃহে নাট্যাভিনয়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কন্যাকে নাচাইয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন।··· নারীর নৃত্য দ্বারা

অর্থ সংগ্রহের পথ তিনিই প্রথম দেখাইয়া দিলেন এবং বিলাসী সমাজ বুঝিল যে নারীকে নাচাইলে ও তাহার দ্বারা নাটক অভিনয় করাইলে অধিক অর্থ উপার্জন হয়।··· নারীর শালীনতা ও পবিত্রতাকে সঞ্জীবনী কতটা উচ্চে স্থান দিয়াছে এবং তাহারই জন্য প্রতিবাদ করিয়া সঞ্জীবনী বলিয়াছিল, এইরূপে অর্থ উপার্জন করা অপেক্ষা বিশ্বভারতী ও সঙ্গীত বিদ্যালয় রসাতলে যাউক।

গ. শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিলাস বাসনা এখনো 'সবুজ' রহিয়াছে। শুনা যায়, তিনি বিশ্বভারতীতে নারীর নৃত্যের ক্লাস খুলিয়াছেন।··· তিনি সরলচিত্ত সংসারানভিজ্ঞ বালিকাগণকে একি শিক্ষা দিতেছেন।

বস্তুতঃ, যে-কোনো দিক থেকেই 'নটীর পূজার' নৃত্যটি তাৎপর্যময়। নৃত্যকে শুধু উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করাই নয়, নাটকের আঙ্গিকে নৃত্যকে অনুপ্রবিষ্ট করার চেতনা এখানে খুবই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এই নৃত্যটি সমগ্র নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নাটকীয় ঐক্য রক্ষা করেছে। মূল নৃত্যনাট্যের চেতনা এখানে অনুপস্থিত। তবু 'নৃত্যরসে' কবির চিত্ত এখান থেকেই সে দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বলা যায়।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে নৃত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়ে উঠেন। তার পিছনে রয়েছে কয়েকটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে এইসব ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ছ-বছর কবি জাপান, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ইত্যাদি নানা দেশ ভ্রমণ করলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল 'আত্সুতা মারু' জাহাজে হংকং পৌছলেন। ২৯শে মে 'সাংহাই মারু' জাহাজ যোগে জাপান যাত্রা করলেন। জাপানে কবির মনে নৃত্য সম্বন্ধে নিবিড় আগ্রহ ও অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এই ভ্রমণ সম্পর্কে

তৎকালীন পত্রিকা ও রাজনৈতিক মহলে যে প্রতিক্রিয়া ও আলোচনা হয়, তা মূলতঃ রাজনীতিকেন্দ্রিক। কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে কবির জীবনে এই ভ্রমণ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা আজও আলোচিত হয়নি। এই সময়ের কবিমনের পরিচয় রয়েছে 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে। তারই কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ স্মরণযোগ্য :

ক. সমুদ্র হচ্ছে নৃত্যলোক আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দলোক।

খ. আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে থাকি বলেই আকাশের দিকে তাকাই নে, আকাশের দিক্-বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ওই আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকতে হয় তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহৈতুক বিলাস। এ যেন গানের আলাপের মতো, রূপরঙের রাগ-রাগিণীর আলাপ চলছে, তাল নেই, আকার আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেই সঙ্গে সমুদ্রের অপ্সর নৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমনি বিপুল যে তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

গ. কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে আমাকে এদেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

ঘ. একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গীর সংগীত। এ সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ।

অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গি-বৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিংবা কোথাও একসঙ্গে তুলতে তুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ, তার মধ্যে লম্ফঝম্ফ, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি ছোঁড়া আছে। জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যে লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্যদেশের নাচ দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ইশারা মাত্র দেখা গেল না।

৬. বাংলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কত বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র সৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে··· তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এইসব উদ্‌ধৃতির দিকে গভীর মনোনিবেশ করলেই উপলব্ধি করা যায় নৃত্য সম্বন্ধে কবি নতুন করে ভাবছেন, তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে ছন্দোময়তার চিন্তা। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যেও 'নৃত্য' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন। মনে হয়, এর মধ্যে কবিমনের যে ভাবানুষঙ্গ জড়িত, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী নৃত্যচর্চার ইতিহাসটি অদৃশ্যসূত্রে গ্রথিত। অর্থাৎ কবির মনে নৃত্য-চেতনা এতই প্রাধান্য পেয়েছে যে স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্যেও তার প্রকাশ ঘটেছে।

কিন্তু কবি কোন্ জাপানী নাচের কথা বলতে চেয়েছেন? জাপানে নাট্যকলার দুটি বিভাগ নৃত্যকেন্দ্রিক— নো (Noh)

এবং কাবুকী (Kabuki)। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, Giga Ku, Buga Ku এবং Saga Ku মূকনৃত্য পূর্ব-প্রাচ্য থেকেই এসেছিল।[২৬] এগুলি ধীরে ধীরে সম্মিলিত হয়ে জাপানী নাট্য-কলায় স্থিতিলাভ করেছে। যদিও জন্মসূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ রয়েছে, তথাপি জাপানী শিল্পকলা আপন স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। Bunra Ku পুতুল নৃত্য বা Noh নাট্যের মধ্যে বেশ শিল্পা-ভিজাত্য দেখতে পাওয়া যায়। নো-নাটক মূলতঃ রূপক বা প্রতীক-ধর্মী। মুখোস ব্যবহারের ভিতর দিয়ে অভিনেতার ব্যক্তিসত্তা ঢেকে দেওয়া হয়, তেমনি সহজেই একই ব্যক্তির পক্ষে নানা ভূমিকার মুখোস পরিবর্তন করে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হয়। নো-নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধীর গতি এবং নির্দিষ্ট কিছু ভঙ্গী।[২৭] আবার অন্যদিকে মুদ্রাপ্রধান না হলেও ভারতীয় কথাকলির সঙ্গে সঙ্কেত-ধর্মিতার দিক থেকে বেশ মিল রয়েছে। কয়েকটি মাত্র পদক্ষেপ যাত্রাশেষ নির্দেশ করে; হাঁটুতে আঘাত করার মধ্যে দিয়ে অভি-নেতার উত্তেজনা প্রকাশ পায়। এই কলাশৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে যথার্থ রসোপলব্ধি সম্ভবপর নয়,[২৮] যেমন কথাকলির মুদ্রার অর্থ না বুঝলে নৃত্যের আসল অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটে। রঙ্গমঞ্চ মন্দিরের সংলগ্ন ছিল। বর্তমানে স্থানান্তর ঘটলেও মন্দিরের কাঠামো বজায় রাখা হয়। এই মঞ্চকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—মঞ্চ ও দর্শকের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান থাকে না বলে অভিনেতার সঙ্গে দর্শক একাত্মতাবোধ করেন। মুখোস-ব্যাপারের সুবিধে হচ্ছে, একজন অভিনেতা প্রথমে সাধুরূপে অবতীর্ণ হবার পর, মঞ্চের বাইরে গিয়ে পুনর্বার মুখোস বদলে দৈত্যের বেশে পুনরায় প্রবেশ করতে পারেন। সাধারণতঃ নো-নাটকে দুজন প্রধান অভিনেতা থাকেন; দ্বিতীয় অভিনেতা কোনো মুখোস ব্যবহার করেন না, তবে

দর্শকের মতো অপরের গতিভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রাখেন। এইভাবে অভিনেতাদের ভূমিকা ও যাতায়াতের সীমানা নির্দিষ্ট থাকে। সবটুকুর মধ্যে বেশ একটা ঘরোয়া অথচ আভিজাত্যের ভাব ফুটে ওঠে। সম্ভবতঃ নো-নাটকের এই বৈশিষ্ট্যই ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌স্‌কে আকৃষ্ট করেছিল।

কাবুকী নৃত্যনাট্যের স্থান জাপানী নাট্য-ইতিহাসে তৃতীয়। Bunra Ku-র প্রায় একশো বছর পরে এর উদ্ভব। কাবুকী আসলে নো-নাট্যকলারই আর-এক পরিণতি। সঙ্গীত নৃত্য ও নাট্যের সম্মিলিত রূপায়ণই কাবুকী নৃত্যনাট্যের মূলকথা।[২৯] মঞ্চকলার দিক থেকেও নো-মঞ্চকলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, তবে কাবুকীর পরিধি আরো বিস্তৃত। নো-র মতো কাবুকীতে মুখোসের ব্যবহার নেই। কিন্তু কথাকলির মতো অভিনেতা মুখ চিত্রিত করেন। বাস্তবিকপক্ষে কাবুকী নৃত্যনাট্যই জাপানী সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ নো-নাটক বা কাবুকী নৃত্যনাট্যই দেখেছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত ঘ-সংখ্যক উদ্‌ধৃতির মধ্যে তিনি যে নৃত্যের কথা বলেছেন, হয়তো বা এই কাবুকী নৃত্যনাট্য দেখেই ঐ মন্তব্য করেছেন।

যাই হোক, জাপান-ভ্রমণের স্মৃতি ম্লান হতে-না-হতেই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসে তিনি বৃহত্তর ভারতে বা দ্বীপময় ভারতে জাভা-বলী দ্বীপ ভ্রমণে বের হলেন। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' এই বিবরণ লিপিবদ্ধ। এই ভ্রমণেরও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্মৃতি ও প্রতিক্রিয়া নৃত্যানুরাগ। কবি লক্ষ্য করেন জাভা ও বলীর সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে। সেখানকার নাট্যাভিনয়ে রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ স্থান আছে। নৃত্য এঁদের জীবনের সঙ্গে যে কতখানি জড়িত, সেকথা কবি নানাভাবে

উল্লেখ করেছেন। তবু এ-সবের মধ্যেও জাপানের স্মৃতি মিলিয়ে যায় নি :

"জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেছি ; তাতে কথা আছে বটে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গী চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরণে ; বড়ো আশ্চর্য তার শক্তি। নাটকে আমরা যখন ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি তখন সেই সঙ্গে চলাফেরা হাবভাব যদি সহজ রকমেরই রেখে দেওয়া হয় তা হলে সেটা অসঙ্গত হয়ে ওঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামেতেই প্রমাণ পায়, আমাদের দেশে একদিন অভিনয়ের প্রধান অঙ্গই ছিল নাচ।"

কবি আরো বলেছেন, প্রত্যেক দেশ বিশেষ-বিশেষ উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে। এদের সেই প্রকাশের উপায় হচ্ছে নাচ। জাভা-বলী দ্বীপের নৃত্যনাট্য প্রায় কথাকলির মতোই। তা ছাড়া, জাপানী মুখোস-নৃত্যের মতো জাভাতেও একধরণের নৃত্য রয়েছে। জাভাতে যা কিছু দেখছেন, তার মধ্যেই নৃত্য-চেতনা ফুটে উঠছে। যেমন :

"কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল, তাও প্রধানতই নাচ অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে, এদেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয়, নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাচ। কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত কখনো প্রবল কখনও মৃদু, এই সঙ্গীতটাও সঙ্গীতের জন্যে নয়, কোনো একটা কাহিনীকে নৃত্যছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।"

জাভা-বলীর নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় কোনো নৃত্যনাট্যের যোগ নেই, বরং চীন কিংবা জাপানী নৃত্যনাট্যের সঙ্গে

সাদৃশ্য চোখে পড়ে।[৩০] জাভানী নৃত্যধারার আরো কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখযোগ্য— যেমন, ছায়ানৃত্য, নারীনৃত্য শিমম্প্রী, লেগং,. কবিয়ার, ইত্যাদি। এক কথায় বলা চলে, নৃত্যই হচ্ছে জাভা-বলীর সংস্কৃতির সার্থক দৃষ্টান্ত।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কবি য়ুরোপ-ভ্রমণে যান। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবী। ইংলণ্ডে থাকার সময় ডার্টিংটন হলে তাঁরা ব্যালে দেখলেন; ব্যালে-র রচনাকৌশল দেখবারও সুযোগ হল। জাভা-বলীর ভ্রমণের পর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এর পরেই প্রত্যক্ষভাবে নৃত্যনাট্যের সূচনা দেখা যাচ্ছে। নটীর পূজায় নৃত্যকে নাটকের অঙ্গীভূত করা হলেও তা ছিল একক অংশ মাত্র। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'নটরাজ' নামকরণ ও নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে কবির নৃত্যচেতনা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আগে যেসব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি— তার থেকে সহজেই বোঝা যাবে নাট্যকলার মধ্যে নৃত্যের স্থান কিভাবে হতে পারে, কবি সে বিষয়ে ভাবছেন। ঠিক এই সময়ে রচিত 'নৃত্যের তালে তালে' গানটি এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বীপময় ভারত-ভ্রমণ থেকে ফেরার পর ৮ই ডিসেম্বর কলকাতায় 'ঋতুরঙ্গে'র অভিনয় হল। কেউ কেউ বলেছেন যে, তার মধ্যে জাভানী রীতির প্রভাব পড়েছে।[৩১]

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রচলিত ধারণা এই যে, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের পিছনে জাভা-বলীর প্রভাব রয়েছে। এই মতবাদ কতদূর গ্রহণযোগ্য? নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন আদর্শ রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে ছিল। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তেই আসেন যে, নৃত্যকেও নাটকীয়ভাবে গ'ড়ে তোলা যায়। জাভানী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যালের নৃত্য-পদ্ধতির মতো জাভার নৃত্য-

পদ্ধতিও যন্ত্রসঙ্গীতের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৃত্যনাট্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীও 'বাণীহীন নৃত্যের সঙ্গে বাণীর যোগের' পার্থক্যটুকু উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয়— রবীন্দ্রনাথের নৃত্যধারা যন্ত্রসঙ্গীতের উপর নির্ভরশীল নয়, নবভাবে বিবর্তিত রবীন্দ্র-সঙ্গীতই তার ধারক। গানের সঙ্গে দুটি উপায়ে নৃত্য রচিত হত। প্রথমতঃ, গানের সম্পূর্ণ অংশকে তার ভাবটিকে নৃত্যের অভিনয়ে বা আঙ্গিকে প্রকাশ করা; দ্বিতীয়তঃ, গানের পংক্তির সঙ্গে নৃত্যকে অলংকার রূপে ব্যবহার করা।[৩২] কাজেই প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল নৃত্য যেন গানের ভাব ও রসকে প্রকাশ করে। এই সূত্রেই আরো একটা কথা স্মরণীয়, যে রীতিতেই নৃত্য রচিত হোক না কেন, মূলতঃ তা ভারতীয় নৃত্যধারার আদর্শই অনুসরণ করেছে। হয়তো বহির্ভারতীয় নৃত্যধারার প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে পড়ে থাকবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নৃত্যধারা ভারতীয় নৃত্যধারারই ঐতিহ্য বহন করছে।

ইতিমধ্যে চিত্রাঙ্কনেও কবির সিদ্ধিলাভের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়াতে তাঁর এক চিত্র-প্রদর্শনী হয়। এই চিত্র-সংকলনের মধ্যে কয়েকটি নৃত্যের চিত্রও স্থান পায়। য়ুরোপ ভ্রমণ করে কবি যখন দেশে ফিরলেন তার কিছুকাল পরেই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রচিত হল শিশুতীর্থ ও শাপমোচন। এতদিন যা ছিল নীহারিকারূপে, এবার তা দানা বাঁধল, নির্দিষ্ট রূপ নিল। গীতি-নাট্যের পর এইভাবে নানা সমীক্ষা ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে কবি নৃত্যনাট্যের পর্বে পৌঁছলেন।

নৃত্যনাট্যের খসড়া : শিশুতীর্থ ও শাপমোচন

য়ুরোপ-ভ্রমণকালে জার্মানীর চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী উফা কোম্পানীর

অনুরোধে কবি Child নামে যে কথিকা লেখেন, শিশুতীর্থ তারই বাংলা রূপান্তর। এর পাশাপাশি পুনশ্চর শিশুতীর্থ কবিতাটিও স্মরণীয়। কথিকা বা কাব্যরূপকে নাটকের আঙ্গিকে যেভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ অংশটুকু তুলে দেওয়া গেল :

প্রথম সর্গ। অন্ধকার, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভয়, লোভ, ক্রোধ, উন্মাদের অট্টহাস্য।

দ্বিতীয় সর্গ। ভক্ত অরুণোদয়ের অপেক্ষা করে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। বলছেন, ভয় নেই, মানবের মহিমা প্রকাশ পাবে।

গান॥ কী ভয় অভয়ধামে তুমি মহারাজা।

সংশয়াচ্ছন্ন বিভ্রান্তচিত্তের দল তাকে বিশ্বাস করে না। বলে, পশু-শক্তিই আদ্যাশক্তি, রক্তপঙ্কের মধ্যে পরিণামে সেই শক্তিরই জয় হবে।

তৃতীয় সর্গ। প্রভাতের আলো দেখা দিল। ভক্ত বললেন, চলো সার্থকতার তীর্থে। তার অর্থ স্পষ্ট করে কেউ বুঝলে না, কিন্তু পারলে না স্থির থাকতে। কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি জেগে উঠল— চলো।

গান॥ আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

চতুর্থ সর্গ। যাত্রীরা দেশ দেশান্তর থেকে বেরিয়েচে, নানা জাতি নানা বেশে, নানা পথ দিয়ে, সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী।

গান॥ কে যায় অমৃতধামযাত্রী।

পঞ্চম সর্গ। তাদের ক্লান্তি তাদের সংশয়।

ষষ্ঠ সর্গ। জ্ব'লে উঠল তাদের ক্রোধ।

গান॥ যেতে যেতে একলা পথে।

বললে, মিথ্যাবাদী আমাদের বঞ্চনা করেচে। ভক্তকে মারতে মারতে মেরে ফেললে।

গান ॥ মোর মরণে হবে তোমার জয়।

সপ্তম সর্গ। তাদের ভয়, তাদের অনুতাপ, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ! প্রশ্ন এই এখন তাদের পথ দেখাবে কে? পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, যাকে মেরেচি তার প্রাণ আমাদের সকলকে প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে আমাদের পথ দেখাবে। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, জয় মৃত্যুঞ্জয়ের।

গান ॥ হবে জয় রে ওহে বীর, হে নির্ভয়।

অষ্টম সর্গ। আবার সকলে যাত্রা করলে।

গান ॥ আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে।

ক্লান্তি নেই, সংশয় নেই। বললে, আমরা জয় করব ইহলোক, আমরা জয় করব লোকান্তর।

নবম সর্গ। কালজ্ঞ বললেন, আমরা এসেচি। কিন্তু প্রসাদ কই, সোনার খনি কই, শক্তিমন্ত্রের পুঁথি কই? পথের ধারে উৎস। উৎসের পাশে কুটির। কুটিরের দ্বারে বসে অজানা সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলচে, মাতা দ্বার খোলো।

গান ॥ ভোর হল বিভাবরী (সকলের উপবেশন)

(ধীরে ধীরে উত্থান)

গান। তিমির দুয়ার খোলো

দশম সর্গ। মা বসে তৃণ শয্যায়, কোলে তাঁর শিশু— অন্ধকারের পরপার থেকে প্রকাশমান শুকতারার মতো। কবি গেয়ে উঠলো, জয় হোক মানুষের, জয় হোক নব জাতকের, জয় হোক চির জীবিতের।

যাত্রীরা প্রণাম করলে, দেশ-দেশান্তরের কণ্ঠে ধ্বনিত হল সেই জয় গান, যুগে যুগান্তরে তা ব্যাপ্ত হল।

গান ॥ জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়।

শিশুতীর্থের এই দশটি সর্গ বা দৃশ্য ছাড়া একটি সূচনা বা উদ্‌বোধন অংশ রয়েছে, যাতে অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রকাশিত। সেই সঙ্গে প্রথম সর্গের আগে একটি গান — 'নমঃ নমঃ নির্দয় অতি করুণা তোমার।' এই হচ্ছে শিশুতীর্থের নাট্যরূপায়ণ।

শিশুতীর্থের আঙ্গিকের স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবেই সাংকেতিক। কাহিনী একটা রয়েছে কিন্তু তা ব্যঞ্জনাপ্রধান বা প্রতীকী। অবশ্য অন্য সাংকেতিক নাটকেরও এই বৈশিষ্ট্য আছে, তবে সেখানে পাত্র-পাত্রীর একটা পরিচয় আছে; এখানে তা সম্পূর্ণভাবেই নৈর্ব্যক্তিক। দ্বিতীয়তঃ, দৃশ্য সন্নিবেশ বা গ্রন্থনার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, আসলে এখানে ব্যালের আদর্শই সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত। অবশ্য একক প্রযোজনার বদলে ব্যালের পিছনে থাকে যৌথ প্রযত্ন।[৩৩] এই রচনা-পদ্ধতির মূল কথা হল বিষয়বস্তুটি প্রথমে বিভিন্ন দৃশ্যে সাজিয়ে নেওয়া হয়। তার পর দৃশ্যানুযায়ী অর্থাৎ তার ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে নৃত্য সঙ্গীত বা দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পিত হয়। পরিচালকের দায়িত্ব থাকে এগুলিকে একসঙ্গে মেলাবার। শিশুতীর্থ বাস্তবিকপক্ষে এই ব্যালে পদ্ধতিতেই যে রচিত, তা শ্রীশান্তিদেব ঘোষও উল্লেখ করেছেন। তাই হয়তো একথা বলা যায় যে, এর পিছনে য়ুরোপীয় প্রভাব বিদ্যমান। গীতিনাট্যে যেমন য়ুরোপীয় অপেরার প্রভাব রয়েছে, শিশুতীর্থের মধ্যেও তেমনি ব্যালের প্রভাব রয়েছে। শ্রীমতী ঠাকুর (যিনি য়ুরোপীয় নৃত্যপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতা ছিলেন)। একা ইম্‌প্রেশনিষ্ট (Impressionist) নৃত্যের আঙ্গিকে বা 'আঙ্গিক-কথকতা'য় দৃশ্যগুলি অভিনয় করেন।[৩৪] প্রতিটি সর্গের বা দৃশ্যের অন্তর্গত যেসব গান রয়েছে, সেগুলিও নৃত্যে রূপায়িত হয় স্বতন্ত্র ভাবে। গদ্য অংশ পিছন থেকে পাঠ করা হয়েছিল।

নৃত্যের সাহায্য ছাড়া শিশুতীর্থকে রূপ দেওয়া চলে না। কিন্তু এখানে নৃত্যের উপযোগিতা কতখানি? দৃশ্য বা সর্গগুলি যেভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে, কিন্তু আসলে এই আঙ্গিক কথিকাধর্মী। বিভিন্ন দৃশ্যের ভাব বা বর্ণনাগুলিই নৃত্যে রূপ দেওয়া হয়েছে। য়ুরোপীয় ব্যালে-পদ্ধতিতেও অবশ্য শিশুতীর্থকে আরো বৃহত্তর রূপে রূপায়িত করা চলে। তা ছাড়া সম্পূর্ণভাবে গানের উপর রচিত নয় বলে এবং মূলতঃ ভাবধর্মী বলে সহজেই দৃশ্যগুলির গ্রন্থনায় ঐ কলাশৈলী ব্যবহার করে সার্থক ফল পাওয়া যেতে পারে। ব্যালের নৃত্যে মূক আঙ্গিকাভিনয়ের প্রাধান্য থাকার ফলে সংলাপমূলক কোনো দৃশ্য ছাড়া, যে কোনো ভাব বা বিষয়কে সহজেই রূপ দেওয়া যায়। নৃত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় নৃত্য মূলতঃ প্রতীকধর্মী। ব্যালে-নৃত্য ঠিক ততটা সাংকেতিক নয় একদিক থেকে, কেননা বিশেষ বিশেষ ভাবের উপযোগী ভঙ্গীই নৃত্যের রূপ নেয়। এইজন্যেই ব্যালে-প্রথায় শিশুতীর্থকে রূপ দেওয়া যায়। অন্যদিকে আবার সম্পূর্ণভাবে ব্যালেও বলা যায় না, কেননা ব্যালে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্র-সঙ্গীতের উপর রচিত এবং নাটকীয় যা কিছু অভিব্যক্তি তা যন্ত্রসঙ্গীতের ভিতর দিয়েই ফুটে ওঠে। বিশেষতঃ, কথিকার মতো কোনো রীতির স্থান নেই। বাস্তবিকপক্ষে তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ শিশুতীর্থের মধ্যে নৃত্যনাট্যের প্রাথমিক পরীক্ষা করেছেন অর্থাৎ শিশুতীর্থকে নৃত্যনাট্যের ভ্রূণ অবস্থা বলা যায়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, শিশুতীর্থের গানগুলি[৩৫] নৃত্যের কথা ভেবে লেখা নয়। এই গানগুলি যেন সূত্রধারের মতো এক একটি প্রসঙ্গের সূচনা করেছে বা ঘটনা ও ভাবের বিবর্তনের ইঙ্গিত করেছে অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়েই গানগুলি ব্যবহৃত।

বাস্তবিকপক্ষে শিশুতীর্থ মানব-ইতিহাসের সাংকেতিক কথন, বহু শতাব্দ নিয়ে তার কালগণনা, বহু জাতি ব্যক্তি ঘটনা ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের অগ্রগতি। এত বিশাল দেশকাল জোড়া এত মানুষের জীবননাট্যের রূপায়ণ এল প্রধানত একটি নটীর নৃত্যে (সঙ্গে সঙ্গে কথাবস্তু আবৃত্তি করা হয়েছিল) অর্থাৎ একজনের আঙ্গিক কথকতার দ্বারা (নৃত্যের মাধ্যমে, নৃত্ত নয় !) সমস্তটার রূপায়ণ।

এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রকাশিত। তার মূলকথা হচ্ছে মানবপ্রেম। সম্ভবতঃ হিংসা-উন্মত্ত পৃথিবীর ছবি কবির কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মানুষকে তাই তিনি তা থেকে দূরে সরিয়ে মহাজীবনের পথে ডাক দিয়েছেন।

শাপমোচন (ডিসেম্বর ১৯৩১) শিশুতীর্থের আঙ্গিকের ক্রমোত্তরণ, প্রায় অনুরূপ প্রথাতেই রচিত তবে আরো নাটকীয়। 'নাচের মধ্যে নাটকের বিষয়'[৩৬] আনার চেষ্টা স্পষ্টতর। শিশুতীর্থের মতোই শাপমোচনও সচেতনভাবে নৃত্যে রূপ দেবার জন্যই বা নৃত্যাভিনয়ের জন্যই লেখা। নৃত্যের সাহায্য ছাড়া এর রূপায়ণ সম্ভব নয়

শাপমোচনকে নৃত্যনাট্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ধারণার যাথার্থ্য বিচার করা দরকার। ভূমিকায় বলা হয়েছে— 'যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।' লক্ষণীয়, কবি নিজে বলেছেন 'কথিকা'। শিশুতীর্থও তাই।

শাপমোচনও কথিকা। তবে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য বিষয়বস্তু ও গানের দিক থেকে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন যে, শেষজীবনে রবীন্দ্র-প্রতিভার বাহন হয়ে উঠেছে

সঙ্গীত।[৩৭] একথা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। সঙ্গীত ছাড়াও নটীর পূজার (১৯২৬) পর থেকেই নৃত্যও অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছে। এবং শিশুতীর্থের পর থেকে যেমন নৃত্যের প্রাধান্য চোখে পড়ে তেমনি এও সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, শিশুতীর্থ পর্যন্ত গানের জন্য নৃত্যের অবতারণা, নৃত্য গানের অনুষঙ্গী হয়েছে মাত্র, কিন্তু এর পর থেকে (মূলতঃ) নৃত্যের জন্যই গান এসেছে। শাপমোচনের গীতিরূপের এইটেই মূল কথা।

প্রথমে যেভাবে শাপমোচন রচিত হয় তাতে কোনো দৃশ্য বিভাগ ছিল না। এর বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে গদ্য, যার উদ্দেশ্য কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্র-পাঠকের হয়তো জানা আছে যে, শাপমোচন নানা উপলক্ষ্যে একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল এবং প্রায় প্রত্যেকবারই কোনো-না-কোনো রূপান্তর ঘটেছিল।[৩৮] নৃত্য এবং গান— দু'দিক থেকেই রূপান্তর ঘটত। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে সর্বশেষ যে অভিনয় (পৌষ ১৩৪৭) হয়, তাতে দেখা যায় পাঁচটি দৃশ্যে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতি দৃশ্যের গানগুলি উল্লিখিত।[৩৯]

শিশুতীর্থে লক্ষ্য করেছি কয়েকটি ভাবকে গ্রথিত করে এক একটি দৃশ্য রচিত। শাপমোচনের দৃশ্যগুলি ভাবপ্রধান নয়, নানা ঘটনার সমাবেশে রচিত। ইন্দ্রসভা, মর্ত্যদৃশ্য, জনতা চলেছে, তলোয়ার হাতে, রাজা চলেছেন— এই ধরণের ঘটনাবহুল দৃশ্য-সমাবেশ করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এখানেও ব্যালের প্রভাব রয়েছে। নৃত্যের আঙ্গিকে মণিপুরী কথাকলি এমনকি য়ুরোপীয় নৃত্যধারার প্রভাব পড়েছিল। তা ছাড়া গানের মাঝে মাঝে নিছক তালের নৃত্যও ছিল মণিপুরী আদর্শে। এই রীতি পরবর্তী নৃত্যনাট্য-গুলিতে আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি।

গীত-সমাবেশের দিক থেকে বলা যায়, এই গানগুলির উপযোগিতা দৃশ্যের সূত্র ধারণে বা মর্মোদ্ঘাটনের মধ্যেই সীমিত নয়। গানগুলির পরস্পরের মধ্যে একটি ঐক্য রয়েছে এবং নাটকীয়তাও ফুটে উঠেছে। কিছু গান যেমন ভাবানুযায়ী সংকলিত, তেমনি একাধিক গান[৪০] বিশেষভাবে এই উপলক্ষে রচিত। স্পষ্টতঃ না হলেও সংলাপের ধর্ম কয়েকটি গানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন :

১. কখন দিলে পরায়ে

২. আমি এলেম তোমার দ্বারে

৩. রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার

৪. দে পড়ে দে আমায় তোরা

৫. এসো আমার ঘরে

৬. না, যেয়ো নাকো, যেয়ো নাকো

৭. সখী, আঁধারে একেলা, ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নীচের কথা অংশগুলিও সুরারোপিত হয়েছিল :

রাজা

অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্ত্যের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।

রাজা

একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে, তোমার আপন দাক্ষিণ্যে রসের দাক্ষিণ্যে।

রাণী

তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে, তাহার অর্থ বুঝিনে। ওই শোনো, ওই শোনো উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে॥

বিশেষভাবে কেন যে এই কথা-অংশগুলিতে সুরারোপ করা হয়েছিল তা বলা কঠিন। কিন্তু এর মধ্যে একটা নতুন আলো দেখা যাচ্ছে। কথকতায় বা কীর্তনের আখরে সুর থাকে। এই জাতীয় গদ্য বা কথা অংশে সুরারোপের রীতি বাংলার গীতিকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শাপমোচনের এই কথা-অংশে সম্ভবতঃ তারই প্রভাব পড়ে থাকবে। শুধু তাই নয়— রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও লক্ষ্য করা গেল। বোধ হয় পরবর্তীকালে চণ্ডালিকার গানে এর প্রেরণা রয়েছে। 'লিপিকা'-র অংশবিশেষকে রবীন্দ্রনাথ সুরারোপিত করবার কথা ভেবেছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আঙ্গিকগত ক্রমবিকাশের দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুতঃ, শিশুতীর্থ ও শাপমোচনের তুলনা করলেই দেখা যাবে, কতকটা সূত্রধার কৃত্যে, কতকটা গল্পের বইয়ে যেমন ছবি থাকে তেমনি গান (ও যন্ত্রসঙ্গীত) এবং নৃত্য— উভয়কেই ধরে রেখে শিশুতীর্থ আখ্যায়িকা বা কথন মাত্র, নাট্য হয়ে ওঠে নি। শাপ-মোচনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— একজনের 'আঙ্গিক কথকতা'য় আর হয়ে উঠল না, কয়েকজন নটনটীর অবতারণ হলো রঙ্গমঞ্চে। এতেও কথকতা একেবারে বর্জিত নয়, সব গানগুলি এর জন্যই রচিত হয় নি। অর্থাৎ মনে হয়, (প্রকরণ বিচারের দ্বারা 'মনে হওয়াটা

প্রমাণ করা সঙ্গত) কবিতা, কথকতা এমনকি গানের আশ্রয়ে কয়েকজন নটনটীর অন্যোন্যমুখী নৃত্যাভিনয়, কয়েকটি উপাদানের (কাব্য, সুর, নৃত্য ও অভিনয়) সুন্দর সংযোগ। শাপমোচন বাস্তবিকপক্ষে লোকোত্তর কোনো মহত্তর সম্ভাবনার রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রথম আভাস বা প্রতিশ্রুতি।

এই উপাদানগুলিই শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ঐক্যলাভ করেছে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকায় প্রকরণের, রস-পরিবেশনের, সাধনা-সিদ্ধির ও পরিণতির তারতম্য থাকতেই পারে, তবু সেগুলি একই জাতের যার নাম দেওয়া হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য'। 'রবীন্দ্রনাথে'র কথাটা কোনোরকমেই বাহুল্য নয়। এই সৃষ্টির গোত্র জাতি বা প্রকৃতি বিচারে ঠিক পূর্বকালীন কোনো নাট্যকলার অনুকরণ নয়। কাব্য গান নৃত্য অভিনয়— সমস্তই এক অখণ্ড ঐক্য পেয়েছে; অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয়েছে রসের প্রকাশে— একই ছন্দ, একই প্রাণ এই সৃষ্টির আদ্যন্ত প্রবাহিত থেকে তাকে সচল সঞ্জীবিত রেখেছে।

সুতরাং যে অর্থে ঐগুলিকে নৃত্যনাট্য বলা হয়, শাপমোচনকে সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না। শিশুতীর্থের মতোই এখানে আরো ব্যাপকভাবে নৃত্যনাট্যের পরীক্ষণের পালা সারা হয়েছে মাত্র।

আলোচ্য পর্বে নাটকের আঙ্গিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের চিহ্ন চোখে পড়ে না 'তাসের দেশ' ছাড়া। এই নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাসের দলের ভূমিকা। হয়তো বা জাভার মুখোশ-নৃত্যের পরোক্ষ প্রভাব পড়ে থাকবে।[৪১] প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, ইয়েটস্‌-ও জাপানী নো-নাটকের আদর্শানুসরণে তাঁর নাটকে মুখোশ ব্যবহারের পক্ষপাতী হয়ে পড়েন শেষদিকে; সেকথা আগেই অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-নাটকে, বিশেষতঃ তাসের দেশে, মুখোশ-ব্যবহারের উপ-

যোগিতার কথা আলোচনা করে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যে তত্ত্বটি[৪২] ব্যাখ্যা করেছেন, দেখা যাচ্ছে ইয়েটসের বক্তব্যের মধ্যেও তার সমর্থন রয়েছে।

তাসের দেশের কাহিনী[৪৩] রূপকধর্মী, ঘটনাগুলি রূপকথার মতো। প্রত্যেক পাত্রপাত্রীও রূপকধর্মী বা টাইপ-বিশেষ, সজীব সচল কল্পনা মাত্র, বাস্তব নরনারী নয়। এই ভাবের সঙ্গে সংহতি রেখে বিশেষ করে এদের মুখ মুখোশ দিয়ে ঢাকা হয়েছে; রূপায়ণে যে সমস্ত নট-নটী নেমেছেন তাঁরা যে বাস্তব নরনারী, সেই সত্যটাই যেন ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এদের বাক্যালাপ, ভাবব্যক্তি, প্রত্যেক কাটা-কাটা অঙ্গভঙ্গী এদের অবাস্তবতারই দ্যোতক। অর্থাৎ তাসের দেশে এমন একটা মুখোশ-নৃত্যের কল্পনা করা হয়েছে যার অধিকাংশই নানা ছাঁদের বা ছন্দেব অবাস্তবিকতায় আবৃত – রূপসজ্জা, ভাবব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গী, এমন কি নৃত্যও। এর মধ্যে মুখ্যভাবে দুটি কুশীলব রয়েছে— রাজপুত্র ও সওদাগর পুত্র। তাদেরই সংস্পর্শে সংঘাতে এসে নাটকের পরিণতিতে কিভাবে সকল অবাস্তবতা দীর্ণ হল, মানবতা মুক্তি পেল, সেইটেই এর বিষয়বস্তু। যে তাসের দল একদা মানুষকে ব্যঙ্গ করেছিল, দেখা গেল সেই 'মানুষ' হবার সাধনাতেই তারা সকলেই এক কণ্ঠে বাঁধ ভাঙার গান গেয়েছে।

তাসের দলের নৃত্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার। যোগ্য পরিচালকের হাতে এই নৃত্যধারা এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। রাজপুত্রের 'যাবই আমি যাবই', 'এলেম নতুন দেশে' ইত্যাদি গানগুলি বা পত্রলেখার 'গোপন কথাটি' গানটিও নৃত্যের আঙ্গিকেই অভিনেয়। বলা বাহুল্য, এই নৃত্য-পদ্ধতি তাসের দলের নৃত্য-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় দৃশ্যে তাসের দলের প্রবেশের দৃশ্যটি ব্যালে প্রথায় সুন্দরভাবে রূপ দেওয়া চলে। 'নৃত্য'-এ প্রতিমা

দেবী 'একটি পথের দৃশ্য' (ব্যালে) নৃত্য-প্রসঙ্গে বলেছেন কিভাবে একই ছন্দে বিভিন্ন ঘটনা বা ক্রিয়াগুলি (যেমন, কেউ স্ফূর্তি করছে, কেউ বা প্রেমালাপে মগ্ন, কেউ বা উপহাস করছে ইত্যাদি) অভিব্যক্ত হয়েছিল। উদয়শঙ্করের 'লেবার এ্যাণ্ড মেসিনারী' (ব্যালে প্রথায় রচিত) ইত্যাদির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। দ্বিতীয় দৃশ্যের এই অংশ অনুরূপ প্রথায় রূপ দেওয়া চলে। অন্যত্রও এই ধরণের সুযোগ আছে অল্পবিস্তর। এছাড়া তাসের দলের যেসব সম্মেলক বা একক গান রয়েছে, সেগুলিও নৃত্য ছাড়া ঠিকমতো প্রকাশ বা অভিনয় করা যায় না।[৪৪]

এই নাটকের সমস্ত কবি-কল্পনার মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে। তদনুযায়ী বাক্যালাপ ও গানগুলি রচিত ; রূপসজ্জা আরোপিত এবং অভিনয় নির্দিষ্ট হয়েছে। এমন-কি প্রত্যেক গানের সুর ও ছন্দ একই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত। অর্থাৎ শাপমোচনের পর তাসের দেশ নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে আর-একটি বিশেষ পদক্ষেপ ও অগ্রগতি। এই রূপকল্পনার রূপকথাময় বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাসের দেশকে নৃত্যনাট্যের বিকাশের ধারায় পৃথক বা প্রক্ষিপ্ত বলে ভ্রম হতে পারে, বস্তুতঃ তা নয়। নৃত্য, গান ও অভিনয়ের (বাচিকাভিনয়) স্বাঙ্গীকরণ ব্যাপারে শাপমোচনের ঠিক পরে এবং নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার অব্যবহিত পূর্বে এর স্থান প্রত্যাশিত, এমন কি অনিবার্যও বলা চলে।

তাসের দেশ পর্যন্ত রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাই শেষের এই তিনখানি নাটকে নৃত্য আশ্রয় পেয়েছে এবং নৃত্যে রূপ দেবার জন্যই বিশেষভাবে রচিত। অর্থাৎ নৃত্যের প্রেরণাতেই এগুলির সৃষ্টি। এইভাবে রবীন্দ্র-নাট্যকলায় নৃত্যও এসে মিলিত হয়েছে এবং মূল নৃত্যনাট্যের পটভূমিকা রচনা করেছে।

বাস্তবিকপক্ষে শেষের এই তিনখানি নাটক বাংলা নাট্যজগতে সম্পূর্ণভাবেই অভিনব সৃষ্টি। বিশেষতঃ শাপমোচনে পূর্ববর্তী সঙ্গীত ও নৃত্যের অভিজ্ঞতা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা যথার্থই একটি নতুন পর্ব রচনা করেছে। শাপমোচন একসময় বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন-কি ভারতের বাইরেও।[৪৫] সেই সময় অনেকেই ভেবেছিলেন, 'শাপমোচনেই হয়তো আমাদের শক্তির সীমা,'[৪৬] কিন্তু পরববর্তী কালের নৃত্যনাট্যগুলি প্রমাণের অপেক্ষায় ছিল বস্তুতঃ তা নয়। যে গূঢ় অদৃশ্য ছন্দশ্চেতনা তার অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে আসছিল, সেই চেতনাই অবশেষে মূল নৃত্যনাট্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল।

মঞ্চকলা

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যবর্তী এই আয়োজন-পর্বে মঞ্চকলার বিবর্তনও একদিকে যেমন বিস্ময়কর তেমনি বৈচিত্র্যময়। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিবর্তনের ধারাটি তিনটি পর্বে ভাগ করা চলে। প্রথম, গীতিনাট্যের যুগ; দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন পর্ব (প্রথম কুড়ি বছর) ; তৃতীয় নৃত্যনাট্যের যুগ। প্রথম পর্বে যে মূলতঃ য়ুরোপীয় মঞ্চকলার অনুকরণ বা অনুসরণ করা হয়েছিল, তা যথাস্থানে আলোচিত। নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলা-প্রসঙ্গও পরে আলোচনা করা হবে। মধ্যবর্তী শান্তিনিকেতন-পর্বের নাটকের মঞ্চকলা নিয়ে যে সমীক্ষা ও পরীক্ষা করা হয়েছিল, এখানে সেই আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, এই পর্বের মঞ্চকলার পিছনে রয়েছে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। কলকাতার নাগরিক আবহাওয়া নয়, বিলাসের প্রাচুর্য নয়, শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত

প্রান্তরের প্রাকৃতিক প্রভাবই গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এই মঞ্চশিল্পকে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এই নির্জন পরিবেশ। নানা দিক থেকেই তা গুরুত্বপূর্ণ। নিছক মঞ্চকলার দিকে তাকালে দেখি, যখন বাংলা রঙ্গমঞ্চ উগ্র বাস্তবতাকে রূপ দেবার প্রয়াসে বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ করে চলেছিল, ঠিক সেই মূহূর্তে সকলের অগোচরে শান্তিনিকেতনে কয়েকজন শিল্পীর নিরলস সাধনায় মঞ্চকলার এক নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একদিক থেকে বলা যায়, শান্তিনিকেতনের মঞ্চকলার আদর্শই বাংলা রঙ্গমঞ্চের রুচি-পরিবর্তন করেছে।[৪৬]

সামগ্রিকভাবে শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মূল কথা হল— সহজ স্বাভাবিক ছন্দের লীলাময় প্রকাশ। এর আগে কবি নানা পরিবেশে লিখেছেন। কখনো নাগরিক, কখনো পদ্মার উপর বা অন্যত্র, কিন্তু আত্মস্থ হলেন এখানেই। 'বিসর্জন'[৪৭] এই পর্বে অভিনীত প্রথম নাটক; মঞ্চকলায় তখনো প্রথম পর্বের প্রভাব। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "দৃশ্যপটে রুচির অভাব যতই যাক্‌, অভিনয় মোটেই খারাপ হয় নি।"

ইতিমধ্যে মঞ্চকলাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছিল। 'বিসর্জন' (১২৯৭) পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চকলা সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেন নি। সম্ভবতঃ এর পর থেকেই তিনি অনুভব করতে থাকেন যে, ব্রিটিশযুগের তৎকালীন প্রচলিত মঞ্চকলার জড়ত্ব ঘোচাতে না পারলে নাট্যশিল্প পঙ্গু হয়ে পড়বে। এইজন্যেই তিনি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে পথনির্দেশ করা হয়েছে। ১৩০৯ সালে 'রঙ্গমঞ্চ' নামে যে প্রবন্ধ লিখলেন, তাতে মঞ্চকলা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হল। এই প্রবন্ধের মূল

বক্তব্য হল— নাট্যাভিনয়ের সময় দর্শকের কল্পনাকে মুক্তি দেওয়া চাই; বাইরের কোনো উপকরণের প্রাকার তুলে তা ব্যাহত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে কবি বললেন, 'মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে— একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে।' দর্শক, অভিনেতা এবং নাটকের সঙ্গে মঞ্চশিল্পের কী যোগসূত্র থাকা উচিত সে সম্বন্ধে আলোকপাত করার পর রবীন্দ্রনাথ আরো বললেন, 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম কবি-কল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।' কবি এ কথারই পুনরাবৃত্তি করে আরো পরে তপতীর ভূমিকায় বলেছেন, 'এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ তা বাস্তব সত্যকেও বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।'

বলা বাহুল্য মঞ্চকলা সম্পর্কে কবির এই ধারণাই নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে; এই চেতনার আলোকেই তাঁর নাটক ও মঞ্চকলা রচিত। বস্তুতঃ এই পর্বে শারদোৎসবই এর ভূমিকা রচনা করলে; মঞ্চকলার যে পরিবর্তন দেখা গেল তার সূচনা দেখা দিল এই নাটকের অভিনয়ে। এই নাটকটির আঙ্গিকও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফাল্গুনী পর্যন্ত এর জের চলেছিল।[৭৮]

শারদোৎসব-এর মঞ্চকলার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যপট বর্জন। তার বদলে দৃশ্যসজ্জায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখার চেষ্টা হল।

প্রসঙ্গতঃ, প্রথম সংস্করণ শারদোৎসব-এর প্রচ্ছদের কথা উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদপটে আঁকা ছিল উড়ে-যাওয়া বলাকা, নীচে কাশবন এবং ভিতরে ছিল শরতের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। নাটকটি মঞ্চস্থ করবার সময় এই রূপটিই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা দেখি— 'তাই মাটির ঢিবি, ঘাসের চাপড়া, কাশের বন, সিউলির গাছ, শরৎকালের নদী রচনা' করে ঐ স্বাভাবিক শ্রী আনা হল। এর সঙ্গে ছিল শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর পরিকল্পিত ড্রপসীন, যাতে আঁকা ছিল নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্য। পরবর্তীকালে এই ড্রপসীনের রূপ বদলে যায়। নটরাজের স্থান অধিকার করে শরতের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। এ'থেকে বোঝা যাবে দৃশ্যপট বর্জিত হলেও এই মঞ্চকলার মধ্যেও বাস্তবকে রূপ দেবার ঝোঁক রয়েছে। অর্থাৎ 'দৃশ্যসজ্জায় বাস্তবিকতা পরিত্যক্ত হল না।'

এই রীতিতেই ফাল্গুনীর মঞ্চকলা রচিত হয়েছিল। ঋতুনাট্যগুলিতে এইভাবেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিল রেখে মঞ্চসজ্জার ব্যবহার দেখা যায়। তবু এর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল— দৃশ্যসজ্জার বাস্তবিকতাও একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীসুরেন কর প্রমুখ শিল্পী মঞ্চকলা সম্পর্কে নতুন করে ভাবছেন। আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতায় কলাভবনের কাজ সুরু হয়েছে তখন। তাঁদের সম্মিলিত শিল্পবোধ এই নাটকের মঞ্চকলাকে আর-এক রূপ দিলে। এই মঞ্চ-শিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিছনের যবনিকায় নীল রঙের পর্দার ব্যবহার। অন্যান্য উপকরনের মধ্যে ছিল বাদাম গাছের ডালপালা এবং উপর থেকে ঝোলানো একটি দোলনা। "ওগো দখিন হাওয়া" গানটি গাওয়া হয়েছিল এই দোলনায় দুলতে দুলতে।

এই মঞ্চকলার লক্ষ্য হচ্ছে— মঞ্চের মধ্যে অসীমত্বের আভাস

ফুটিয়ে তোলা।[৪৯] দূর দিগন্তের ইঙ্গিত রূপে ঐ ঘননীল পর্দার এক কোণে লাগানো হল একফালি রূপালী চাঁদ। কোথায় এই চাঁদটি লাগানো হবে, এ নিয়ে নাকি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যাই হোক, নীলাকাশে চাঁদের বা দিগন্তের অসীমত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য এখানে ওখানে তারা বসানো হল। ফাল্গুনীর অভিনয় হয়েছিল নানা স্থানে অনেকবার। এমন-কি মুক্ত প্রাঙ্গণেও।[৫০] দেখা যাচ্ছে, ফাল্গুনী থেকে মঞ্চকলায় পুনর্বার পালাবদল সুরু হল; বাস্তবিকতাকে অতিক্রম করে দেখা দিল অসীমত্বের দ্যোতনা ও অলংকরণ রীতি।

এই ধারাতেই রচিত ডাকঘরের (১৯১৭) মঞ্চকলা; অভিনয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোতে। বিচিত্রার যুগ চলছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ এই শিল্প-সংঘকে কেন্দ্র করে চিত্রশিল্পের এক নতুন সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। আগেই রবিবর্মার কথা বলেছি। বাস্তবিকপক্ষে য়ুরোপীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি তখনো সুপ্রকট। এঁরা য়ুরোপীয় চিত্রকলা ও অঙ্কন পদ্ধতির অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, রীতি ও মনোধর্মের দিক থেকেও ভারতীয় শিল্পাদর্শের অনুশীলনে মনোনিবেশ করলেন। শিল্পের বিষয়বস্তুর জন্য তাঁরা যেমন ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণের দিকে তাকালেন তেমনি আটপৌরে জীবন-যাত্রাও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চিত্রকলার এই নবজাগৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা গেল ডাকঘরের মঞ্চকলায়। খড়, বাঁশ দিয়ে রীতিমত একখানি কুঁড়েঘর তৈরি হল। গৃহসজ্জা বা আসবাবের মধ্যেও গ্রাম্যশিল্পের ব্যবহার দেখা গেল। যেমন, মাটির প্রদীপ, ঘড়া, দেওয়ালে ও চৌকিতে পটশিল্পের কাজ। এ ছাড়া সামনের কিছুটা অংশ লতাপাতা দিয়ে ঘেরা ছিল, ডানদিকে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে

উঠেছে লতানে সবজি, বাঁ পাশের টবেও একটি গাছ, ডালপালাগুলো খড়ের ছাউনির গায়ে মিলে গিয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যে সুশোভিত। সর্বোপরি, ডানদিকে ঝোলানো ছিল একটি শূন্য দাঁড়— সমস্ত নাটকটির মূল সুর এইভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আর ফাল্গুনীর মতো এক ফালি চাঁদের আভাস ছিল পিছনের ঘন নীল দিগন্তের একপ্রান্তে।

এই মঞ্চকলার বৈশিষ্ট্য কি? এখানেও বাস্তবতা রয়েছে তবে সে বাস্তবতা অলংকৃত অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে পূর্বোক্ত উপাদানগুলি সুসজ্জিত করা হয়েছে। এর আগে ফাল্গুনীতে যে অসীমাভাস বা অসীমের ব্যঞ্জনা দেখি, এখানে তা আরো স্পষ্ট; সেই সঙ্গে প্রতীকত্বও দেখা গেল। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেছেন ঠিকই— "বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে খানিকটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা।"[৫১]

এর পরই স্পষ্টভাবে ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সুরু। মঞ্চকলার যে বিকাশ ইতিমধ্যে ঘটেছিল, তাকেই শেষবারের মতো আর-এক রূপে দেখা গেল। সাধারণ নাটক বাচিকাভিনয়-প্রধান বলে অভিনেতার আঙ্গিকাভিনয়কে প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু অভিনেতাকে যখন নৃত্যে অভিনয় করতে হয় তখন আঙ্গিকাভিনয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ ১৯২২ সাল থেকেই এদিকে লক্ষ্য রেখে মঞ্চকলার পূর্ববর্তী ধারাটি পরিবর্তিত হল। পূর্ববর্তী অলংকৃত বাস্তবতার বদলে রংঙের সহজ সরল অলংকরণের রীতি এল এই পর্বের মঞ্চকলায়। এর পিছনে ছিল মূলতঃ আচার্য নন্দলাল বসুর হাত। অভিনয়ে যাতে কোনোরকম অস্পষ্টতা বা জড়তা না থাকে, যাতে দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি অভিব্যক্তি নিখুঁতভাবে দেখা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে গিয়েই মঞ্চকলার এই রূপান্তর ঘটল।

এইভাবে মঞ্চের গভীরতা, বর্ণসমারোহ এবং অভিনেতাদের গতিভঙ্গীকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হল। পিছনে ঘননীল রঙের পর্দার ব্যবহার তো ছিলই, সেই সঙ্গে মঞ্চের বাম ও ডানদিকে চারখানা উইংসে পিছন থেকে পাশাপাশি এই রঙগুলি ব্যবহার করা হল: হলদে, নীল, ঘননীল ও ঘন লাল। এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মঞ্চের ঘনত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি অভিনেতার প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন ও অভিব্যক্তি নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠবার সুযোগ পেল। ঋতুনাট্য এবং পরবর্তী নাট্যধারার অভিনয়ে মঞ্চকলার এই আদর্শই অনুসৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা দরকার। মঞ্চকলার এই বিশিষ্ট রূপের বিশেষ বিশেষ নাটকে পরিবেশ অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে। ১৯২৬ সালে নটীর পূজার মঞ্চকলা এই আদর্শের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল; পরিবর্তনের মধ্যে পিছনে পর্দার সঙ্গে ছিল একটি প্রবেশ দ্বার। এই পর্দার পিছনে ছিল আরো কিছুটা অংশ এবং পিছনে আর একটি পর্দা; সেই অংশে সংলগ্ন ছিল সাঁচীর স্তূপের অনুসরণে একটি স্তূপ। প্রবেশ দ্বারেরদুপাশে দুজন রক্ষিণী দণ্ডায়মান; লোকেশ্বরীর জন্য বসবার একটি অলংকৃত উচ্চাসন। অলংকরণের চেষ্টা দেখি আরো কয়েকটি উপকরণের ব্যবহারে— যেমন, পুরোনো আমলের বাসনপত্র, ঝারি, গোলাপপাশ, ইত্যাদি। এই মঞ্চকলায় আলোক-সম্পাতের দিকেও বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার যুগে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা ছিল। তার পর থেকে সুযোগ ও সুবিধা-মতো আলোক-সম্পাতের উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থাও

উত্তরোত্তর উন্নত হয়েছে। এবং দেখা যায়, মঞ্চকলায় এইসব বাহ্যিক উপাদান ও উপকরণ প্রাধান্য পেয়েছে। এইসব উপকরণের তাৎপর্য ও সার্থকতা পরিমিত ব্যবহারের মধ্যে। যাতে এইসব উপকরণ প্রাধান্য না পায়, অর্থাৎ এর অন্তরালে অভিনয়কলা হারিয়ে না যায়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। রঙিন আলোর অহৈতুক পরিবর্তন দর্শকের চোখ ভোলাতে পারে, কিন্তু আসলে তা রসাভাসের কারণ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এজন্যে পরিমিত শিল্পবোধ যেমন থাকা প্রয়োজন, তেমনি কোন্ রঙের কী তাৎপর্য-তাও অনুশীলন করা উচিত। যাই হোক, 'নটীর পূজা'র আলোক-সজ্জাতে একটি গভীর ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল। দরজার ভিতরে ছিল নীল আলো। নটীর মৃত্যুর পর নীল আলোর সঙ্গে আবছা অন্ধকার মিশে একটি সকরুণ বেদনাঘন পরিবেশ রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষুরূপে তার মধ্যে প্রবেশ করেন; আশীর্বাদ করে চলে যান।

১৯২৯ সালে তপতী রচিত ও অভিনীত হয়। এই নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন, আগেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। 'ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয়' না দেবার যে সুদৃঢ় প্রত্যয় দেখা গেল, তার পিছনে রয়েছে রবীন্দ্র-মঞ্চকলার বিবর্তনের এই বিচিত্র ইতিহাস। শাপমোচন পর্যন্ত আলোচ্য পর্বের মঞ্চকলার এই হচ্ছে স্বরূপ— বাস্তবিকতা থেকে সরল অনাড়ম্বর অলংকরণে উত্তরণ।

মঞ্চকলা প্রসঙ্গে আরো একটা দিক উল্লেখযোগ্য। ঋতুনাট্য থেকেই দেখা গেল, মঞ্চের উপর গায়ক ও যন্ত্রীবৃন্দ পিছনের দিকে বসেন। তার সামনের অংশে অভিনয় করা হয়। গায়কদের বসবার জায়গাটি রঙিন কাপড়ের আবরণে পৃথক করে দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের একটি কোণে উপস্থিত

থাকতেন।[৫২] রবীন্দ্র-মঞ্চকলার এই বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ। ভরতনাট্যম্, মণিপুরী কথাকলি বা কত্থক নৃত্যাভিনয়েও গায়ক ও যন্ত্রীবৃন্দ মঞ্চের এক প্রান্তে উপস্থিত থাকেন। বস্তুতঃ, ভারতীয় মঞ্চকলার ঐ বৈশিষ্ট্যই আরো সুসংস্কৃত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রমঞ্চকলায়।

মঞ্চসজ্জার মতো রূপসজ্জাও প্রথম দিকে য়ুরোপীয় রীতির অনুসরণ করা হয়েছিল। তার পর ধীরে ধীরে নানা পরীক্ষার মধ্যেও রূপসজ্জারও একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। রূপসজ্জার মধ্যে চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম যাতে বজায় থাকে, সেদিকেই লক্ষ্য দেওয়া হয়। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার— এক্ষেত্রেও অলংকরণের রীতিই অনুসৃত।

বিসর্জন পর্যন্ত গীতিনাট্যের যুগেরই অনুবর্তন।[৫৩] এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য ফাল্গুনীর রূপসজ্জা। নীলপদ্ম হাতে গগনেন্দ্র-নাথের রাজরূপ, সভাপণ্ডিতের রূপসজ্জায় অবনীন্দ্রনাথের অভিনয়, এবং সেই সঙ্গে সোনালী আলখাল্লা-পরা অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের রূপসজ্জা 'গাঢ় নীল প্রচ্ছদপটের পাশে যেন মূর্তিমান সুর।'[৫৪]

ডাকঘরের রূপসজ্জায় গ্রাম্যরূপটিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখি। তপতীর রূপসজ্জায় অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ হাত ছিল। শেষ দৃশ্যে তপতীর রূপসজ্জা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— শুভ্র মূর্তির সঙ্গে শুভ্র বেশভূষা এক অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। নটীর পূজা থেকে সাজসজ্জার ব্যাপারে প্রতিমা দেবী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, এই নাটকের রূপসজ্জায় মণিপুরী মেখলা, রীহা এবং লম্বা চাদর কোমরে বাঁধবার জাভানী রীতি অনুসৃত হয়েছিল। তা ছাড়া নানা রঙের শাড়ির সমাবেশের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। এই পর্বের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

রূপসজ্জাকে সম্পূর্ণভাবে শিল্পের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ করে তোলা। দেহভঙ্গী বা অভিনয় যাতে অব্যাহতভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়েও লক্ষ্য ছিল প্রযোজকদের। তাসের দেশের রূপসজ্জা এদিক থেকে যুগান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই নাটকে মুখোস-ব্যবহারের উপযোগিতার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। নটীর পূজার রূপসজ্জায় যেমন জাভানী প্রভাব দেখি, সম্ভবতঃ এই নাটকের রূপসজ্জাতেও তার প্রভাব পড়ে থাকবে। তবে তাসের দেশ-এর রূপসজ্জায় যে-ধরণের মুখোস ব্যবহৃত হতে দেখি তা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। পুরুষদের সাজসজ্জার পরিকল্পনা করেন আচার্য নন্দলাল বসু, মেয়েদের ভার ছিল প্রতিমা দেবীর উপর। বলা বাহুল্য, তাসের নানা বৈচিত্র্য (যেমন, রাজা, রাণী, গোলাম ইত্যাদি) নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। মঞ্চকলার মতো রূপসজ্জার এই বিবর্তনের মধ্যেও শান্তিনিকেতন-শিল্পীগোষ্ঠীর অনন্যসাধারণ শিল্পচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

গীতিনাট্যের পর মধ্যবর্তী আয়োজন-পর্বের এই আলোচনা থেকে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, একটি সূত্রে মিলিত হবার অভীষ্ট পথে বিভিন্ন ধারা এগিয়ে গিয়েছে। কাব্যের বিবর্তনে এসেছে গদ্যকবিতার ছন্দ, সঙ্গীতের বিবর্তনে চিত্রধর্মিতার সঙ্গে সুরারোপের বৈচিত্র্য, নাটকের বিবর্তনে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সঙ্গীত ও নৃত্য মিলিত হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন ধারা সম্মিলিতভাবে নৃত্যনাট্যের ভূমিকা রচনা করেছে।

একটি ঘটনা ঘটে যাবার পর তবে তাকে পিছন থেকে দেখা সম্ভব ; যখন তা ঘটতে থাকে কিংবা পরিণতিতে না পৌঁছোয়, তার চেহারাটা ঠিকমত দেখা যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্য বা শিল্প-চর্যার প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য। কাব্য নাটক ও সঙ্গীত— প্রত্যেকটি

ধারারই বিবর্তন ও স্বতন্ত্র মহিমা রয়েছে। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যই একমাত্র সত্য নয়, তার ভিতরে নিহিত রয়েছে আরো গভীর ও বৃহত্তর তাৎপর্য। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে মনে হবে স্বতন্ত্র রূপটিই একমাত্র সত্য, কিন্তু অখণ্ডভাবে দেখলে একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্যও অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি নিজেই এই সত্যের ভাষ্যকার:

তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।[৫৫]

কাব্যপ্রসঙ্গে একথা বলা হলেও একদিক থেকে সামগ্রিকভাবে তা সত্য। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত ছন্দশ্চেতনাই বিভিন্ন বিবর্তনের ভিতর দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছে। গীতিনাট্যে যার প্রারম্ভিক সূচনা, এই আয়োজন-পর্বে তারই বিচিত্র বিকাশ ও মিলন-ভূমি রচিত।

১ চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড

২ রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহে 'বলাকা'র আবির্ভাবের স্বরূপটি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বিশদভাবে আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্র-সরণী' গ্রন্থে। সেই আলোচনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'বলাকা'র বৈশিষ্ট্য শুধু ভাবের দিক থেকেই নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও।

৩ রবীন্দ্রনাথের নিজের উপমা। এই বিষয়ে 'শেষ সপ্তক' কাব্য গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক কবিতা স্মরণীয়।

৪ "The next two books continue his imaginative interest in the terrible and begin to show how the political atmosphere was invading his poetry."—*Thompson* (*Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist.*)

৫ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৬ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৭ Subjective Restlessness

৮ "The human soul, in intense emotion strives to express itself in verse. It is not for me, but for the neurologists to discover why this is so and why and how feeling and rhythm are related···the tendency, at any rate, of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial, if we want to get the permanent and universal, we tend to express ourselves in verse" :
—(*A Dialogue on Dramatic Poetry—Selected Essays*) *Faber & Faber*

৯ জীবনস্মৃতি—হার্বার্ট স্পেনসর প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

১০ "The problem of verse drama to day, is not only one of new form and exciting poetry, it is not even the difficulty of finding actors, producer, a theatre and an audicnce sufficiently obliging to sit out several hours of poerry. The

problem involves the contemporary relations between poetry and speech itself, and the moment we consider the question of spoken poetry of any kind, we are faced by a tremendous wall of self conscionusness."—(*The Problem of Verse drama Today.*) London Mercury, Nov. 1935.

১১ "Verse speaking is not a new art, it is a forgotten art" —(*The Speaking of Poetry.*) Methuen & Co.

১২ Hardy and the Post war Age in poetry.

১৩ "...must have brilliant scenic attractions, star acting excitement of action a exhuberant romantic appeal."

১৪ "If we are to restore words to their sovereignty, we must make speech, even more important than gerture upon the stage."—*Plays and Controvesies*

১৫ At the Hawk's well, The only Jealousy of Emer, The Dreaming of the Bones এবং Calvary.

১৬ "I have invented a form of drama distinguished, in-direct, symbolic and having no need of mob or press to pay its way and aristocratic form."—*Certain Noble Plays of Japan from the manuscripts of Earnest Fenotllosa, chosen and finished by Ezra Pound, with an introduction by W. B. Yeats* —(The Cuale Press, Church Town.)

১৭ 'রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ'-এ শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ইংগিত করেছেন যে, হয়ত শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছায়ানাট্যে পৌঁছোতেন।

১৮ F. A. C. Wilson ইয়েটসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁর সাংকেতিক চেতনার ভিতর প্রাচ্যের প্রভাব রয়েছে। বিশেষভাবে তিনি 'a systematic study of the Upanisads' এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে কথা ইয়েটস্ বলেছেন, তার উল্লেখ ক'রে ইয়েটস্ ও রবীন্দ্রনাথের মনোগত সাদৃশ্য ও সমমর্মিতা দেখিয়েছেন। [W. B. Yeats and Tradition : The Subjective Tradition.]

১৯ রবীন্দ্রনাথের এইসব নাটকের কয়েকটির গানের সংখ্যা উল্লেখ করা গেল :

প্রায়শ্চিত্ত ২৩	অরূপরতন ২৬	ফাল্গুনী ৩১
রাজা ২৫	ঋণশোধ ১৪	রক্তকরবী ৮
অচলায়তন ২৩	মুক্তধারা ১৪	নটীর পূজা ১২
	শারদোৎসব ১০	

প্রভৃতি।

২০ শ্রাবণ গাথা (গান সংখ্যা) ২২, নবীন ২১, বসন্ত ২৬, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা ৩০, শেষবর্ষণ ২৮ প্রভৃতি

২১ তথ্যটি শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত

২২ রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোক—শ্রীসুধীর কর

দ্রষ্টব্য ঃ শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা (রবীন্দ্র-সঙ্গীত)—শান্তিদেব ঘোষ

২৩ ঘরোয়া ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ

দ্রষ্টব্য—রঙ্গালয়ে নেপেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২৪ তথ্যটি শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত

২৫ বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'পরিশিষ্ট' অংশ (নৃত্যকলার উজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ) দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃতিগুলি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার মন্তব্য :

(ক) বৃহস্পতিবার ১২ই মাঘ, ১৩৩৪ ; (খ) ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ ;

(গ) বৃহস্পতিবার ১২ই মাঘ, ১৩৩৪

২৬ The Living stage—'The Oriental Theatre'—*Kenneth Macgowan & William Melnitz.*

২৭ "There is nothing life like in the movements of the actors. Their dance is made up of slow and formal posturings."—(The living stage)

২৮ An Introduction to the Greek Theatre—Convention versus Illusion.—*Peter D. Arnott.*

২৯ "The three symbols of kabuki mean—'song', 'dance' and 'action or play'..." (The living stage)

৩০ জাভা ও বলির নৃত্য-গীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

৩১ দ্রষ্টব্য : (ক) রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(খ) "সেইজন্য ঋতুরঙ্গের নাট্যসংযোজনা এবং সাজসজ্জার মধ্যে জাভানী আভাস বর্তমান ছিল এবং সুরেন বাবুর রচিত ষ্টেজের মধ্যেও জাভানী স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।"—প্রতিমা দেবী (নৃত্য)

৩২ রবীন্দ্র সঙ্গীত—শান্তিদেব ঘোষ

৩৩ সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে Arnold L. Haskel বলেছেন, "The best ballet music is usually written especially for the purpose so that the comporer, the choreographer and the costume designer can work together in close harmony."—(*Girls' Book of Ballet*—Ed. by A. H. Franks)

৩৪ এই তথ্য শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত

৩৫ গানগুলির রচনাকাল :

১ কী ভয় অভয়ধামে—ব্রহ্ম-সংগীত

২ আনন্দধ্বনি জাগাও—ভারততীর্থ

৩ কে যায় অমৃতধাম যাত্রী—২৯. ৫. ১৩০৩

৪ যেতে যেতে একেলা পথে—২৬. ৫. ১৩২১

৫ মোর মরণে হবে তোমার—২২. ৫. ১৩২১

৬ হবে জয় রে ওহে বীর—ফাল্গুনী

৭ আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়—ফাল্গুনী

৮ ভোর হল বিভাবরী—অরূপরতন

৯ তিমির দুয়ার খোলো—ফাল্গুন, ১৩১৫

১০ জয় হোক জয় হোক—৪. ৯. ১৩২৮

৩৬ নৃত্য—প্রতিমা দেবী

৩৭ রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ

৩৮ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় শুনেছি— পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারেই এই রূপান্তর ঘটেছিল। বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষ্যে যেমন নতুন গান রচিত হয়েছে বা কোনো কোনো গান বর্জিত হয়েছে, তেমনি নৃত্যের দিক থেকেও এই ধরনের পরিবর্তন এসেছিল।

৩৯ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৪০ যেমন,

তোমায় সাজাব যতনে (১৯৩৩), হে বিরহী হায় (১৪ নভেম্বর ১৯৩৩) নমো নমো শচীচিতরঞ্জন (সিংহল, ২৬শে মে ১৯৩৪), হে সখা বারতা (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪), বঁধু কোন্ মায়া (২০. ৯. ৩৪), দূরের বন্ধু সুরের (২১. ৯. ৩৪), ওরে চিত্ররেখা ডোরে (২৭. ৯. ৩৪), মায়াবন বিহারিণী (২৯. ৯. ৩৪), কাছে থেকে দূর (৩০. ৯. ৩৪), কোন্ গহন অরণ্যে (৩০. ৯. ৩৪)

৪১ দ্রষ্টব্য: জাভা যাত্রীর পত্র

৪২ রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ

৪৩ এই নাটকের পূর্ব-রূপ 'একটি আষাঢ়ে গল্প'। নাটকে মূল গল্পের কাহিনীটি যথাযথ রক্ষিত। অপ্রাসঙ্গিকবোধে, বিশদভাবে 'রূপান্তর'-এর আলোচনা করলাম না।

৪৪ "...ব্যালে-র আদর্শে একটি নৃত্যাভিনয় খাড়া করবার চেষ্টা থেকেই এই নাটকের সৃষ্টি।" শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

(শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা—রবীন্দ্র-সঙ্গীত)

৪৫ 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য

৪৬ "বাংলা দেশের আধুনিককালের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখিতে গেলে শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চকে বাদ দেওয়া চলিবে না। এ বিষয়ে দেশের রুচি যেটুকু ঘুরিয়াছে, তাহার মূলে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতার মধ্য দিয়াই কাজ করিয়া চলিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের দু'একটা নূতনত্বে যুগান্তর, বিপ্লব, এই রকম ধুয়া কয়েক বছর আগে

কলিকাতা শহরে উঠিয়াছিল ; সে সবই প্রায় শান্তিনিকেতনের রীতির ক্ষীণ অনুসরণ।"—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৪৭ পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে অভিনীত 'বিসর্জন'এর মঞ্চকলার একটি কাঠামো শান্তিনিকেতনে কলাভবনে রক্ষিত আছে।

[শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে]

৪৮ দ্রষ্টব্য : রূপকার নন্দলাল—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

৪৯ "গুরুদেবের লেখনী যেমন ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতির রহস্যকে অনুভূতির রাজ্য থেকে বাস্তবে প্রকাশ করেছে, ঠাকুর শিল্পীরাও তেমনি তাঁর নাট্যের সঙ্গে আদর্শের ঐক্য রেখে নাট্যমঞ্চে সর্বদাই নূতন প্রচ্ছদপট তৈরি করবার জন্য উন্মুখ ছিলেন। সেদিন 'ফাল্গুনী'র সেই অন্ধ বাউলের আদর্শকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য সেই তারাখচিত গভীর নীলাকাশের প্রয়োজন ছিল। তা না হলে চিরপুরাতন যে চিরনবীন হয়ে অসীমমণ্ডলে বারংবার যুগ প্রবর্তন করছে, সৃষ্টির এই গভীর তাৎপর্যের প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকত।"—প্রতিমা দেবী (নাট্যধারা—গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০)

৫০ ১৩৬৮ সালে দোল পূর্ণিমায় বসন্ত-উৎসবে 'ফাল্গুনী' অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে গ্রন্থাগারের পাশে। সাত বছর আগেও এখানে ফাল্গুনী অভিনীত হয়েছিল। শাল ও বকুল গাছের কিছুটা অংশ নিয়ে রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়েছিল। ডাল থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল রঙিন কাপড় ; একপাশে পলাশের ফুলভরা ডাল। সাদা আলোক-সম্পাতেরও ব্যবস্থা ছিল।

এই ধরনের মঞ্চকলা একান্তভাবেই শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য। এ মঞ্চকলায় 'ফাল্গুনী'র অভিনয় না দেখলে ঠিকমতো বোঝা যাবে না মঞ্চকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কতোখানি সত্য।

তখন শাল-বীথির মাথা ছুঁয়ে চাঁদ উঠেছিল। একদিকে তার আলোকধারা, অন্যদিকে ঐ মঞ্চে বাউলের 'ধীরে গো বন্ধু ধীরে' গান,—এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, দাদা—শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রহাস—শুভময় ঘোষ প্রভৃতি।

উল্লেখপঞ্জী

৫১ রূপকার নন্দলাল

৫২ নিউ এম্পায়ারে অভিনীত নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয়ের আলোক-চিত্র দ্রষ্টব্য।

৫৩ কৌতূহলী পাঠকের হয়ত জানা আছে যে, শান্তিনিকেতনে প্রথমে মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করতো ছেলেরা। শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাসও একদা নারী ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন।

দ্রষ্টব্য—আমাদের শান্তিনিকেতন—সুধীররঞ্জন দাস

৫৪ নাট্যধারা—প্রতিমা দেবী

৫৫ আত্মপরিচয়, প্রথম প্রবন্ধ

চতুর্থ অধ্যায়

নৃত্যনাট্যের পর্যালোচনা

নৃত্যনাট্যের গানের আঙ্গিক

ক.

নৃত্যনাট্যগুলির গানের আঙ্গিকের আলোচনায় প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, নৃত্যই হচ্ছে এর লক্ষ্য, গানের সংগীত-রস এখানে মুখ্য নয়, 'নৃত্যরস'[১] সৃষ্টি করাই এর উপজীব্য। সুতরাং নৃত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এর বিচার বা বিশ্লেষণ করা উচিত, কেননা এখানে রবীন্দ্রনাথ শব্দগত ছন্দের উপর প্রাধান্য দেননি। নৃত্যকেন্দ্রিক বলেই নৃত্যের ও গানের ছন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবিতার মতো নৃত্যেরও এমন কতকগুলি ছন্দ বা তাল রয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ভাব ফুটে ওঠে। স্বভাবতঃই এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই গানের আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাক্-নৃত্যনাট্য যুগে রবীন্দ্রনাথ গানের নানা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এমন অনেক গান রয়েছে, যেখানে তিনি চারটি তুকের ধ্রুপদী রীতিকে (যা' রবীন্দ্র-সংগীতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য) সহজেই অতিক্রম করেছেন। এবং গানের আঙ্গিকের এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করা যায়।[২]

বিস্ময়ের সংগে আরো লক্ষ্য করতে হয় যে, নৃত্যনাট্যের পর্ব ও গদ্যকাব্যের পর্ব একই সময়ে সুরু হয়েছে।[৩] যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে, তেমনি গীতরচনাতেও কবি ইতিপূর্বে ছন্দোবন্ধের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে অবশেষে এসে পৌঁছোলেন গদ্যছন্দের বা গদ্যকাব্যের যুগে। 'গদ্যছন্দ' এই নামকরণ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ

হয়েছে। কবি এ সম্বন্ধে যে কথা বলতে চেয়েছেন, তার মূল কথা হচ্ছে "পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে……গদ্যে কবিতার রস দেওয়া……।" কবির বক্তব্য, গদ্যের ছন্দ হচ্ছে 'ভাবের ছন্দ'। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে— "অবস্থাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, গদ্য কবিতার ধ্বনিবিন্যাস অসংকুচিত ও অবারিত-গতি গদ্যের ন্যায় সম্পূর্ণ অবাধ এবং মুক্তও নয়; আর 'সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠিত' পদ্য কবিতার মতো 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধনে' আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধাও নয়।" এরই সূত্র ধরে বলা হয়েছে— "পদ্য রচনায় ছন্দের বন্ধনকে মেনে নিতে হয় বলে অনেকাংশেই ভাবগত স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়; আর গদ্য রচনায় ছন্দোবন্ধের বালাই থাকে না ব'লে রচয়িতার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে।[৪]

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ পদ্য ও গদ্যের যে অতিনিরূপিত ও অনতিনিরূপিত ছন্দের কথা বলতে চেয়েছেন, প্রকারান্তরে পূর্ববর্তী মন্তব্যে তাই স্বীকৃত। 'ভাবগত স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়' এবং 'স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে' ব'লে বিষয়টি সহজ করা হয়েছে। 'বলাকা'র 'মুক্তক ছন্দে' আমরা যেমন এক ছন্দমুক্তি লক্ষ্য করি, গদ্য কাব্যের মধ্যে সেই মুক্তিরই অন্য এক রূপ। যথার্থই অবশেষে ভাবগত স্বাচ্ছন্দ্যকে বজায় রাখাই ছিল তাঁর লক্ষ্য; অলংকারবিরল সৌন্দর্যই এই কাব্যের প্রাণ। 'নূপুরহীন পদক্ষেপে' ও 'নূপুরপরা পদক্ষেপে'র তুলনা এই প্রসংগে স্মরণযোগ্য। নৃত্যনাট্যের গানগুলি এরই দোসর। এখানে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। কথায় সুর যুক্ত হওয়ার সংগে সংগে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে; এবং সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে তালে। অর্থাৎ কথার সংগে সুরের মিলনে ধ্বনির ওজন বা মাত্রা বেড়ে যায়। 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে'— কাব্যছন্দের দিক থেকে ছ'মাত্রার। কিন্তু

গানে এ'টি আট মাত্রার তাল। গভীরভাবে দেখতে গেলে গানে এই মাত্রাবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। স্বরধ্বনির প্রভাবে গানের কথাতে ইচ্ছামতো মাত্রাবৃদ্ধি করা চলে। এই জন্যেই সাধারণতঃ কবিতার (কথার) ছন্দ ও গানের তাল এক হয় না। বস্তুতঃ, ভাব ও নৃত্যের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার জন্যই নৃত্যনাট্যের গানে আঙ্গিকগত আরো পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য, তিনখানি নৃত্যনাট্যেই এমন কতকগুলি গান রয়েছে (যেমন, মায়াবন-বিহারিণী হরিণী ; কেটেছে একেলা বিরহের বেলা ; অশান্তি আজ হানল ; আমার এই রিক্ত ডালি ; ইত্যাদি) যেগুলি চারতুকের ধ্রুপদী রীতিতেই রচিত।

ধ্রুপদ সাধারণতঃ চারটি তুকে বিভক্ত— স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। স্থায়ী গানের প্রথম অংশ— সুর-সপ্তকের মন্দ্র বা মধ্য অংশেই এর সীমা। দ্বিতীয় অংশ অন্তরা— মধ্য এবং তদূর্ধ্বে তারা-স্থানে তার বিন্যাস। তৃতীয়তঃ, সঞ্চারী ; এর বিচরণ মন্দ্র স্থানে। সর্বশেষ অংশ আভোগ। অন্তরার মত এর স্থিতিও তারা-অংশে। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের এই বৈশিষ্ট্যই বজায় রেখেছেন সাধারণতঃ। এই জাতীয় গানগুলি সংলাপেরই অংশ হলেও এই সব গানে একক গীত-ধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ গানই সংলাপধর্মী। তাই নির্দিষ্ট কোন পদ্যবন্ধে তা স্বভাবতঃই আবদ্ধ থাকেনি। নৃত্যনাট্যের গানের আঙ্গিকগত এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা আগাগোড়া সমিল পয়ারে রচিত এবং এই ছন্দ সমগ্র নাটকটিকে একটি ঐক্যদান করেছে। পক্ষান্তরে, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে স্বতন্ত্র-প্রকৃতির। নৃত্যবন্ধের ঐক্যেই নৃত্যনাট্যটি গ্রথিত হলেও ভাষার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। সংলাপের দিক থেকে, যেগুলি আবৃত্তির যোগ্য, সেই

সব অংশের সংগে চিত্রাংগদা কাব্যনাট্যের ভাষা ও ছন্দের মিল দেখতে পাবো। উভয় ক্ষেত্রেই পয়ার বন্ধের মৃতু-গম্ভীর সুললিত ধ্বনিস্পন্দন অনুভব করা যায়। অবশ্য ছন্দোবন্ধের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে; কাব্যনাট্যে যেখানে তা' চৌদ্দমাত্রার ছকে আবদ্ধ, নৃত্যনাট্যে সেই ছক অনেকটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ 'বলাকা'র অক্ষরবৃত্ত ছন্দোবন্ধের বা মুক্তক ছন্দের সঙ্গে মিল এসে গেছে। যেমন—

" .... আজ মোরে—
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি, একা নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী।"

(উদ্‌ধৃত অংশটি কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে গৃহীত) নীচে নৃত্যনাট্য থেকে এই অংশেরই রূপান্তরিত সংলাপ :

'আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।
শুধু একা পূর্ণ তুমি
সর্ব তুমি
বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি
অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি
একনারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান—
সব সাধনার তুমি
শেষ পরিণাম!'

পয়ারের মুক্তবন্ধের জন্যে ভাষার পরিবর্তন লক্ষণীয়। নৃত্য-নাট্যের গানের ছন্দ খুবই অনিয়মিত। এই জাতীয় ছন্দকেই ভাঙা ছন্দ বলা যায়। যেমন,

মোহিনী মায়া এল।
এল যৌবন কুঞ্জবনে।
এল হৃদয় শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণ বিজড়িত অন্ধকারে।

আর, তারপরেই—

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।

* * *

হা হতভাগিনী, এ'কী অভ্যর্থনা মহতের
এল দেবতা তোর জগতের
গেল ছলি
গেল তোরে গেল দলি
অর্জুন! তুমি অর্জুন!

ছন্দোবন্ধের দিক থেকে, গীতিনাট্যে যেমন পয়ারের কাঠামোর প্রাধান্য, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে তেমনি মাত্রাবৃত্তের। অবশ্য, গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য লৌকিক ছন্দে বা ছন্দোবন্ধে রচিত একাধিক গান রয়েছে। চিত্রাঙ্গদার সংলাপমূলক হ্রস্বায়তন গানে পয়ারের কাঠামোতেই রচিত এক ধরনের ভাঙা ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

আগ্রহ মোর অধীর অতি
কোথা সে রমণী বীর্যবতী!

কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা—
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্র রসে—
নহে যে ভোগীর লোচনলোভা
ক্ষত্রিয় বাহুর, ভীষণ শোভা ॥

অন্যদিকে চণ্ডালিকার সংলাপমূলক গানগুলির ভাঙাছন্দ আরো সাবলীল ঃ

আঙিনা হয়নি যে নিকানো।
তোলা হল না জল
পাড়া হল না ফল।
কখন বা তুই চুলো ধরাবি
কখন ছাগল তুই চরাবি।

এর সঙ্গে মৌখিক ভাষার ঢং লক্ষণীয় :

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি
নষ্ট হবে যে দই
সে কথা জানো না কি ॥

কিংবা, কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।

লৌকিক ছন্দোবন্ধে—

সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো
শেষকালে এই ঠাঁই
ভাগ্যে দেখা পেলাম রক্ষা তাই।

নৃত্যনাট্য শ্যামার গানগুলিও মূলতঃ মাত্রাবৃত্তের কাঠামোর

উপর রচিত। সেখানেও কথার ঢং লক্ষ্য করা যায়, চাই কি মুক্তবন্ধ ব'লে ভ্রম হতে পারে। যেমন—

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—
চোর চাই যে করেই হোক, চোর চাই।
হোক্ না সে যে-কোনো লোক, চোর চাই।
নহিলে মোদের যাবে মান।

কিন্তু, নৃত্যনাট্যগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিথিল বাক্যবন্ধ। পয়ার, মাত্রাবৃত্ত বা লৌকিকের শিথিল বিন্যাস গীতিনাট্যেও পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু নৃত্যনাট্যে তা এতোই প্রকট, বিশেষ ক'রে কথার ঢং, যে, এগুলিকেই যথার্থ গদ্যছন্দ বা Free verse ব'লে স্বীকার করতে হয়। যেমন—

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর। ...... ইত্যাদি

ওগো আমার সর্বনাশ
ওগো আমার সর্বস্ব
তুমি এসেছ
আমার অপমানের চূড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নৃত্যনাট্যের গানের আবৃত্তির অযোগ্যতা ও শ্রীহীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে যে, বাইরের এই দৈন্যই তার অন্তরের ঐশ্বর্য। এবং সহজেই লক্ষ্য করা যায়— এদিক থেকে চণ্ডালিকাই

তুলনামূলকভাবে বেশি সার্থক। এই আলোচনার প্রারম্ভে গদ্য-কাব্যের প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছিল। দুয়ের মধ্যে ভাষাগত কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। গদ্যকাব্যের সর্বত্রই প্রায় চলিত রীতি স্থান পেয়েছে। কিন্তু নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে, কথ্য রীতির অনুসারী হলেও, প্রায়ই সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সাধুরূপ লক্ষণীয়। তবু কাব্যরূপের দিক থেকে এগুলিকে গদ্য কবিতার পর্যায়েই ফেলা উচিত। বুদ্ধদেব বসু এবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন, "ব্যাকরণগত অশুদ্ধির ভয়ে যাঁরা গদ্য কবিতার নাম মুখে আনেন না, গদ্য গান শুনলে তাঁরা অত্যন্তই মুহ্যমান হয়ে পড়বেন এমন আশঙ্কা করি। গদ্যের স্বাধীনতার মধ্যে কাব্যের সুষমা যদিবা প্রকাশিত হতে পারে, গান তার চিরাচরিত ছন্দমিলের শৃংখল পরিহার ক'রে চলবে, এও কি সম্ভব ?"[৫]

সম্ভব। বলা বাহুল্য, নৃত্যনাট্যগুলির গানগুলি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কাব্যরূপের দিক থেকে নৃত্যনাট্যের গানের আঙ্গিকগত যে বৈশিষ্ট্য দেখানো হ'ল, তা ছাড়াও আরো এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। গীতিনাট্যের আলোচনায় দেখেছি সংলাপের অ-লৌকিকত্ব। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় লৌকিক সাদৃশ্য যতটুকু আছে, 'মায়ার খেলা'য় তার থেকেও কম। নৃত্যনাট্যের মধ্যে, বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করতে হয়, সংলাপধর্ম মূর্ততর স্ফুটতর হয়ে উঠেছে। বলা উচিত, এই তিনখানি নৃত্যনাট্যের প্রাণকেন্দ্র (তারতম্য থাকতেই পারে) এই জীবনীশক্তি দ্বারা বিধৃত।

সাধারণতঃ কোনো কিছুকে আবেগের সংগে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনবার উচ্চারণ করা হয়; সংলাপের বা কথ্য-রীতির এটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। হয়ত নৃত্যের তেহাই-রীতির

প্রভাবও এর পিছনে রয়েছে। সে যাই হোক, এই বিশেষত্ব নৃত্যনাট্যের মধ্যে কী ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তা স্মরণযোগ্য। বলাবাহুল্য, গানের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ :

ক. 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে—

তোমায় ফিরিতে হবে হবে হবে
ঢেউ দিল ঢেউ দিল ঢেউ দিল আমার মর্মতলে
বাতি নিবায়ে যাব না যাব না যাব না
হবে জয় হবে জয় হবে জয়
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে
দিয়ো দিয়ো দিয়ো ঘুচায়ে
তোমার পথে পথে পথে বিছায়ে [দ্বিতীয় দৃশ্য]
ধিক্ ধিক্ ধিক্
যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর [তৃতীয় দৃশ্য]
না না না সখী ভয় নেই
হো এল এল এলরে দস্যুর দল
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই রে [চতুর্থ দৃশ্য]
লহো লহো ফিরে লহো
যাক্ যাক্ যাক্ এ ছলনা [পঞ্চম দৃশ্য]
ধন্য ধন্য ধন্য আমি ॥ [ষষ্ঠ দৃশ্য]

খ. 'শ্যামা' থেকে —

না না না বন্ধু
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না [প্রথম দৃশ্য]
নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি ভয়
নই আমি নই চোর নই চোর নই চোর
ঐ বটে ঐ চোর ঐ চোর ঐ চোর

শীঘ্র যা লো সহচরী যা'লো যা'লো যা'লো
নহে নহে এ নহে কৌতুক
ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, তুমি জান নাই
লহো লহো লহো মোরে বাঁধি [দ্বিতীয় দৃশ্য]

বোলো না বোলো না বোলো না
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও
নহে নহে নহে সেকথা এখন নহে
সবে না সবে না সবে না
ছাড়িব না ছাড়িব না ছাড়িব না
সব কিছু কেন নিল না, নিল না নিল না
জানিনে জানিনে জানিনে কী যে চাহ
এসো এসো এসো প্রিয়ে
কেন এলি কেল এলি কেন এলি ফিরে
যাও যাও যাও যাও, চলে যাও [চতুর্থ দৃশ্য]

গ. 'চণ্ডালিকা' থেকে—
আয় আয় আয়
দই চাই গো, দই চাই, দই চাই
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল আমি তারে
কাজ নেই, কাজ নেই মা, কাজ নেই মোর ঘর-কন্নায়
ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ত্বরা কর্
মরি হায় হায় হায় [প্রথম দৃশ্য]

সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা, সে যে দারুন মিথ্যা
এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার
সে তো এল না, এল না, এপথে এল না
দেবই আমি, দেবই আমি, দেব
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম
আনবই, আনবই, আনবই তারে মন্ত্র পড়ে [দ্বিতীয় দৃশ্য]

দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ
দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ
না, না, না।
আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই।
না না না, পড়্ মন্ত্র তুই
আসবে সে, আসবে সে, আসবে
ঐ আসছে, আস্‌ছে, আস্‌ছে
বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাঁশি
টান্ দে টান্ দে টান্ দে টান্ দে
পাক্ দে, পাক্ দে, পাক্ দে, পাক্ দে
টান্‌রে টান্‌রে টান্‌রে
আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো তুমি এসো
আর যে সহে না, সহে না, সহে না
ও মা ও মা ও মা ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র
এখনি, এখনি, এখনি।
থাক্ থাক্ থাক্
জয় হোক তাঁর, জয় হোক তাঁর, জয় হোক্॥ [তৃতীয় দৃশ্য]

খ.

নৃত্যনাট্যের বিবর্তনের ইতিহাসটি স্মরণ রেখে বলতে হয়, প্রথম যুগের গীতিনাট্যকে যদি না পেতাম, তাহলে হয়ত নৃত্যনাট্যের আংগিকের বর্তমান রূপটি পাওয়া যেত না। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ ঠিকই বলেছেন যে, গানের সুরে যে কথা বলা যায় বা নাট্য বিষয়কে রূপ দেওয়া যায়, তা' তিনি গীতিনাট্যের যুগেই অনুভব করেছিলেন। এইজন্যেই বলা চলে, এক অদৃশ্য সূত্রে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য জড়িত।

দুই-ই যদিও আদ্যন্ত গানে রচিত, তবু উভয়ের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য রয়েছে। গীতিনাট্যের গানগুলি যেমন বিশেষ ভাবে অভিনয়ের জন্যে রচিত, তেমনি নৃত্যনাট্যের গানগুলি নৃত্যাভিনয়ের জন্য। নৃত্যনাট্যের গানগুলির বৈশিষ্ট্য এখানেই। কিন্তু এই গানগুলি কতোখানি এবং কী ভাবে নৃত্যের উপযোগী তা' বিশেষ আলোচনাসাপেক্ষ।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার (নিউ এম্পায়ারে ১৯৩৬ সালের ১১, ১২, ১৩ মার্চ তারিখে অভিনয় উপলক্ষ্যে) বিজ্ঞপ্তিতে কবি জানিয়েছিলেন, "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী।" কবি প্রসংগটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো বলেন, "একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এ শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধহয়।" [৬] কবির এই উক্তি গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। বলা উচিত, এর মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত। গানগুলির রূপকল্পের আলোচনায়

নৃত্যোপযোগিতার তাৎপর্য প্রমাণ করা যায়। নৃত্যকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করেও প্রশ্ন তোলা যায়—সব গানই কি নৃত্যের উপযুক্ত বা নৃত্যের উপযোগী? বিশেষভাবে যখন প্রশ্নটিকে নৃত্যনাট্যের সংগে জড়িত করা হয়, তখনও একই প্রশ্ন ওঠে—নৃত্যনাট্যের উপযোগী গান বলতে কী বুঝবো?

নৃত্যনাট্যের মূল অর্থ যদি এই হয় যে, নৃত্যের ভূমিকায় (গীতিমূলক) নাট্য, তাহলে কথাকলিকেই ভারতীয় নৃত্যনাট্যের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করা উচিত। কেননা আংগিকের দিক থেকে কথাকলিরও বৈশিষ্ট্য তাই। এবং অত্তকথা (Atta Katha) ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের কথাবস্তু বা ভাষাসামগ্রী সমজাতীয়। কথাকলিতে অত্তকথা রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ, কথাকলির এই 'Literary aspect'-এর পিছনে ঐ নৃত্য-ধারা, মঞ্চকলা, এককথায় নৃত্যনাট্যের আংগিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুপরিমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার এবং এখানেই অন্য নাটকের সংগে পার্থক্য।[৭] সাধারণভাবে নাট্যকারের কল্পনা এবং ঘটনাবিন্যাসের দিক থেকে স্বাধীনতা থাকে, (যদিও তাঁকে মঞ্চের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।) কিন্তু কথাকলির জন্য অত্তকথা রচনার সময় মূলতঃ নৃত্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় ব'লে, কল্পনাকে ইচ্ছামতো প্রকাশের সুযোগ থাকে না। কেননা, নৃত্য হিসেবে কথাকলি মুদ্রাপ্রধান এবং কথা-অংশ আসলে তার সংগে বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। কথা-অংশ বা গানই কথাকলিতে নৃত্যে রূপায়িত হয়। তাছাড়া আছে অঙ্গভঙ্গী ও ভাবপ্রকাশের দিক। হস্তমুদ্রা ও মুখভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সবকিছু প্রকাশে অসুবিধে আছে। কারণ মুদ্রা-ব্যবহারের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিছক ভাবধর্মী অংশগুলি যতটা সুরে অভিব্যক্ত হয়, নৃত্যে সে সুযোগ নেই।

অবশ্য, য়ুরোপীয় ইম্প্রেশনিষ্ট (Impressionist) নৃত্যের নজির দিয়ে বলা যায়, যে-কোনো ভাবকেই তো নৃত্যে রূপায়িত করা চলে। হয়তো যায়, কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় যে, সম্পূর্ণভাবে সংগীতের অর্থ বা ভাবকে যদি নৃত্যে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে গানের মধ্যে বস্তুধর্মিতা বা চিত্রধর্মিতা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, কথাকলির মুদ্রা হচ্ছে সেই বস্তুধর্মিতারই প্রতীক। তাই বলা হয়েছে, '……… a Kathakali actor is always at his best when he has to show a 'lotus' or the 'gait of an elephant'. But he fails to impress his audience with the gestural representation of abstract ideas.'[৮]

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে দুটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা গেল[৯] :

ক. Oh my lovely girl, see this garden of mine
I feel now encouraged to indulge in
amorous play.
The trees of all varieties have flowered ;
The tendrils dancing in the breeze ;
Invite us with their sprouting fingers.

* * * *

Koki, seeing your face, suspected the
rising of the moon,
And fearing the impending pangs of
separation
Looks at you with one eye in raging wrath

And her lover with the other eye full
of sorrow.
The peacocks there dance in ecstacy
Suspecting your flowing hairlock to be
black clouds.
(Uttarasvayamvaram Atta Katha)

খ. Oh my little girl, you, gem of women
What is your wish ?
How dare you catch me,
One flying in the skies ?
Youth has dawned on you.
But your childishness is still in its
infancy !
Your folly, If wise men happen to know
They will laugh at you, some may scold you,
And truly, you will go astray !
(Nalacharitam Atta Katha)

কথাকলির এই দুটি পদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমটি চিত্রপ্রধান, দ্বিতীয়টি ভাবপ্রধান। গাছ, ফুলফোটা, চাঁদ, ময়ূর ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রথম পদটি চিত্রধর্মী এবং কথাকলিররীতিতে মুদ্রার মাধ্যমে এই পদটিকে সহজেই নৃত্যে প্রকাশ করা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পদটির শেষ চারটি চরণ যথার্থই নির্বস্তু, ভাবপ্রধান এবং সেইজন্যেই যথাযথ নৃত্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়—এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে মূল ভাবটি প্রকাশ করা যায় মাত্র। প্রথম পদটির

প্রত্যেকটি অংশ কিন্তু নিখুঁতভাবে রূপ দেওয়া যায় নৃত্যে। অবশ্য, দ্বিতীয় পদটির প্রথম অংশকে, (How dare you........in the skies ?) যেমন—উড়ন্ত পাখিকে ধরার চেষ্টা[১০] সহজেই ফোটানো যায়। ডাঃ নায়ার এইজন্যেই বলেছেন—"In short, the more abstract the idea contained in a kathakali song, the more difficult it would be on the part of the actors to show it and still more difficult for the audience to follow it."

বস্তুতঃ নৃত্য মূলতঃ রূপপ্রধান-শিল্প বলেই নৃত্যনাট্যের উপযোগী গান স্বভাবতঃই যে ভাবমূলক হতে পারে না, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে তা' স্পষ্ট হবে! এদিকে লক্ষ্য রেখে, রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যগুলির এ বিষয়ে কতোখানি উপযোগিতা রয়েছে—আলোচনা করা যেতে পারে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার প্রথম দৃশ্যের সূচনার গানটি (গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে) সম্পূর্ণভাবেই চিত্রধর্মী। এর প্রতিটি অংশ নৃত্যাভিনয়ে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। চিত্রাঙ্গদার কয়েকটি গান ছাড়া প্রায় সব গানেই এই আদর্শ বজায় আছে। এমন কি সখীবৃন্দ, গ্রামবাসীবৃন্দ, মদন এবং অর্জুনের গানগুলিও অনুরূপ। এই নৃত্যনাট্যে দশটি আবৃত্তি[১১] রয়েছে। প্রথমে ১৯৩৬ সালে আবৃত্তিগুলি নৃত্যের ছন্দে অভিনীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ শুধু আবৃত্তি করতেন। পরবর্তীকালে তা' নৃত্যের ছন্দে অর্থাৎ নৃত্যভংগীতে অভিনীত হতে থাকে।[১২] লক্ষণীয়, এই আবৃত্তি-গুলিও নৃত্যের বিশেষ উপযোগী। নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র গানগুলিও সামগ্রিকভাবে এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষভাবে কোটালের গানগুলি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যটি সম্পূর্ণভাবেই প্রায় চিত্রধর্মী। সখীদের ও পল্লীরমণীদের গানগুলিও স্পষ্টতঃই অনুরূপ।

নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র দিকে তাকালেই দেখা যাবে— হয়ত তারতম্য আছে, কিন্তু অধিকাংশ গানই চিত্রধর্মী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— দইওলা, চুড়িওলা, অনুচরের গ্রামবাসীদের এবং মেয়েদের গানগুলি। 'কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে', 'জল দাও' প্রভৃতি গানও যে এই জাতীয় তা' বলাই বাহুল্য।

নৃত্যোপযোগিতার দিক থেকে যে চিত্রধর্মিতার কথা বলা হল তার অর্থ হচ্ছে এই যে, শব্দের মধ্যে দিয়ে চিত্ররূপ রচনা করা।[১৩] যেমন কবিতায়, তেমনি গানেও এই চিত্রধর্ম ফুটিয়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে দৃশ্যধর্মিতাই উপজীব্য। নৃত্যের পক্ষে এই জাতীয় গানই বিশেষ অনুকূল। সচেতন ভাবেই হোক্ কিংবা অজ্ঞাতসারেই হোক্ রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের গানে প্রায়শঃই এই ধর্ম বজায় রেখেছেন।

কিন্তু আরো এক গভীরতর অর্থের গানগুলি নৃত্যোপযোগী। এখানেই কথাকলির অন্তকথার সঙ্গে পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের গীত-রচনার এই মৌলিকত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম যুগের গীতিনাট্যের গানগুলির দিকে মনোনিবেশ করলেই দেখা যাবে— গানগুলি ছন্দে লয়ে ও ভাবে আবেগমূলক। অবশ্য বাল্মীকি-প্রতিভার গানগুলি এর কিছু ব্যতিক্রম। প্রসঙ্গক্রমে নিজের গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে— শেষ বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে।[১৪] এখানে 'রূপ' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত।[১৫] রূপ বলতে আপাতদৃষ্টিতে বাইরের দৃশ্যধর্মিতার কথাই মনে হয়। কবি যে-শেষ বয়সের গান সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে ঐ বাইরের রূপ বা চিত্রধর্মিতা হয়ত তার মধ্যে দেখা যাবে না— অথচ ঐ উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, যখন দেখি যথার্থই প্রথম যুগের গানের সংগে শেষ পর্বের গানের এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য

রয়েছে। এ পার্থক্য কিসের? দেখা যাবে, আগেকার গানে ছিল উচ্ছলতা, ভাবালুতা— সুরারোপে, ছন্দে ও লয়ে। শেষ পর্বের গানে গঠনের সংহতি যেমন এসেছে, সুরারোপ, ছন্দ ও লয়ের বৈচিত্র্য বেড়েছে। আলো-অন্ধকারের 'অনন্ত'-স্তর ভেদ যেমন অদৃশ্য 'তরঙ্গের' আয়তন-গত বা কম্পন-গত 'অনন্ত' বৈচিত্র্যের ফল, এমন কথা বিজ্ঞান বলে, তেমনি মনের ভাবও প্রধানতঃ নানা আকারের স্বরতরঙ্গের দ্বারা অতিদ্রুত থেকে বিলম্বিত লয়ে প্রকাশিত হয়— শিল্পী প্রজ্ঞা দ্বারা যথোচিত ছন্দ ও লয় সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন, আবেগের বিভিন্নতা বিভিন্ন ছন্দে ও লয়ে প্রকাশ করেছেন। আগেকার গানে (এমন কি গীতিনাট্যের গানেও) তিনি ছন্দ ও লয়ের এই বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেননি, প্রকট করেননি। কেননা, প্রতিপদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমায় সেগুলির সুষ্ঠু অভিনয় বা হুবহু 'অনুবাদ' তেমন আবশ্যক ছিল না। অঙ্গের দ্বারা অভিনয়ের কথা ভেবেই নৃত্যনাট্যের গানে ছন্দোবৈচিত্র্য ও লয়ের দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। এখানে মনের ভাবের বিভিন্ন তরঙ্গ ফুটে উঠেছে। এসব গানে তিনি ছন্দকে সামনে এনেছেন বা প্রকট করেছেন; ছন্দ শুধু অন্তর্লীন হয়েই নেই। ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্যই অনায়াসে তা অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্যে সমন্বিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি কথাকলির মতো গানে চিত্রধর্ম না এনেও, প্রজ্ঞা থেকে ঐ ছন্দ অনুভব করেছেন ও প্রয়োগ করেছেন— অতনু আবেগগুলি যেমন স্বরতরঙ্গে রূপ পেয়েছে, সেই সঙ্গেই অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিত হয়ে গেছে। পূর্বোদ্ধৃত রবীন্দ্র-উক্তিতে 'রূপ' বলতে তাই বুঝতে হবে ব্যঞ্জনা (আনন্দবর্ধন যাকে বলেন 'ধ্বনি')। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী প্রসঙ্গান্তরে[১৬] বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গান সৌন্দর্যপ্রধান। এই উক্তির মধ্যেও

অনুরূপ তাৎপর্য অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্য প্রযোজনা করেছেন তাঁর নৃত্যনাট্যে, তার মধ্যেও ঐ ব্যঞ্জনা বা 'ধ্বনি'র ব্যবহার অল্প নয়, অনিবার্যতা যথেষ্ট এবং এই 'নৃত্যধারা'র বিশিষ্টতার বা আভিজাত্যেরও লক্ষণ। বস্তুতঃ, চিত্রধর্মী গানগুলির (চিত্র বলতে ছবি বা মূর্তি দুই-ই বোঝায়) পাশাপাশি আর একজাতীয় যেসব গান রয়েছে, সেগুলি এই কারণেই নৃত্যের উপযোগী। বজ্রসেন বা শ্যামার (কিছু গান ছাড়া) সব গানগুলি চিত্রপ্রধান না হলেও ছন্দোবৈচিত্র্যময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী বলেই নৃত্যাভিনয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী। তাছাড়া, উদাহরণ হিসেবে 'চিত্রাঙ্গদা'র 'ওরে ঝড় নেমে আয়' এবং 'বঁধু কোন্ আলো চোখে' গান দুটি উল্লেখ করছি। ভাবপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য গান দুটি স্বভাবতঃই নৃত্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার সুযোগ আছে। তেমনি 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যেও একাধিক গান (বিশেষভাবে শেষের দিকে) রয়েছে, যার সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। 'আহা মরি মরি' গানটির কথাই ধরা যাক। এই গানটিতে ভাবের যে বৈচিত্র্য রয়েছে (অর্থাৎ দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে) তা' সম্পূর্ণভাবেই অঙ্গভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলা যায়। উত্তীয়ের 'ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে' কিংবা 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' গান দুটি ভাবপ্রধান হলেও নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী। নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'তেও এই ধরনের গান রয়েছে। প্রকৃতির 'আমি ভয় করিনে মা' গানটির মতো একাধিক গানের নৃত্যোপযোগিতার মূলে রয়েছে ঐ ছন্দোবৈচিত্র্য।

হয়ত প্রশ্ন উঠবে— যে-কোনো গান কি নৃত্যে রূপ দেওয়া যায় না? নৃত্যকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করেও বলা উচিত, যেহেতু নৃত্যের মূল কথা রূপময়তা, সেইজন্যেই নিছক ভাবধর্মী কোনো গান নৃত্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।[১৭] এখানে 'ফুটিয়ে

তোলা' বলতে বোঝাতে চাইছি গানের রূপ, অর্থ বা ভাবকে দেহভঙ্গীর মধ্যে প্রকাশ করা। 'শ্যামা'র নেপথ্যের গান দুটির (হায় একী সমাপন ; সব কিছু নিল না) দিকে লক্ষ্য রাখলেই একথা বোঝা যাবে। বাস্তবিক পক্ষে নৃত্যের মাধ্যমে এ দুটি ঠিকমতো প্রকাশযোগ্য নয় (সেইজন্যেই তো নেপথ্যের গান)। বরং এর সুরমাধুরী চোখ দিয়ে দেখার বদলে হৃদয় দিয়ে শোনার উপযুক্ত ! কোনো গানকে নৃত্যে রূপায়িত করবার সময় রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য রাখতেন নৃত্যে গানের ভাব বা রূপটি ঠিকমতো প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। আরো জানা যায় যে, এ সমস্ত গান নৃত্যের কথা ভেবেই রচিত। সুতরাং আঙ্গিকের দিক থেকে নৃত্যনাট্যের এই কথাসামগ্রী বা গান নৃত্যের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

নৃত্যনাট্যের গায়কী বা গায়ন-পদ্ধতি

গীতিনাট্যের গানগুলি অভিনয়ের যোগ্য, অর্থাৎ ভাবানুযায়ী গাইতে হয় বলে আগাগোড়া বাঁধা তালে গাইলে চলে না ; নিখুঁত তালবদ্ধ গানের বশে সর্বদা অভিনয় করতে হলে অভিনয়ে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা দুরূহ হতেই পারে। নৃত্যনাট্যের গানগুলি ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ আগাগোড়া তালে গাইতে হয়। বলা বাহুল্য, নৃত্যের জন্যেই তাল বজায় রাখতে হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে বিনা তালে গাইতে হয়, এমন গানও আছে। বস্তুতঃ নৃত্যনাট্যের গানগুলি (এখানে মনে রাখা দরকার— গানের ও নৃত্যের ছন্দ এক) ছন্দে গাওয়া আবশ্যক, কেননা, নাটকীয়তা বা রস এই ছন্দকেই কেন্দ্র ক'রে প্রকাশিত হয়। যে ছন্দোবৈচিত্র্য বা স্বরতরংগের বৈচিত্র্যের কথা বলেছি, তার মধ্যে এই ইংগিতই রয়েছে যে, ভাবের নানা পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের হৃদয়ভাব

অভিব্যক্ত হয়। তাই, শুধু ছন্দোবৈচিত্র্যই নয়, কী ভাবে লয়ের পরিবর্তন ঘটে, কোন্ লয়ে ভাবটি ঠিকমতো ফুটে উঠতে পারে অর্থাৎ লয়-চেতনাও নৃত্যনাট্যের গানের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। ছন্দোবৈচিত্র্যের সংগে ওতপ্রোতভাবে লয়-বৈচিত্র্যের প্রশ্নটিও জড়িত। কোন্ গান কী লয়ে গাইতে হয়, সে সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক, নচেৎ রসাভাস ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

ক. হে বিদেশী এসো এসো

খ. আহা এ'কী আনন্দ

এ দুখানি গানই ঝাঁপতালে (১২।১২৩॥ ১২।১২৩॥) অর্থাৎ ছন্দ এক। কিন্তু লয়ের পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম গানটিতে প্রথম মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে বা দ্রুত লয়ে গাইলে চলবে না। ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে মধুর ভাবে গেয়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় গানটি আবার বিলম্বিত লয়ে গাইলে চলবে না ; প্রত্যেক মাত্রার প্রথমে ঝোঁক দেওয়া দরকার। সমস্তটাই অবশ্য নির্ভর করে সৌন্দর্যানুভূতির উপর ; বলা বাহুল্য, সর্বত্রই পরিবেশ ও গানের ভাবকে অনুসরণ করা দরকার। তুলনামূলকভাবে আর একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা গেল :

ক. ফিরে যাও, কেন ফিরে যাও (শ্যামা)—ঝাঁপতাল

খ. আমি তোমারে করিব নিবেদন (চিত্রাঙ্গদা) „

গ. ওরে পাষাণী কী নিঠুর মন তোর (চণ্ডালিকা) „

তিনটি গানেরই ছন্দ এক। কিন্তু লয়ের পার্থক্য রয়েছে। প্রথম গানটি মধ্য লয়ে, দ্বিতীয় গানটি বিলম্বিত লয়ে এবং তৃতীয় গানটি একটু দ্রুত লয়ে গাওয়া উচিত। ভাবকেন্দ্রিক বলেই উল্লাসের বা* উদ্দীপনামূলক গানে (যেমন, ওরে ঝড় নেমে আয়, স্বপ্ন মদির নেশায় মেশা, সন্ত্রাসের বিহ্বলতা, হো এল এল এলরে,

ইত্যাদি) কখনো বিলম্বিত লয় ব্যবহৃত হয় না। তেমনি করুণরসাত্মক গানেও (যেমন, হে ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমিতে পারিলাম না যে, ইত্যাদি) দ্রুত লয় আসতে পারে না। মাঝে মাঝে একই গানের লয়েরও বৈচিত্র্য এসেছে, যেমন—'আহা মরি মরি' গানটি। এই গানের 'শীঘ্র যা' লো সহচরী বলগে নগর পালে মোর নাম করি' অংশটুকু দ্রুত লয়ে, কিন্তু প্রথম অংশের মতো বাকী অংশটুকুও বিলম্বিত লয়ে গেয়।

এই দিকে লক্ষ্য রেখে গায়ন-পদ্ধতির দিক থেকে নৃত্যনাট্যের গানের লয় নির্দেশ করা গেল। স্বরবিতানে তালের নির্দেশ দেওয়া আছে, এক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

ক. চিত্রাঙ্গদা :

প্রথম দৃশ্য— মোহিনী মায়া এল— মধ্য
গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ— দ্রুত
আহা কী দুঃসহ স্পর্ধা—মধ্য (প্রথম চরণে ঝোঁক)
অর্জুন ! তুমি অর্জুন— দ্রুত
হাহা হাহা, হাহা হাহা বালকের দল— দ্রুত
হা হতভাগিনী, একী অভ্যর্থনা— বিলম্বিত
বেলা যায় বহিয়া— মধ্য
থাক্ থাক্ মিছে কেন— মধ্য
ওরে ঝড় নেমে আয়— দ্রুত

এই দৃশ্যের গানগুলি ৪ মাত্রার। লয়ের দিক থেকে দুটি গানে বৈচিত্র্য রয়েছে :

১. অর্জুন ! তুমি অর্জুন ! }
ফিরে এসো ফিরে এসো } দ্রুত

ক্ষমা দিয়ে কোর না অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান!
বীর হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব— } মধ্য

অর্জুন! তুমি অর্জুন!— বিলম্বিত

২. 'বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে' গানটির গায়কীও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই গানটির প্রথম চরণ (বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে) প্রথমে বিলম্বিত বিনাতালে গাইবার পর দ্রুততালে সুরু হয়। তেমনি 'অস্ফুট মঞ্জরি'-সংশ্লিষ্ট চরণ দুটি প্রথমে বিলম্বিত লয়ে গাইবার পর পুনরায় দ্রুত লয়ে গাইতে হয়। শেষে আবার 'বঁধু কোন্ আলো' চরণটি বিলম্বিত লয়ে শেষ করতে হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য— যাও যাও যদি যাও তবে—মধ্য
ক্ষণে ক্ষণে শুনি অতল জলের আহ্বান—মধ্য

এই গানটির 'ঢেউ দিয়েছে জলে' অংশ থেকে শেষ অংশটুকু দ্রুত লয়ে গাইতে হয়।

দে তোরা আমায়—মধ্য
বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে—মধ্য
আমি তোমারে করিব—বিলম্বিত
ক্ষমা করো আমায়— "
রোদনভরা এ বসন্ত— "
তোমার বৈশাখে ছিল—মধ্য
আমার এই রিক্ত ডালি—মধ্য
মণিপুর নৃপ দুহিতা তোমারে চিনি—মধ্য
পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা—মধ্য
তাই আমি দিনু বর—মধ্য

এই দৃশ্যেও মূলতঃ ৮ মাত্রায় তালই বেশি ব্যবহৃত। 'আমি তোমারে করিব নিবেদন' গানটি ঝাঁপতালে। চিত্রাঙ্গদা ও সখীদের গান দুটির ('রোদনভরা এ বসন্ত' এবং 'তোমার বৈশাখে ছিল') ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ৪ মাত্রার ও ৭ মাত্রার (তেওড়া) তালের সংঘাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। নৃত্যনাট্যের এই ছন্দোবৈচিত্র্যের কথাই আগে উল্লেখ করেছি। ভাবের দ্বন্দ্ব এইভাবেই ছন্দে রূপায়িত হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য।—এই দৃশ্যের প্রথম গান "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি" এর লয়—বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। 'বাতাসে যায় ভাসি' পর্যন্ত অংশ ঢিমে লয়ে পরবর্তী 'সহসা মনে জাগে আশা' থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রুত লয়ে। সবশেষে পুনরায় বিলম্বিত লয়ে প্রথম চরণ গেয়ে গানটি শেষ করতে হয়।

তাছাড়া অন্যান্য গানগুলি, যেমন—

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা—দ্রুত
এরে ক্ষমা করো—মধ্য
কাহারে হেরিলাম—বিলম্বিত
এসো এসো যে হও—মধ্য
তুমি অতিথি— ”
পাণ্ডব আমি অর্জুন— ”
কোন্ ছলনা এযে—দ্রুত
কোন্ দেবতা সে—মধ্য
অশান্তি আজ হানল—দ্রুত

চতুর্থ দৃশ্য :

ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন—মধ্য

না না, সখী ভয় নেই—মধ্য (অপেক্ষাকৃত দ্রুত)
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা—মধ্য
কেনরে ক্লান্তি আসে—বিলম্বিত, শেষের দুটি চরণ দ্রুত লয়ে গেয়
হো, এল এল এলরে—দ্রুত
জনপদবাসী শোনো শোনো—অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত
সন্ত্রাসের বিহ্বলতা—দ্রুত
কী ভাবিছ নাথ —বিনা তালে
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী —বিলম্বিত
ছি ছি কুৎসিত কুরূপ সে—মধ্য
আগ্রহ মোর অধীর অতি—দ্রুত
নারীর ললিত লোভন লীলায়—মধ্য
যদি মিলে দেখা —দ্রুত
ভাগ্যবতী সে যে —মধ্য

পঞ্চম দৃশ্য

লহো লহো ফিরে লহো —দ্রুত
তাই হোক তবে তাই হোক—মধ্য
বিনা সাজে সাজে —মধ্য

ষষ্ঠ দৃশ্য :

এসো এসো পুরুষোত্তম —মধ্য
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজনন্দিনী—বিলম্বিত[১৮]
ধন্য ধন্য আমি —বিনা তালে
তৃষ্ণার শান্তি —দ্রুত

এই দৃশ্যের শেষ গানটিতে (এসো এসো বসন্ত) লয়-বৈচিত্র্য রয়েছে :

এসো এসো বসন্ত— বিলম্বিত
আনো গন্ধমদভরে— মধ্য
এসো থর থর কম্পিত— বিলম্বিত
এসো বিকশিত উন্মুখ— দ্রুত
এসো অরুণ চরণ কমলবরণ— বিলম্বিত
এসো মঞ্জীর গুঞ্জর— মধ্য
এসো সুন্দর যৌবন বেগে— দ্রুত

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই নৃত্যনাট্যের গানে ৪ মাত্রার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে কি মণিপুরী (নৃত্যের) চার তালের প্রভাব পড়েছে ?

[খ] 'শ্যামা' :—

প্রথম দৃশ্য : তুমি ইন্দ্রমণির হার—মধ্য
না না না বন্ধু— „
ও, জান নাকি — „
জানি জানি, তাইতো— „
'থামো থামো কোথায় চলেছ'— } দ্রুত
থেকে 'বৃথা কোরো না' — }

লক্ষ্য করা দরকার ; দ্রুত লয়ে হলেও বজ্রসেনের অংশ কোটালের মতো ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করা সংগত নয়। এর পরেই বজ্রসেনের গানটির প্রথম চরণ 'এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে' মধ্য লয়ে, কিন্তু বাকী অংশটুকু ঝোঁক দিয়ে দ্রুত লয়ে গাওয়াই বিধেয়। এই দৃশ্যের শেষ গান কোটালের 'ভালো ভালো তুমি দেখবো পালাও কোথা' মধ্য লয়ে গেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য : হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব—বিলম্বিত, বিনা-তালেও গাওয়া চলে।

ফিরে যাও কেন —মধ্য
মায়াবন বিহারিণী হরিণী — „
হতাশ হয়ো না, হয়ো না —মধ্য, অপেক্ষাকৃত দ্রুত
হবে সখা হবে তব —মধ্য
জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা—মধ্য
ধরা সে যে দেয় নাই —মধ্য, অপেক্ষাকৃত দ্রুত
ধর্ ধর্ ঐ চোর ঐ চোর —দ্রুত
আহা মরি মরি —বিলম্বিত
মাঝের 'শীঘ্র যালো সহচরী যালো' দ্রুত লয়ে গেয়।
সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে—মধ্য

এদিক থেকে শ্যামার 'তোমাদের একি ভ্রান্তি' বৈচিত্র্যপূর্ণ :

তোমাদের একি ভ্রান্তি }
কে ঐ পুরুষ দেব কান্তি } মধ্য

প্রহরী, মরি মরি।—বিলম্বিত

এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে }
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে } —বিলম্বিত

বন্দী করেছ কোন্ দোষে।—দ্রুত

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে —মধ্য
নির্দোষী বিদেশীর রাখো — „
রাখিব তোমার অনুনয় — „
এ কী খেলা হে সুন্দরী —বিলম্বি
নহে নহে এ নহে কৌতুক —মধ্য
রাজার প্রহরী ওরা — „

ন্যায় অন্যায় জানিনে	—মধ্য
এতোদিন তুমি সখা	— ”
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া	— ”
তোমার প্রেমের বীর্যে	— ”
প্রহরী, ওগো প্রহরী	—দ্রুত
তুমিই করেছ তবে চুরি	
এই দেখ রাজ অঙ্গুরী	
বুক যে ফেটে যায়	—বিলম্বিত
নাম লহো দেবতার	—মধ্য ; উচ্চারণে ঝোঁক
থাম্‌রে থাম্‌রে তোরা	—দ্রুত
চুপ করো দূরে যাও	— ”
কোন্‌ অপরূপ স্বর্গের আলো	— ”

তৃতীয় দৃশ্য :

বাজে গুরু গুরু	—মধ্য
হে বিদেশী এসো	— ”
আহা এ কী আনন্দ	—দ্রুত
বোলো না বোলো না	— ”
জেনো প্রেম চিরঋণী	—মধ্য
প্রেমের জোয়ারে	—দ্রুত
হায় হায়রে পরবাসী	—বিলম্বিত

চতুর্থ দৃশ্য :

পুরি হতে পালিয়েছে	—মধ্য
রাজভবনের সমাদর ছেড়ে	— ”
দাঁড়াও, কোথা চল	—দ্রুত, উচ্চারণে ঝোঁক
আমরা আহিরিণী	—মধ্য

কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি —মধ্য
হৃদয় বসন্ত বনে যে মাধুরী — „
কহো কহো মোরে — „
নহে নহে নহে, সে কথা —দ্রুত
নীরবে থাকিস —মধ্য
কী করিয়া সাধিলে — „
তোমা লাগি যা' করেছি —বিলম্বিত, ভাঙা তালে
কাঁদিতে হবে রে —মধ্য
হে ক্ষমা করো— প্রথম চরণ বিনাতালে, শেষাংশ মধ্য লয়ে
এ জন্মের লাগি —দ্রুত

এর পরেই শ্যামার "তোমার কাছে দোষ করি নাই" গানটি বৈচিত্র্যপূর্ণ :

তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই। } বিলম্বিত

দোষী আমি বিধাতার পায়ে,
তিনি করিবেন রোষ—
সহিব নীরবে। } বিলম্বিত

তুমি যদি না করো দয়া— দ্রুত
সবেনা সবেনা সবেনা। — বিলম্বিত

অর্থাৎ গানটিকে ভাঙা তালের গান বলা যায়।

তবু ছাড়িবি নে মোরে— দ্রুত
ছাড়িব না ছাড়িব না— বিলম্বিত
হায় এ কী সমাপন— বিলম্বিত বা বিনা তালে
তোমায় দেখে মনে লাগে— মধ্য
ও' কথা কেন নেয় না— „

এসো এসো, এসো প্রিয়ে— বিলম্বিত
হায়রে, হায়রে নূপুর— মধ্য
সব কিছু নিল না— „
এসো এসো, এসো প্রিয়ে— বিলম্বিত
এসেছি প্রিয়তম— মধ্য
কেন এলি, কেন এলি— দ্রুত
ক্ষমিতে পারিলাম না যে— বিলম্বিত

এই দৃশ্যের শেষ গানে (ক্ষমিতে পারিলাম না) ঝম্পক তাল ব্যবহৃত হয়েছে। এই শেষ গানটি বিনা তালে গাইলেই ভালো হয়।

(গ) চণ্ডালিকা :

এই নৃত্যনাট্যের প্রথম গানটি মধ্য লয়ে গেয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'আমার মালার ফুলের দলে আছে' গানটির ছন্দ তাল ফেরতা, যথাক্রমে দাদরা ও কাহারবাতে রচিত। গানটির লয় যথাক্রমে :

আমার মালার ফুলের……গন্ধে তার গুঞ্জরে—মধ্য
আন্ গো ডালা……আয় তোরা আয়—দ্রুত
মালা পর গো……বঞ্জুল মঞ্জুরী—বিলম্বিত
চন্দ্র করে অভিষিক্ত……দুলে দুলে গো—দ্রুত

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ৪ মাত্রার ছন্দের লয় দ্রুত হয়ে পড়েছে।

দই চাই গো দই চাই—মধ্য
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি—দ্রুত
ওগো তোমরা যত পাড়ার—মধ্য

অন্য দুটি নৃত্যনাট্যের তুলনায় চণ্ডালিকার গানগুলির লয়ে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে অর্থাৎ বৈচিত্র্য বেশি। এখানে ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ভাব রূপান্তরিত, তার সংগে সমতা রাখার জন্যই গানগুলির গায়কী সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার। যেমন—

যে আমারে পাঠালো এই
অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে,
পূজিব না — বিলম্বিত

কেন দিব ফুল, কেন দেব ফুল
কেন দেব ফুল আমি তারে— — দ্রুত

যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্‌কারে। — বিলম্বিত
জানিনা হায়রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দির দ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া — বিলম্বিত
দেবতা ছলনা করিয়া
আঁধারে রাখিল আমারে॥

এর পর মা-র গান—'কী যে ভাবিস তুই অন্য মনে', গানটি দ্রুত লয়ের উপযোগী। কিন্তু ঝোঁক দিয়ে গাওয়া আবশ্যক। যেমন—

কী যে ভাবিস্ তুই অন্য মনে
নিষ্কারণে
বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।.........ইত্যাদি।

এর পরেই প্রকৃতির গানটি আগের গানের থেকে অপেক্ষাকৃত কম লয়ে বা মধ্য লয়ে গাইতে হয়, তবু সামান্য বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন—

কাজ নেই কাজ নেই মা
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়। — মধ্য
যাক্ ভেসে যাক্—বিলম্বিত

যাক্ ভেসে সব বন্যায়।—এই অংশের "যাক্"-এর উচ্চারণে ঝোঁক দেওয়া বিধেয় এবং লয়ও অপেক্ষাকৃত দ্রুত হওয়া সঙ্গত। এই দৃশ্যের বাকী গানগুলির লয় যথাক্রমে :

থাক্ তবে থাক্ তুই—দ্রুত, উচ্চারণে ঝোঁক
জল দাও, আমায় জল দাও—বিলম্বিত
ক্ষমা করো প্রভু—দ্রুত
যে মানব আমি—মধ্য
কল্যাণ হোক তব—বিলম্বিত
শুধু একটু গণ্ডুষ জল……সমুদ্র—মধ্য
এই যে নাচে……গণ্ডুষ জলে ॥—দ্রুত
মাটি তোদের ডাক দিয়েছে—দ্রুত
ওগো ডেকো না মোরে—মধ্য

ফুল বলে, ধন্য আমি—মধ্য
তুই অবাক করে দিলি—দ্রুত
হ্যাঁ মা আমি বসেছি—বিলম্বিত
তোর সাধনা—দ্রুত
যে আমারে দিয়েছে বাক্
…মোর হৃদয়ে থাক—মধ্য
আমি তারি……খুলে যার পাক।—অপেক্ষাকৃত দ্রুত
কিসের ডাক তোর—দ্রুত
আমার মনের মধ্যে—মধ্য
পোড়া কপাল আমার—দ্রুত

প্রকৃতির 'হ্যাঁ গো মা, সেই কথাই তো বলে গেলেন তিনি' গানটি মূলতঃ ভাঙা ছন্দে গেয়। তাই লয়ও ওঠা-নামা করেছে। এই

গানটির প্রথম দুটি চরণ (হ্যাঁ গো মা···আপন জাতের লোক) মধ্য লয়ে ; 'সে যে মিথ্যা···সে যে দারুণ মিথ্যা' দ্রুত লয়ে। এইভাবে গানটিতে লয়ের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে।

কী যে বলিস্ তুই—দ্রুত

এর পর প্রকৃতির 'এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম' গানটিরও লয়-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম
নতুন জন্ম আমার।—দ্রুত

সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর ;—অপেক্ষাকৃত কম লয়

স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার— } মধ্য

বললেন, জল দাও।—বিলম্বিত

শিউরে উঠল দেহ আমার
চমকে উঠল প্রাণ। ···ইত্যাদি — দ্রুত

গানের আঙ্গিকের দিক থেকে এ ধরণের গানের কী বৈশিষ্ট্য তা আগেই আলোচনা করেছি। সে কথা স্মরণে রেখে এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, ভাবের পরিবর্তনের সংগে সংগে লয়েরও যে পরিবর্তন ঘটে, এই জাতীয় গানের মধ্যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গীতিনাট্যের, বিশেষতঃ বাল্মীকি প্রতিভার মধ্যেও নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তা' এতোখানি ব্যাপক বা গভীর নয়। বস্তুতঃ, গানের মধ্যে দিয়ে নাট্যরস কতো গভীরভাবে ফুটে উঠতে পারে—চণ্ডালিকা গানগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বলে, দাও জল, দাও জল—মধ্য

বাছা, মন্ত্র করেছে,—মধ্য

সে যে পথিক আমার—অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়ে

চক্ষে আমার তৃষ্ণা—মধ্য

বাছা, সহজ করে বল্ আমাকে—মধ্য

আমি চাই তাঁরে— ,,

সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে—(অপেক্ষাকৃত দ্রুত), মধ্য

কেন গো কী চাই— ,,

রানীমার পোষা পাখী— ,,

উড়ো পাখি আসবে ফিরে— ,,

মিথ্যে ওজর শুনব না— ,,

ওগো মা, ঐ কথাই—মধ্য

ওগো সর্বনাশী, কী কথা—মধ্য

প্রকৃতির নিম্নলিখিত গানেও লয়ের পরিবর্তন লক্ষণীয়—

আমি ভয় করি নে মা,
ভয় করি না।— দ্রুত

ভয় করি মা, পাছে
সাহস যায় নেমে — মধ্য

পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।

এতো বড়ো স্পর্ধা আমার
এ কী আশ্চর্য! —দ্রুত

এই আশ্চর্য সেই ঘটিয়েছে—
তারো বেশি ঘটবে নাকি, — মধ্য

আসবে না আমার পাশে,

বসবে না আধো-আঁচলে?

অতঃপর, এই দৃশ্যের অন্যান্য গানগুলি—

তাঁকে আনতে যদি পারি— বিলম্বিত

না, কিছুই থাকবে না—দ্রুত

এই গানটির 'দেবার আমার আছে কিছু এই কথাটাই যে ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে' অংশটুকু মধ্য-বিলম্বিত লয়ে গেয়। বাকী অংশ—'দেবই আমি, দেবই আমি······দিতে কি পারে' পর্যন্ত দ্রুত লয়ে।

বাছা, তুই যে আমার— বিলম্বিত

আমায় দোষী করো— „

কী অসীম সাহস— মধ্য

আমার সাহস, তাঁর সাহসের—মধ্য

ওরা কে যায়— বিলম্বিত

মা, ওই যে তিনি চলেছেন—দ্রুত, মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও ঝোঁক, যেমন—

মা, ওই যে তিনি চলেছেন

সবার আগে আগে।

ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না ······

ওরে বাছা, দেখতে পারি নে— মধ্য

পড়্, তুই সবচেয়ে— দ্রুত, ঝোঁক

আয় তোরা আয়— মধ্য

যায় যদি যাক্ সাগরতীরে— মধ্য

ভাবনা করিস্ নে তুই— মধ্য

ঐ দেখ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো— মধ্য

মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে— হঠাৎ দ্রুত
উড়ে যাবে শুষ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর
শুকনো পাতার মতন।
নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার, — মধ্য-বিলম্বিত
ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে।

দুরু দুরু করে মোর বক্ষ,
মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি
দূরে যেন ফিনিয়ে উঠেছে সমুদ্র—
তল নেই, কূল নেই তার।
মন্ত্র খাটবে মা, মন্ত্র খাটবে। — দ্রুত

এইবার আয়নার সামনে— মধ্য
লজ্জা ছি ছি লজ্জা— দ্রুত
ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি— মধ্য
আমি দেখব না, আমি দেখব না—দ্রুত

'সেই ভালো মা' শুরু দ্রুত লয়ে, মাঝের 'না না না,…আসবে' অংশটুকু বিলম্বিত ও বাকী অংশটুকু মধ্য লয়ে গেয়।

দুঃখ দিয়ে মেটাব— মধ্য
বাছা, মোর মন্ত্র— „

মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাঁহার। — মধ্য

ঐ আসছে, আসছে, আসছে।—বিলম্বিত
বল দেখি বাছা, কী তুই দেখেছিস্— মধ্য
ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,—

চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকে। — বিলম্বিত

অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর
অগ্নির আবেষ্টন,
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি। — দ্রুত

......পুণ্যশিখা

ওরে পাষাণী, কী নিষ্ঠুর— মধ্য (অপেক্ষাকৃত দ্রুত)

ক্ষুধার্ত প্রেম, তার নাই দয়া— মধ্য

—এই গানটির 'ঐ দেখ্, ঐ নদী হয়েছেন পার— একা চলেছেন ঘন বনের পথে।' অংশটুকু বিনা তালে গাওয়া আবশ্যক।

দুর্বল হোস নে— দ্রুত

জাগে নি এখনো জাগে নি— দ্রুত

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান— মধ্য

ঘুমের ঘন গহন হতে— মধ্য

আর দেরী করিস্ নে— বিলম্বিত

না, দেখব না আমি দেখব না
আমি শুনব— — মধ্য

মনের মধ্যে আমি শুনব,
ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব
তাঁর চরণধ্বনি। — বিলম্বিত

ঐ দেখ্ এল ঝড় এল ঝড়
তাঁর আগমনীর ঐ ঝড়,—
পৃথিবী কাঁপছে থরো থরো থরো থরো,
গুরু গুরু করে মোর বক্ষ। — দ্রুত

তোর অভিশাপ .... দ্রুত (মধ্য)

অভিশাপ নয় নয় .... দ্রুত

······ ওগো আমার সর্বনাশ
······অপমানের চূড়ায় } বিলম্বিত

ও নিষ্ঠুর মেয়ে—মধ্য
ওমা, ওমা, ওমা ······ এখনি— দ্রুত
ও রাক্ষসী ·········গভীর— মধ্য
যাক্ যাক্ যাক্·········বীরের— দ্রুত
জয় হোক তাঁর·········জয় হোক— মধ্য
প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়
··········এত দুঃখ। বিলম্বিত

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে
··········জয় হোক। দ্রুত

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই নৃত্যনাট্যে এই তালগুলি ব্যবহৃত হয়েছে—দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, তেওড়া। তবে যেভাবে গায়কীর নির্দেশ করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যাবে—প্রায়শঃই তালগুলি ভেঙে গাইতে হয়; লয়ের তারতম্যের জন্যেও ছন্দোবৈচিত্র্য ঘটেছে। বলা বাহুল্য, এখানেও ছন্দোবৈচিত্র্যের মধ্যে নাটকীয়তা আনা হয়েছে।

লয় ও ছন্দোবৈচিত্র্যের দিক থেকে নৃত্যনাট্যগুলির নাট্যধর্ম উত্তরোত্তর কীভাবে বেড়েছে তাও বিচার্য বিষয়। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মোট ৬টি দৃশ্যে বিভক্ত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—দৃশ্যবন্ধে শৈথিল্য রয়েছে এবং নাটকীয়তা নয়, গীতিরসই অপেক্ষাকৃত প্রাধান্যলাভ করেছে। বিশেষতঃ এর কাহিনীর মধ্যেই এই গীতিরসের বীজ রয়েছে, গানগুলি তারই অনুসঙ্গী। সেই-জন্যেই দেখতে পাচ্ছি এই নৃত্যনাট্যের ছন্দ ও লয় কোথাও কোথাও

তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্য লাভ করলেও, ভাবের ও লয়ের পরিবর্তন তত দ্রুত বা আকস্মিক নয়। সুরের মধ্যেও প্রধানতঃ ঐ গীতিরসই আস্বাদ করা যায়।[১৯] এখানে নাট্টীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে রূপবিমুগ্ধ যৌবনাবেগ পার হয়ে পরিণামে প্রেমের সহজ স্বীকৃতি নিয়ে;—যে প্রেম একান্তভাবে রূপরাগের মায়ামন্ত্রে বন্দী নয়, মহনীয় মানবিক চরিত্রে—আত্মদানে ও আত্মপ্রত্যয়ে যার নির্ভর। কুরূপ থেকে সুরূপের রূপান্তর ঘটাবার জন্যে এক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করতে হয়েছে বটে কিন্তু আসল সত্য কী? রূপের সত্য বা প্রকাশ শুধুমাত্র আপেক্ষিকই নয়, মানসিক অর্থাৎ নির্বস্তুও বটে। আবার বাইরের রূপটাই একমাত্র সত্য নয় বলে ভিতরের রূপেরও সন্ধান করতে হয়। বরং ভিতরের বা অন্তরের ঐ রূপই সত্য। সে রূপ তো বাইরে থেকে দেখা যায় না। 'ফাল্গুনী'র বাউল চোখ দিয়ে দেখতে পায় না বলেই 'সব' দিয়ে দেখে। তার কাছে বাইরেটা আবৃত হয়ে গেছে বলেই তো ভিতরের দুয়ার খুলে গেছে। চিত্রাঙ্গদারও সেই ভিতরের রূপটি অনুভব করতে হয়েছে অর্জুনকে। যা নিতান্তই মানসিক ব্যাপার— তাকে বাহ্যিক রূপ দেবার জন্যেই অমনি এক অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করতে হল। অর্থাৎ এখানে সমস্ত নাটকটি একটি কল্পনাময় স্ফটিকের সৌন্দর্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবতঃ, মণিপুরী নৃত্যধারার প্রভাব পড়ে থাকবে এই নৃত্যনাট্যের রূপকল্পনাময়, কেননা মণিপুরী নৃত্যও মূলতঃ ব্যঞ্জনাপ্রধান বা গীতিরস প্রধান। এইজন্যেই বলছি, এই নৃত্যনাট্যে নাট্যরসের চেয়ে গীতিরসের অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য রয়েছে।

শ্যামা নৃত্যনাট্য চরিত্র-চিত্রনের দিক থেকে যেমন, তেমনি কাহিনীর নাট্যধর্মের দিক থেকে সার্থক সৃষ্টি। এই নৃত্যনাট্য ছন্দ ও লয়ের দিক থেকে চিত্রাঙ্গদার থেকে আরো নাটকীয়। অবশ্য

লয়ের বৈচিত্র্য এখানে খুব বেশি নেই। বরং ছন্দোবৈচিত্র্যে এবং কাহিনীর অনিবার্য পরিণতির পথে নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে; দৃশ্য বিন্যাসেও (মোট ৪টি দৃশ্য) বিশেষ শৈথিল্য চোখে পড়ে না। সামান্য ত্রুটি বা দুর্বল অংশ একেবারে নেই তা নয়, যেমন— দ্বিতীয় দৃশ্যে উত্তীয়কে নিয়ে কোটালের প্রস্থানের পর সখীর 'বুক যে ফেটে যায়' এবং উত্তীয়কে হত্যার পর সখীর 'কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো' গান দুটি। নাটকীয়তার দিক থেকে এ গান দুটি অপ্রয়োজনীয়। আর একটি দুর্বল অংশ রয়েছে চতুর্থ দৃশ্যে। বজ্রসেন জানতে চেয়েছে শ্যামার কাছে কীভাবে সে মুক্ত হয়েছে। শ্যামা বলেছে 'নহে নহে সেকথা এখন নহে।' ঠিক সেই মুহূর্তেই সহচরী বলেছে 'নীরবে থাকিস সখী।' এখানে বজ্রসেনের উপস্থিতি আদৌ যুক্তিসঙ্গত কিনা ভেবে দেখার বিষয়। পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অংশটিকে শ্যামা নৃত্যনাট্যের দুর্বল অংশ বলে স্বীকার করা উচিত। এই সামান্য 'ত্রুটি'-রূপে যা প্রতিভাত, তা ছাড়া অন্যান্য অংশ অনিবার্যভাবেই পরিণতির দিকে ধাবমান। ছন্দো-বৈচিত্র্যের মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

এদিক থেকে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য অনন্য; পূর্ববর্তী নৃত্যনাট্য দু'খানির তুলনায় অনেক বেশি নাটকীয়— ছন্দের ও লয়ের দ্রুত, আকস্মিক ও মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাট্যরস বা নাটকীয়তা আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে দৃশ্যসংহতি (তিনটি দৃশ্য) স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ও ঘনপিনদ্ধ। বাহ্যিক ঘটনার পরিবর্তে অন্তরদ্বন্দ্বজনিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতেই নাটকীয়তা। চরিত্র বলতে দুটি—প্রকৃতি ও মা; তাও আবার এ চরিত্রের বিকাশ বাহ্যিক ঘটনার মধ্যে নয়। প্রকৃতির মনের মধ্যে আবেগের যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে আনন্দকে জলপান করিয়ে, তার পরে সেই মানসিক

আবর্তের মধ্যে দিয়েই পরিণতি এসেছে। বাস্তবিকপক্ষে, এই নৃত্যনাট্যে আবেগ, সুর, ছন্দ ও লয়ের এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে যে, যথার্থ রসবোধ এবং প্রায়োগিক শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারাই কোনো শিল্পীর পক্ষে তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর। অন্য দুটি নৃত্যনাট্যের মেজাজ এত পরিবর্তনশীল নয়। বস্তুতঃ, ছন্দ ও লয়ের বৈচিত্র্যই এই নৃত্যনাট্যের সবচেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য।

এই তিনখানি নৃত্যনাট্যের ছন্দ ও লয়ের বৈচিত্র্য কীভাবে উত্তরোত্তর বেড়েছে তা এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

সুর সমাবেশ

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম দিকে ছন্দের বন্ধন, শেষের দিকে ছন্দের মুক্তি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শেষ পর্বে এই ছন্দোবৈচিত্র্যই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ; নৃত্যনাট্যের গানের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুর-সমাবেশের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে, গীতি-নাট্যের যুগেই মিশ্র রাগ রাগিণীর ব্যবহার রয়েছে। নৃত্যনাট্যের গানেও মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এই মিশ্রণ এক 'নতুন সৃষ্টি'—প্রকরণে ও রূপায়ণে।

সত্যি কথা বলতে কী, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর সমাবেশ নিয়ে অনেকের মধ্যেই একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তার সঙ্গে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন যোগ নেই। সৌভাগ্যবশতঃ, এই অভিমত বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে। ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের উপরই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিত্তি। রাগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটি সুর-সপ্তকের অন্তর্গত কমপক্ষে পাঁচটি স্বরের মধ্যে যদি অলৌকিক ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি হয়, তবে তাকে রাগ বলা যায়। রাগ-সঙ্গীতের নানা লক্ষণ আছে।

সুর-বিন্যাস বা সুর-বিহারই রাগ-সঙ্গীতকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। বলা বাহুল্য, এক একটি রাগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অনুভূতি জাগে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সঙ্গীতের সবচেয়ে বড়ো কথা হল—এক-একটি রাগ-রাগিণীর ভিতর দিয়ে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের স্পন্দন ফুটে ওঠে। ধরা যাক্ ভৈরবী এবং পূরবী-র কথা। দুইই সন্ধি-লগ্নের রাগিণী। প্রথমটিতে দিন সুরু হওয়ার আগমনী, দ্বিতীয়টিতে দিবাবসানের বিজয়ার অনুরণন। এইভাবে যদি রাগ-রাগিণীগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, বস্তুতঃ রাগ-রাগিণী-গুলির মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন হৃদয়ের নানা অনুভূতি রূপায়িত, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের রূপটি উদ্‌ঘাটিত।

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের এই সত্যরূপ অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে। সঙ্গীত সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছেন তিনি, তা থেকে একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে; এখানে তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে রাগের উপর। কিন্তু, তাই ব'লে রবীন্দ্রনাথের গান রাগ-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত নয়। সুতরাং, রাগ-সঙ্গীতের আদর্শে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিচার যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ, পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখানো হয়েছে, ফাল্গুনীর পর্ব থেকেই বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্ব থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রূপান্তর ঘটতে থাকে। গীতাঞ্জলি পর্ব পর্যন্ত দেখবো, সব গানই প্রায় কোনো-না কোনো রাগ-রাগিণীতে রচিত। ধরা যেতে পারে, তখনো পর্যন্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর কাঠামো প্রায় অবিকৃত। কিন্তু তার পরেই দেখতে পাচ্ছি—ধীরে ধীরে বাউল প্রভৃতি বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রবেশ ঘটেছে এবং রাগসঙ্গীত ও এই ধরণের লোক-সঙ্গীতের মিশ্রণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এক 'অপূর্ব' রূপ নিয়েছে। একথা আগেই বলেছি যে, লোক-

সঙ্গীতের, বিশেষভাবে বাউলের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নৃত্যময়তা এবং এই নৃত্যময়তা বা নৃত্যরসে রসায়িত হয়েই শেষ পর্বে রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনন্যতা লাভ করেছে। নৃত্যনাট্যের গানও সম্পূর্ণভাবেই এই চেতনার আলোকে আলোকিত; আঙ্গিকের আলোচনায় তা দেখানো হয়েছে। কাজেই, নৃত্যনাট্যের গানে প্রায়শঃই কোনো রাগ-রাগিণীকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না, সুর বিশ্লেষণের মধ্যে রাগ-রাগিণীর একটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, সংক্ষেপে নৃত্যনাট্যের গানে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করা গেল।[২০]

(ক) চিত্রাঙ্গদা—

মোহিনী মায়া এল— মিশ্র ভৈরব
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ— মল্লার
বঁধু কোন্ আলো— সিন্ধু ভৈরবী
ক্ষণে ক্ষণে— কাফী-টোড়ী
দে তোরা আমায়— মিশ্র ভৈরবী
আমার এই রিক্ত ডালি— মিশ্র খাম্বাজ
মণিপুর নৃপদুহিতা— ইমণ
পুরুষের বিদ্যা — দেশ
তাই আমি দিনু বর— বেহাগ খাম্বাজ
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে— ইমণ বেলাবল
কাহারে হেরিলাম— ভৈরব
কোন্ দেবতা সে — ভৈরব
অশান্তি আজ হানল— হাম্বীর
কেন রে ক্লান্তি— মিশ্র ভৈরবী
যদি মিলে দেখা— কেদারা

ভাগ্যবতী সে যে— মিশ্র ভৈরবী
লহো লহো ফিরে— বাহার
তৃষ্ণার শান্তি— বেহাগ
এসো এসো ধরাতলে— মিশ্র বসন্ত

(খ) শ্যামা—

তুমি ইন্দ্রমণির হার— মিশ্র (বাউল, কীর্তন, ভৈরব)
না, না, না বন্ধু— মিশ্র ভৈরব
ভালো ভালো তুমি— মিশ্র ভৈরব
হে বিরহী হায়— বেহাগ
মায়াবন বিহারিণী হরিণী— ইমণ-কল্যাণ
জীবনে পরম লগন— মিশ্র ভৈরবী
ধরা সে যে দেয় নাই— মিশ্র খাম্বাজ
আহা মরি মরি— ইমণ-কল্যাণ
সুন্দরের বন্ধন— ছায়ানট
তোমাদের একি ভ্রান্তি— বেহাগ
চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে— খাম্বাজ
এ·কী খেলা হে সুন্দরী— পরজ-বসন্ত
রাজার প্রহরী ওরা— কেদারা
ন্যায় অন্যায় জানিনে— পিলু-খাম্বাজ
এতোদিন তুমি সখা— ভৈরবী
আমার জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া— মিশ্র ভৈরব
তোমার প্রেমের বীর্যে— কেদারা
বুক যে ফেটে যায়— কাফী
বাজে গুরু গুরু— কানাড়া
হে বিদেশী— সিন্ধু-খাম্বাজ

আহা একী আনন্দ— আসাবরী-ভৈরবী
রাজ ভবনের সমাদর সম্মান— মিশ্র বসন্ত
দাঁড়াও কোথা চল— খাম্বাজ
হৃদয় বসন্ত বনে যে— ছায়ানট
কাঁদিতে হবে রে— হাম্বীর
হে ক্ষমা কর নাথ— কাফি-সিন্ধু
তোমার কাছে দোষ— মিশ্র বেহাগ
হায় এ কী সমাপন— ভৈরবী
এসো এসো প্রিয়ে— মিশ্র ভৈরবী
ক্ষমিতে পারিলাম না যে— দেশ-মল্লার

(গ) চণ্ডালিকা—

নব বসন্তের ডালি— মিশ্র ভৈরব
ওগো তোমরা যত— কাফি
যে আমারে পাঠালো— মিশ্র বসন্ত
কী যে ভাবিস্ তুই— মিশ্র শংকরা
যে মানব আমি— ভৈরবী
স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল— আড়ানা-বাহার
আমার মনের মধ্যে— ভৈরব
বাছা, মন্ত্র করেছে— কাফি
চক্ষে আমার তৃষ্ণা— মল্লার
তাঁকে আনতে যদি পারি— বেহাগ
বাছা, তুই যে আমার— কেদারা
যায় যদি যাক্ সাগরতীরে— সিন্ধু-খাম্বাজ
ঐ দেখ পশ্চিমে মেঘ— কেদারা
ঘন কালো মেঘ— মিশ্র মল্লার

ওরে পাষাণী— কাফি

ক্ষুধার্ত প্রেম— মিশ্র ভৈরবী-ভৈরবী

দুর্বল হোস্ নে— ভৈরবী

ঘুমের ঘন গহন— মিশ্র বসন্ত

তোর অভিশাপ— ভৈরবী

ও মা, ও মা, ও মা— মিশ্র খাম্বাজ

প্রভু এসেছ উদ্ধারিতে— মিশ্র ভৈরবী

কল্যাণ হোক্ তব— ভৈরবী

— এই তালিকা থেকে দেখা যাবে মূলতঃ ২০টির মতো রাগ-রাগিণীর (প্রায়শঃই মিশ্ররূপে) ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষও প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ২০টি রাগ-রাগিণীই বেশি ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি কীর্তনাঙ্গ ও বাউল ঢঙেরও একাধিক গান রয়েছে এই তিনখানি নৃত্যনাট্যে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গান্তরে বলতে চেয়েছেন যে, গান্ধারের বদলে যদি পঞ্চম অথবা পঞ্চমের বদলে ধৈবত ব্যবহার করলে যদি রস ফুটে ওঠে, তাহ'লে শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘিত হলেও তিনি তারই পক্ষপাতী। অর্থাৎ বদ্ধ সংস্কারের হাত থেকে সঙ্গীতকে মুক্তি দেওয়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। নৃত্যনাট্যের গানে যেভাবে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটেছে, তা থেকে এই কথাই মনে হয় যে, রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টিধর্মী সঙ্গীত-প্রতিভার মৌলিকত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করেছে এই গানগুলি।

এই মিশ্রণের মূল কথা হচ্ছে রাগ-রাগিণীর একটা আভাস রয়েছে বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার রূপ কোনো রাগরূপের থেকে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ এই গানগুলি প্রকৃতির দিক থেকে বিশিষ্ট রাগ-

রাগিণীর প্রকৃতির অনুগ না হয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে। এই জন্যেই অধিকাংশ গানেই রাগ-রাগিণীগুলি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। অথচ এমন ভাবে সেগুলি মিলিত হয়েছে যে, কোথাও ভেদরেখার (জোড়া লাগানোর) চিহ্নমাত্র নেই— সুরপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার সূচনার গানটি (মোহিনী মায়া এল) উল্লেখযোগ্য। গানটিতে যথাক্রমে হাম্বীর, ভৈরব ও ভৈরবী ব্যবহৃত। এই গানটির শেষ অংশে (এসো সুন্দর নিরলঙ্কার······স্বপ্নের দুর্গ হানো) ভৈরব ও ভৈরবী যেভাবে সূক্ষ্ম নিপুণতার সঙ্গে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এই জাতীয় মিশ্রণের দৃষ্টান্ত বহন করছে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার প্রথম গানটি। এই গানটিতে যুগপৎ ভৈরব-ভৈরবী (আমার মালার ফুলের) এবং কাফি-সিন্ধু (মালা পর্ গো পর্) ব্যবহৃত হতে দেখি। তেমনি শ্যামা নৃত্যনাট্যের প্রথম গানটি একদিকে বিচার করলে বাউল ঢঙের। বজ্রসেন পথিক— পথ দিয়ে চলেছে, এই পরিবেশের সংগে মিলিয়ে বাউলের কথা মনে হওয়া সঙ্গত, সুরেও তার মেজাজটি ফুটে উঠেছে, আবার অন্যদিকে বিভাসেরও আভাস পাওয়া যায়, যদিও 'চিরদিনের মতো তুমি'তে (পা পা— দা। দা নদা-পা। পা দা - া। পা মা - া।) ভৈরবের স্পর্শ রয়েছে। একদিক দিয়ে গানটি ভৈরবঙ্গের বলা যায়, আবার ভঙ্গির দিক থেকে বাউলঙ্গ। 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা'তে ভৈরব ও ভৈরবী দুইই ব্যবহৃত। এই গানে ভৈরবীর মূল বৈশিষ্ট্য (কোমল ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ এবং শুদ্ধ মধ্যম) বজায় আছে, কিন্তু সেই সংগে ভৈরবের শুদ্ধ ঋষভও ব্যবহৃত। যেমন—

র্ঋা — া জ্ঞা	র্ঋা জ্ঞা র্ঋর্সা।
শূ ০ ন্যে	চাও য়া ০ য়্ ···

এই গানটির মতো চণ্ডালিকার 'ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া' গানটিতে ভৈরব ও ভৈরবীর মিশ্রণ ঘটেছে। এদিক থেকে চণ্ডালিকার 'ঘন কালো মেঘ' ও 'সেই ভালো মা সেই ভালো' গান দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম গানটিতে কাফির সঙ্গে মল্লার মিশেছে। দ্বিতীয় গানটি মূলতঃ ইমণ-ভূপালীতে হলেও শেষ অংশে (নিবিড় রাতে এসে……সে আসবে) কীর্তনঙ্গ। 'ফুল বলে ধন্য আমি' গানটি মূলতঃ পূরবীতে (মিশ্র) হলেও এখানে কোমল ঋষভের পরিবর্তে শুদ্ধ ঋষভ ব্যবহৃত। এই গানটিতে একদিকে যেমন দুই মধ্যম রয়েছে, তেমনি আবার কোমল ধৈবতের সঙ্গে শুদ্ধ ধৈবতও ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য পূরবীতে শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার অপ্রচলিত নয়, তবে রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ শুদ্ধ ধৈবতই ব্যবহার করেছেন।

তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এই মিশ্রণের আবার তারতম্য রয়েছে। চিত্রাঙ্গদার মধ্যে অপ্রত্যাশিত মিশ্রণের তেমন দৃষ্টান্ত নেই, 'শ্যামা'র মধ্যে তার অপ্রতুল না থাকলেও তার বহু ব্যাপকভাবে প্রয়োগ রয়েছে 'চণ্ডালিকা'য়। বাস্তবিকপক্ষে নৃত্যনাট্যের, বিশেষভাবে চণ্ডালিকার, গানগুলির বিশ্লেষণে দেখা যাবে— বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এক বা একাধিক রাগ-রাগিণীর আভাস পাওয়া যায় মাত্র। নৃত্যনাট্যের গানের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কোনো রাগ-রাগিণীকে পাচ্ছি না। এর কারণ কী? প্রথম জীবনে গীতরচনায় দুটি প্রবণতা ছিল। এক, বিশেষ রাগ-রাগিণীকে গানে বসানো, দুই, বিশেষ গানের আদর্শে গান রচনা। সেইজন্যেই ঐ গীতধারার মধ্যে নির্দিষ্ট রাগরূপটি চোখে পড়ে। তার পরেই ধীরে ধীরে বৈচিত্র্য বেড়েছে। কবির সক্রিয় মনের অজ্ঞাতসারেই তাঁর অবচেতন মনে প্রথম জীবনে শিক্ষালব্ধ রাগরাগিণীগুলি সংস্কাররূপে বিরাজমান ছিল। পরবর্তী-

কালে গান রচনার সময় এই সংস্কারই স্বভাবে সংগত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে গানগুলি সর্বদাই ভাবরসের সংগে সংগতি রেখে উপযুক্ত রাগরাগিণীকে আশ্রয় করেছে। অর্থাৎ কোনো গান বিশেষ রাগরাগিণীতে রচনা করার কথা সচেতনভাবে না ভাবলেও স্বতোৎসার সুরপ্রবাহ সুষ্ঠু রাগরাগিণীরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে; নৃত্যনাট্যের সুর সমাবেশ কূলপ্লাবিত করে নিরাকারে হারিয়ে যায়নি — এমন আকার পেয়েছে যা স্বাভাবিক, যা নিত্যনতুন হয়েও চির পুরাতন।

সবচেয়ে বড়ো কথা, নৃত্যনাট্যের গানগুলি বিশেষ গানের বা রাগের আদর্শানুসরণের ফল নয় বলেই[২১] রাগরাগিণীর বাঁধা অনুশাসনের দিকে কবির সচেতন দৃষ্টি নেই। তাই রাগরাগিণীগুলি যেমন সহজেই মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, তেমনি নিরপেক্ষভাবে গানের বিভিন্নভাবের উপযোগী হয়ে উঠেছে। তাই দেখতে পাচ্ছি 'মণিপুর নৃপদুহিতা'র মতো গানে যেমন ইমণ ব্যবহৃত, তেমনি 'হো এল এল এলরে'-র মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের গানেও তার আভাস রয়েছে। গীতিনাট্যের গানেও অবশ্য দেখেছি—শুধুমাত্র ছন্দ ও লয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে কীভাবে রাগরাগিণীগুলোকে ইচ্ছামতো নাট্য-প্রয়োজনে খেলানো হয়েছে। নৃত্যনাট্যের মধ্যেও অনুরূপ প্রবণতা রয়েছে, তবে আরো সার্থকরূপে। নৃত্যনাট্যের বেশির ভাগ গানে ভৈরব বা ভৈরবী ব্যবহৃত। লক্ষ্য করা দরকার— তা ভাবনিরপেক্ষ হয়েই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'কাহারে হেরিলাম' এবং 'কোন্ দেবতা সে'—দুটি গানই ভৈরবে রচিত। 'এস এস বসন্ত ধরাতলে'-র মতো গানে যেমন বসন্ত ব্যবহৃত, তেমনি 'যে আমারে পাঠালো এই অপমানের অন্ধকারে' গানটিতেও তার

আভাস রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই দুটি গানের ভাব এক নয়। তেমনি, 'হে বিরহী হায়' ও 'নাম লহো দেবতার' মতো ভিন্নধর্মী গানে বেহাগের ব্যবহার এতটুকু বিসদৃশ হয়নি। অন্যান্য গানেও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই, একথা বলা ভুল হবে না যে, ভারতের চিরায়ত সঙ্গীতের আত্মাকে (spirit) রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভা এমন করেই আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে যে, শুধু ছন্দ ও লয়ের বৈচিত্র্যের দ্বারাই অভাবিত (অ-চিন্তিত) প্রক্রিয়ায় একই রাগরূপ বিভিন্ন এমন কি বিপরীত রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে, এই সব গানের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যদি বলি বাউল ও কীর্তনের (বা বাংলা লোকসংগীতের) প্রাণশক্তি দ্বারা বিধৃত, তাহলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। আগেই এ বিষয়ে ইংগিত দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের আলোচনা প্রসংগে কাব্য-সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। এমন কি পারসীয় সংগীতের কথা বলতে গিয়েও বাংলা গানের কথা ও সুরের ঐকান্তিক যোগাযোগের কথা বলেছেন।[২২] রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে বাংলা গানের এই বিশিষ্ট প্রবণতাটি সযত্নে রক্ষা করেছেন। বাংলা গানের বিভিন্ন আদর্শকে কীভাবে তিনি প্রথম যুগের গীতিনাট্যে গ্রহণ করেছিলেন, তা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। সেকালে তিনি যখন হিন্দীগানের আদর্শানুসরণ করেছেন, তখনও কখনোই হুবহু অনুকরণ করেননি। অর্থাৎ, বাংলা গানের গীত-প্রকৃতির প্রেরণায় আর স্ব-ভাবের বশে রবীন্দ্রসংগীত আপন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে নিয়েছে। অবশ্য বাংলা গানের অভিধার্থটি এখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যুক্তিসংগত বলে মনে করছি না। বরং বাংলা সংগীত, বিশেষতঃ বাউল, এবং কীর্তনের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে দেখলে ভালো হয়। গীতধারা হিসেবে কীর্তন ও বাউলের মূলকথা হচ্ছে

নাটকীয়তা ও নৃত্যময়তা। বাউল এবং কীর্তনকে রবীন্দ্রনাথ যে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। কীর্তন সম্বন্ধে তার বক্তব্য হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ।[২৩] তিনি বাউল সম্বন্ধে বলেছেন, "......যে-রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলেছে"। আসলকথা "প্রাণের সংগে যোগ না থাকলে বড়ো শিল্পও টিকতে পারে না।"[২৪] বাংলার জীবনের সংগে কীর্তন ও বাউলের (বাংলা লোকসংগীতের) প্রাণের যোগ আছে ব'লে তা যেমন এতো প্রাণবন্ত, তেমনি কীর্তন ও বাউলের সংগেও রবীন্দ্র-সংগীতের 'প্রাণের যোগ' রয়েছে। শেষ পর্বে এই যোগ প্রকট হয়ে উঠেছে। সেইজন্যেই রাগরাগিণীর সংগে এই দুটি ধারার একাত্ম মিলনের ফলে এক অভূতপূর্ব বিশিষ্ট গীত-প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। নৃত্যনাট্যের গীতরূপেরও এইটেই মূলকথা।

নৃত্যনাট্যের গানে সামগ্রিকভাবে কীর্তন ও বাউলের এই অন্তর্নিহিত বা অন্তঃশীল প্রভাব ছাড়া, স্বতন্ত্রভাবেও ওই দুটি ঢংয়ের অসংখ্য গান রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নলিখিত গানগুলি উল্লেখ করা গেল :

(ক) 'চিত্রাঙ্গদা'—

ওরে ঝড় নেমে আয়—	কীর্তনাঙ্গ
রোদনভরা এ বসন্ত—	"
আমার এই রিক্ত ডালি—	"
ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশনে—	"
তোমার বৈশাখে ছিল—	"
না, না, না সখী—	"
লহো লহো ফিরে—	"

বিনা সাজে সাজি— কীর্তনঙ্গ
তাই হোক তবে তাই হোক— „

(খ) ‘শ্যামা’—

এই পেটিকা আমার— কীর্তনঙ্গ
পুরী হতে পালিয়েছে— „
তোমায় দেখে মনে লাগে— „
নীরবে থাকিস সখী— „
হায় রে নূপুর— „

তাছাড়া মিশ্রভাবে (বাউল ও কীর্তনঙ্গ) ঃ—

তুমি ইন্দ্রমণির হার
ভালো ভালো তুমি

(গ) ‘চণ্ডালিকা’—

দই চাই গো দই চাই— বাউল
শুধু একটু গণ্ডুষ জল— কীর্তনঙ্গ
মাটি তোদের ডাক দিয়েছে— বাউল
কী কথা বলিস তুই— „
এ নতুন জন্ম নতুন জন্ম— „
বলে, দাও জল, দাও জল— কীর্তনঙ্গ
সাত দেশেতে খুঁজে খুজে— বাউল
কেন গো কী চাই— „
রাণীমার পোষা পাখি— কীর্তনঙ্গ
উড়ো পাখি আসবে ফিরে— „
মিথ্যে ওজর শুনব না— বাউল
আমার সাহস— „
এইবার আয়নার সামনে— কীর্তনঙ্গ

মাগো এতদিনে— বাউল
বল্ দেখি বাছা— কীর্তনঙ্গ
আর দেরী করিস নে—"

—তুলনামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে 'চণ্ডালিকা'র গানেই এই প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি রয়েছে।

সুরারোপের বা সুর-সমাবেশের দিক থেকে নৃত্যনাট্যের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়। প্রত্যেকটি নৃত্যনাট্যের গীতধারার মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্য রয়েছে—সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন একটি সুর-প্রবাহই নানা আবর্তের মধ্য দিয়ে ও উচ্ছলতায় চরম একটি পরিণতিতে পৌঁছেছে।[২৫] প্রত্যেকটি গানের সংগে যেমন পরবর্তী গানের, তেমনি প্রত্যেকটি দৃশ্যের সংগে পরবর্তী দৃশ্যের সুর-প্রবাহের এক ওতপ্রোত যোগ রয়েছে—কোনো একটি সুরের রেশ নিয়েই পরবর্তী গানটি রচিত হয়েছে, অথবা বলা যায় একটি গান যেখানে থেমেছে, পরবর্তী গান সেখান থেকে সুরু হয়েছে। বিশেষভাবে সংলাপমূলক অংশগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আবেগের উচ্চতা অথবা নিম্নতার সংগে সমতা বজায় রেখে সুর-প্রবাহ কীভাবে নাটকীয় হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের কিছু অংশ স্মরণ করা গেল :

থামো থামো কোথায় চলেছ পালায়ে

॥ পর্সা র্সা র্সনা র্রা | র্সা—া—া—া | পা—ধানা—া |
থা মো থা ॰ মো ॰ ॰ ॰ কো ॰ থা য়্

না না না না | ধনা—া ধপা—া | —া—া—া—া |
চ লে ছ পা লা ॰ য়ে ॰ ॰ ॰ ॰

পা ধা না—া । পা—ধা না মা । ধনা—া ধপা—া ।
সে ॰ কো ন্ গো ॰ প ন দা ॰ য়ে ॰

—া—া ধা না । পা—ধা ধা ধা । পা—গা গা গা ।
॰ ॰ আ মি ন গ র কো টা ॰ লে র্

র্সা—া—া—া । —া া—া—া ॥
চ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ র্

আমি বণিক, আমি চলেছি

॥ পর্সা র্সা র্সনা র্রা । র্সা—া—া—া । —া—া পর্সা র্সা ।
আ ॰ মি ব ॰ ॰ নি ॰ ॰ ॰ ॰ ক্ আ মি

র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা না । ধা—র্সা না—া
চ লে ছি আ প ন ব্য ব সা ॰ য়ে ॰

—া—া—া—া । ধনা না না—া । ধনা—া ধা—া ।
॰ ॰ ॰ ॰ চ লে ছি ॰ দে ॰ ॰ শা ন্

ধপা—া—া—া ॥
ত ॰ ॰ র

কী আছে তোমার পেটিকায়

॥ র্গা র্গা র্গা র্গর্রা । র্রর্গা—া র্রা র্রা । র্সা—া—া—া ।
কী আ ছে তো ॰ মা ॰—র্ পে টি কা ॰ ॰ ॰

—া া া া ॥
॰ ॰ ॰ য়্

আছে মোর প্রাণ

॥ র্সনা র্রা র্রা—া | র্সা—া—া—া | না র্রা র্সা—া |
আ ০ ছে মো র্ প্রা ০ ০ ণ্ আ ছে মো র্

না—া—া—া ॥
শ্বা ০ ০ স্

খোলো খোলো, বৃথা কোর না পরিহাস

॥ না না ধনা—া | ধপা—া—া—া | প না না না র্নধা |
খো লো খো ০ লো০ ০ ০ ০ বৃ ০ থা কো রো০

ধনা—া ধা ধা | পা—া—া—া | —া—া—া—া ॥
না০ ০ প রি হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্

—এই অংশের সুরারোপের মধ্যে পূর্বোক্ত মন্তব্যের তাৎপর্যটি নিহিত রয়েছে। কথার ঢং বা ভাবটি সুরের মধ্যে কীভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই জাতীয় সুরবৃত্তের নিদর্শন এই নৃত্যনাট্যের অন্যত্র অথবা চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকার মধ্যেও চোখে পড়ে। চিত্রাঙ্গদার সুরবৃত্ত অবশ্য মূলতঃ গীতিরসাত্মক[২৬]; সেদিক থেকে শ্যামা ও চণ্ডালিকা নাটকীয়। চণ্ডালিকায় আবার ঐ সুরপ্রবাহ ও সুরবৃত্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল বলেই নাটকীয়তার দিক থেকে তা' সার্থকতম সৃষ্টি।

এই আলোচনার সূত্র ধ'রে এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভা নৃত্যনাট্যের গানে উত্তরোত্তর মুক্তি পেয়েছে। কথাসামগ্রীর দিক থেকে গানের আঙ্গিকে যে পালাবদল দেখা দিয়েছে চিত্রাঙ্গদায়, চণ্ডালিকার মধ্যেই তার চরম ব্যাপ্তি ঘটেছে। শাপমোচনের কিছু গদ্যসংলাপের সুরারোপের

মধ্যে যার প্রাথমিক পরীক্ষা, চণ্ডালিকার গদ্যছন্দের সংলাপে সুরারোপ ক'রে তারই শেষ সিদ্ধি; নানা পূর্ব সংস্কার, বাধা ও বন্ধন থেকে সার্থক মুক্তি। সুর সমাবেশ তদুপযোগী, অথচ নৃত্যকেন্দ্রিক বলেই বিশেষভাবে ছন্দোময়। অর্থাৎ কথা, ভাব, সুর ছন্দ ও লয়ের পারস্পরিক সাযুজ্য ঘটেছে, কোন শাস্ত্রবিধির নিয়ন্ত্রণে নয়, মৌলিক প্রতিভারই প্রেরণে, স্বতঃউদ্ভূত ভাবরসের ইংগিতে; অথচ কোথাও কোনো শৈথিল্য ঘটেনি; সর্বত্রই তা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, সুন্দর এবং সংহত।

নৃত্য-সমাবেশ

নৃত্য, যা' মূলতঃ ব্যবহারিক শিক্ষা-সাপেক্ষ, অভ্যাসের দ্বারা যার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব, তার আলোচনায় এই ভেবেই শংকিত হতে হয় যে, হয়ত বা বিষয়টি পাঠকের কাছে ঠিকমতো তুলে ধরা গেল না। এক্ষেত্রে আলোচনার সীমিত সুযোগ স্বীকার্য। হয়ত বা নৃত্যলিপির সাহায্যে ঐ প্রয়াস কিছুটা সার্থক হতে পারতো, কিন্তু এর প্রধান অন্তরায় হচ্ছে স্বরলিপির মতো কোনো অনুমোদিত ও প্রচলিত নৃত্যলিপি নেই।

রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের মূল লক্ষ্য হল গানের অন্তর্নিহিত ভাবকেই নৃত্যে প্রকাশ করা। অবশ্য কথাকলির মতো নৃত্যনাট্যেরও তাই উপজীব্য। সেইজন্যই নৃত্যের বা নৃত্য-সমাবেশের যা কিছু স্ফুরণ তা গানের ছন্দ ও লয়কে কেন্দ্র করেই। নৃত্যনাট্যের কাঠামো হল নৃত্য। নৃত্য ও গান পরস্পরের পরিপূরক, বাগর্থ বা দেহ-আত্মার মত। উভয়ের ঐকান্তিক সঙ্গতি নষ্ট হলে রসসৃষ্টির বা সৌন্দর্য-সৃষ্টির হানি অবশ্যম্ভাবী। উভয়ের মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষা

করেই, একটিকে আর একটিতে মিলিয়ে দিয়ে, লীন ক'রে দিয়েই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের সার্থক রূপায়ণ ও চমৎকৃতি।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শান্তিনিকেতনে নৃত্যধারার যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যাবে যে, শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় প্রচলিত কোন পদ্ধতিকেই হুবহু মেনে চলবার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নেই, বরং তার মূলকথা হল নানা রীতির মিশ্রণে একটি যৌগিক বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির নৃত্যধারা সৃষ্টি করা। রবীন্দ্র-প্রতিভার যে বিশিষ্ট প্রবণতা সংগীতের মধ্যে ফুটে উঠেছে, সেই রকম প্রেরণা থেকেই এই বিশিষ্ট নৃত্যধারার জন্ম। এখানে ভারতীয় নৃত্যধারার ব্যাপক আলোচনা অপ্রাসংগিক। শুধু দিক-নির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রত্যেক ধারারই পদ্ধতি বা ধারাধরণ কিংবা আঙ্গিক স্বতন্ত্র প্রকৃতির। নিজস্ব কলাশৈলীতে এক একটি ধারা বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে থাকে। বলা উচিত, মেজাজের দিক থেকেও পরস্পর ভিন্ন। ভরতনাট্যমের মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বীর্য, কথকে অভিনয়-প্রাধান্য, মণিপুরীতে গীতিধর্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাবব্যক্তি এবং কথাকলিতে মুদ্রাপ্রধান অভিনয়।[২৭] লোকনৃত্যের মধ্যেও আঞ্চলিক নানা ভেদ তো রয়েছেই, তাছাড়া আঙ্গিকের দিক থেকে যূথনৃত্য হিসেবে কোনটা সম্পূর্ণ পুরুষদের, অথবা মেয়েদের, কিংবা পুরুষ ও মেয়েদের সম্মিলিত নৃত্য। কথাকলি বা ভরতনাট্যমে মুদ্রার ব্যবহার আছে। এইজন্যেই এই নৃত্যধারার সংগে সম্যক পরিচিত ও বোধের জন্য মুদ্রা সম্বন্ধে পরিমিত ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে মণিপুরীতে মুদ্রা-ব্যবহারের রীতি সেই— ছন্দ ও অঙ্গভঙ্গীতে ভাব অভিব্যক্ত হয়। কথকও অভিনয়-প্রধান, আঙ্গিকাভিনয়ের সংগে যুক্ত হয় দ্রুতলয়ের ছন্দ। বলাবাহুল্য, এইসব নৃত্যধারার বৈশিষ্ট্য বা সার্থকতা এগুলির

নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যচেতনা বা নৃত্যনাট্যের লক্ষ্য হচ্ছে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করা। বস্তুতঃ, কোন্ ধরণের নৃত্য কোন্ রকম অভিনয়ের উপযোগী, রবীন্দ্রনাথ সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নৃত্যনাট্যের মধ্যে নৃত্য-সমাবেশ করেছেন। এই-জন্যেই এই অভিনয়ের উপযোগীতার কথা ভেবেই তিনি স্বচ্ছন্দে বিভিন্ন রীতিকে মেলাতে পেরেছেন সহজেই। অর্থাৎ বলা যায়, বিষয়বস্তুর বিশেষ চরিত্র অনুযায়ী নৃত্যাদর্শ গড়ে ওঠে এইসব নৃত্যনাট্যে; নাট্টীয় চরিত্রের সংগে সংগতি রক্ষাও অত্যাবশ্যক।

কীভাবে নৃত্যনাট্যে বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে, সে আলোচনা করবার আগে রচনা-পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক আলোচনাযোগ্য। মিশ্রনের যে রীতি অনুসৃত হয়েছিল নৃত্যনাট্যে, তার পিছনে হয়ত ব্যালের প্রভাব রয়েছে। প্রতিমা দেবীও একথা অন্যভাবে বলেছেন।[২৮] ব্যালের রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে Arnold Haskel প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আসলে যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যালে রচিত হয়; কতকটা শ্রমবিভাগের মতো। একটি কাহিনীকে খাড়া ক'রে তদনুযায়ী সংগীত, মঞ্চ ও রূপসজ্জা এবং নৃত্য গড়ে ওঠে। সব সময় সেগুলি মেলাবার ভার থাকে পরিচালকের ওপর। এ বিষয়ে আগেই কিছু ইংগিত দেওয়া হয়েছে। Choreographer-এর উপর দায়িত্ব থাকে দৃশ্যগুলি যথাযথভাবে বিন্যাস করার। ব্যালের শিল্পকলার এই দিকটিই রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিল সম্ভবতঃ। সেই-জন্যেই ঐক্য বজায় রেখে বিভিন্ন নৃত্যধারাকেও মেলাবার সম্ভাবনা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে তিনি ব্যালের এই রচনা পদ্ধতির দিকটিই শুধু গ্রহণ করেছিলেন। কেমনা, অন্যদিক থেকে মৌলিক

পার্থক্য রয়েছে। ব্যালেতে যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার থাকে এবং তা অপরের সৃষ্টি ; রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের বাহক গান, এবং তার স্রষ্টা তিনি নিজে। নৃত্যের ক্ষেত্রে তিনি হয়তো অপরের সহায়তা নিয়েছিলেন, তবে তাও তাঁরই ইংগিতে বা নির্দেশ অনুযায়ী রচিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যালের রচনারীতির আদর্শ অনুযায়ী যৌথ প্রয়াসের বদলে রবীন্দ্রনাথের একক শিল্পচেতনাই বিভিন্ন গুণীর সহযোগিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্যালের প্রেরণা থেকেই যে এই নৃত্যনাট্যগুলি (বিশেষভাবে চিত্রাঙ্গদার) সৃষ্টি করার কথা মনে আসে—তার দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কখনো কখনো আগে রচিত গানের অনুসরণে নৃত্যনাট্যের নৃত্য রচিত হয়েছে, অথবা আগে রচিত নৃত্য উত্তরকালীন নৃত্যনাট্যে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড গান বা নৃত্যকেও পরবর্তী সময়ে একত্র মেলানো হয়েছে। পূজনীয়া প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে[২৯] জানবার সুযোগ পেয়েছি যে, যূথনৃত্যের নির্দেশের জন্য পূর্বপরিকল্পিত স্কেচ বা খসড়ার সাহায্য নেওয়া হত। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীর সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যাবে—আসলে নৃত্যের প্রেরণা থেকেই নৃত্যনাট্যগুলি রচিত, প্রতি মুহূর্তে নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের আংগিকের দিকে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার নৃত্য-সমাবেশ প্রথমে মণিপুরী পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, বিশেষভাবে তখন এই নৃত্যধারার চর্চা ছিল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত মণিপুরীর প্রাধান্য থাকলেও গৌণভাবে কথাকলি, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের লোকনৃত্য এবং সেই সংগে শান্তিনিকেতনের মিশ্ররীতির নৃত্যও ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই রীতির পরিবর্তন ঘটে— মণিপুরীর

প্রাধান্যের বদলে তার সংগে অন্যান্য নৃত্যধারা অর্থাৎ দক্ষিণী নৃত্যধারাও স্থান পেয়েছিল।

মণিপুরী নৃত্যের প্রাধান্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি তালের কথা উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যনাট্যে যথাক্রমে মণিপুরী কাওয়ালী, চারতাল ব্যবহৃত। মণিপুরী কাওয়ালীর ব্যবহার অত্যন্ত প্রকট। তার সংগে তেওড়া, দাদরা ও ঝাঁপতাল গৌণভাবে স্থান নিয়েছে। নৃত্যের তাল বা ছন্দের নানা বৈচিত্র্য যে মূলতঃ মণিপুরী থেকেই এসেছিল, তা প্রতিমা দেবী ব্যাখ্যা ক'রেছেন। যেমন, অর্জুনের ধ্যানভাঙার দৃশ্যে তেহাই তোরাপরণ রীতি যুক্ত হয়েছিল। উনি বলেছেন, মূলতঃ এটি উত্তর ভারতীয় রীতি হলেও তখন মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে দিয়েই এই কৌশল তাঁরা পেয়েছিলেন। তাছাড়া, মণিপুরী খোলে তেওড়া ও দাদরা অন্য এক আমেজ আনে যা দক্ষিণভারতীয় তালযন্ত্রের বাদ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। মণিপুরী নৃত্যের সংগে খোলের বোল বা ছন্দ এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, ঐ তাল যদি অন্য কোনো তালযন্ত্রে বাজানো যায় তাহ'লে যেন সুর থাকে না। আর মণিপুরী নৃত্যের যাকিছু বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য বা ভাবব্যক্তি তা এই ছন্দের মধ্যে দিয়েই। বোধহয় এই বৈশিষ্ট্য কবিকে খুব বেশি মুগ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যদিকে আবার বৈচিত্র্য আনবার জন্যে মণিপুরীর সংগে অন্যান্য রীতির তালের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল। প্রতিমা দেবী বলেছেন, 'ক্ষণে ক্ষণে শুনি অতল জলের আহ্বান' গানটিতে মণিপুরী কাওয়ালী, চার তালের সংগে দক্ষিণী তেওড়া ও দাদরা ব্যবহার করা হয়েছিল। এই গানটির ভাবব্যক্তিতে এইভাবে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির নৃত্যধারাকে মেলানো হয়েছিল।

যদিও গানের ছন্দ ও লয়কেই নৃত্য অনুসরণ করে এসব

নৃত্যনাট্যে, তবু স্বতন্ত্রভাবেও তালযন্ত্রের সংগে নৃত্য রচিত হতে দেখি। অর্জুনের ধ্যানভংগের দৃশ্যটি তারই প্রমাণ। বাস্তবিক পক্ষে, নৃত্যকে মাঝে মাঝে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা না দিলে নৃত্যের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে না, তার স্বরূপ ও স্বভাব সার্থকভাবে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে না। এইজন্যেই ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কত্থক, এমনকি মণিপুরীতেও পৃথকভাবে তালনৃত্যের সুযোগ আছে। যেমন, ভরতনাট্যম্ ও কত্থকে অভিনয় ও তালের নৃত্য পৃথক বা একসংগে চলে। ভরতনাট্যমে অবশ্য শেষ অংশ ছন্দ ও অভিনয় একসংগে মিলে যায়। তেমনি কথাকলির কলসম্। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় নৃত্যধারার এই বিশিষ্ট প্রবণতা (যা মূল চারটি ধারার মধ্যেই রয়েছে) রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যে গ্রহণ করেছেন। নৃত্যের ছন্দোময় অংশ বাড়াবার জন্যে বা ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্যেই এই ধরণের খণ্ড তালনৃত্যের ব্যবহার ঘটেছে। বাস্তবিক পক্ষে, তিনখানি নৃত্যনাট্যেই এই জাতীয় সুযোগ রয়েছে; বলা উচিত, এইভাবে নৃত্যের ঐশ্বর্য বাড়ানো হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদার সূচনার গানটি নেপথ্য থেকে গাওয়া হয়। তারপরেই তালযন্ত্রের বাদ্যের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা ও তার সহচরীবৃন্দের মঞ্চপ্রবেশে শিকারের আয়োজন-সূচক নৃত্যটি রূপায়িত।

দ্বিতীয় দৃশ্যে সখীসহ চিত্রাঙ্গদার স্নানে আগমনের দৃশ্যেও তালের নৃত্য ব্যবহৃত হয়। অন্যত্র, যেমন,— মদনের প্রবেশে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা' গানের সংগে সংগে চিত্রাঙ্গদার নূতন কান্তির উত্তেজনা ও আবেশ প্রকাশের সূচনায়; তেমনি 'সত্রাসের বিহ্বলতা' গানটির পূর্বে নিছক তালের নৃত্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই নৃত্যনাট্যে এই ধরণের ছোটো ছোটো তালের নৃত্য ছাড়া, গানের মাঝে মাঝেও এই ধরণের খণ্ড খণ্ড তালনৃত্যের রীতি প্রচলিত।

শ্যামাতেও নিম্নলিখিত অংশে সম্পূর্ণভাবে তালনৃত্যের রীতি প্রযুক্ত হতে দেখি—

১. প্রথম দৃশ্যের সুরু— বজ্রসেন ও পথিকের প্রবেশ— বন্ধুর পলায়ন ও কোটালের প্রবেশ— বজ্রসেনের পলায়নের পর কোটালের নৃত্য ('ভালো ভালো তুমি পালাও কোথা' গানটির আগে)

২. দ্বিতীয় দৃশ্যের সুরু— শ্যামার সভাগৃহে নানা কাজে নিযুক্ত সহচরীদের নৃত্য— সখীদের নৃত্য চর্চা, শেষে শ্যামার সজ্জাসাধন (এখানে একদা "তোমায় সাজাব যতনে" গানটির সুরে নৃত্যটি রচিত হয়েছিল[৩০])

৩. তৃতীয় দৃশ্যে শ্যামা ও বজ্রসেনের দ্বৈতনৃত্যে ('প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে' গানটির আগে)

এ ছাড়াও আরো কিছু কিছু অংশে তালের নৃত্য প্রযুক্ত— যেমন, প্রহরীর প্রবেশ (৪র্থ দৃশ্য), মেয়েদের প্রবেশ (৪র্থ দৃশ্য), ইত্যাদি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রহরীর উত্তীয়কে হত্যার দৃশ্যটি (২য় দৃশ্য) তালযন্ত্রের বাদ্যের সঙ্গেই রচিত। শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে, যেমন চিত্রাঙ্গদায় দেখি, এই নৃত্যনাট্যেও, গানের মাঝে খণ্ড খণ্ড তালনৃত্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বোধহয় এ বিষয়ে কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তবে উত্তীয়ের 'মায়াবন বিহারিণী' গানটির মতো একাধিক গানের মধ্যেই এরূপ তালনৃত্যের প্রয়োগ আছে। সংলাপের মধ্যবর্তী অংশে অবশ্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়।

চণ্ডালিকার প্রথম গানটি বাস্তবিক পক্ষে তখনকার কয়েকটি খণ্ড তালের নৃত্যের কথা ভেবেই, বিশেষভাবে একটি দক্ষিণী নাচের তালের কথা ভেবে 'আমার মালার ফুলের দলে' গানটি রচিত। এই

জন্মেই ছন্দ তাল ফেরতা। লক্ষ্য করার বিষয়, এই গানে (গায়কীর আলোচনা স্মরণযোগ্য) চার মাত্রার বেলায় লয় দ্রুত হয়েছে। ক্যাণ্ডিনাচের বোলের সংগে মিলিয়ে 'যে আমারে এনেছে এ অপমানের অন্ধকারে' গানটি রচিত হয়েছিল। অন্যান্য অংশেও তালের নৃত্য রয়েছে ; যেমন—

১. প্রথম দৃশ্য— প্রকৃতির জলতোলা— মেয়েপুরুষের ফসল-কাটার গানের (মাটি তোদের ডাক দিয়েছে) সংগে।

২. দ্বিতীয় দৃশ্য— রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ— আকর্ষণী মন্ত্রে যোগ দেবার জন্যে মায়ের শিষ্যাদলকে আহ্বান-নৃত্য— মায়ের মায়ানৃত্য— ('ভাবনা করিস নে তুই' গানটির পর 'হৃদয়ে মন্দ্রিল গুমরু গুরু গুরু' গানটির সুরে ও ছন্দে একটি তালনৃত্য রচিত হয়েছিল।[৩১])

৩. তৃতীয় দৃশ্য— সকলের সমবেত নৃত্য (ঘুমের ঘন গহন হতে' গানটির সংগে)

এই নৃত্যনাট্যেও গানের সংগে কিছু কিছু খণ্ড তালনৃত্যের ব্যবহার হয়ে থাকে।

নৃত্যাদর্শের দিক থেকে চিত্রাঙ্গদায় মণিপুরী নৃত্যধারার প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিমা দেবী বলেছেন, যদিও দক্ষিণী নৃত্যের সঙ্গে মণিপুরী পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছিল তথাপি এই নৃত্যনাট্যে, দক্ষিণী ও উত্তর ভারতীয় ঘাড় ও চোখের বিবিধ ভংগী বা 'ভাষা' এবং কথাকলির মতো মুদ্রাভিনয়ের রীতি গ্রহণ করা হয়নি। এদিক থেকেও মণিপুরী নৃত্যের প্রভাব অনুভব করা যায়।

এই নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার চরিত্রকে যেভাবে মদনের বরলাভের পূর্বে ও পরে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে, নৃত্যাভিনয়ও করেছেন দু'জনে,

প্রশ্ন উঠতে পারে তার উপযোগিতা কী। ভাবের দিক থেকে যাই হোক, কার্যতঃ দেখি এতে দুটি নৃত্যধারাকে কাজে লাগাবার অপূর্ব সুযোগ। কুরূপার চরিত্রটি ভরতনাট্যম্ বা কথাকলির বিশেষ উপযোগী, কেননা, এই চরিত্র মূলতঃ ক্রিয়াপ্রধান— তার প্রকাশ কর্মক্ষেত্রে ও ঘটনায়। পক্ষান্তরে সুরূপা চিত্রাঙ্গদার চরিত্রটি ভাব-প্রধান— সে যেন কর্মজগৎ থেকে অবসর নিয়ে অন্তর্লোকে এসে প'ড়ে তার তরংগে তরংগে আন্দোলিত, এদিক থেকে এই চরিত্র মণিপুরী নৃত্যাদর্শের খুবই উপযোগী। এইভাবেই দুটি চরিত্র রূপায়িত।

আংগিকের দিক থেকে, বিশেষ গান বা নৃত্য বিশেষ নৃত্যনাট্যের জন্যই রচিত হলেও, কখনো কখনো প্রয়োজনমত আগেকার কোনো গান বা নৃত্য কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'ওরে ঝড় নেমে আয়' গানটি 'বর্ষামংগলে' নৃত্যে রূপায়িত হয়। প্রতিমা দেবীর অনুরোধে পরে তা চিত্রাঙ্গদায় প্রবেশ করে। তেমনি শাপ-মোচনের "বঁধু কোন্ মায়া" ভাষাগত ঈষৎ রূপান্তরে 'চিত্রাঙ্গদা'য় ব্যবহৃত হয়েছে। নৃত্যের দিক থেকেও অনুরূপ প্রবণতা দেখি। যেমন, 'বঁধু কোন্ আলো লাগল চোখে' গানটির পরে দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে' গানটি ছিল। কিন্তু রূপ দিতে গিয়ে দেখা গেল, অসুবিধে হয়। কেননা, প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা ও সখীদের বন্য-শিকারীর সজ্জা; অথচ ঐ গানটি স্নানে যাওয়ার গান। কাজেই বেশ-পরিবর্তন অপরিহার্য; বলা বাহুল্য তা সময় সাপেক্ষও বটে। সেই কারণে এলো বন্য অনুচরদের সংগে অর্জুনের নৃত্য। নাট্যের দিক থেকে তার একান্ত প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও পূর্বোক্ত কারণে তা বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখা গেল, তাতেও ঠিকমতো সময় পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সখীদের একটি (যাও

যদি যাও তবে) নৃত্য জুড়ে দিতে হ'ল। নৃত্যনাট্যগুলি প্রযোজনা করতে গিয়ে মহড়ার সময় এইভাবে কথা, সুর বা নৃত্যের সংযোজনায় ও সমাবেশে বহুবিধ বিবর্তন ঘটেছে।[৩২]

এই নৃত্যনাট্যের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্যসমাবেশ ঘটেছে আবৃত্তির সংগে। এখানে এগারোটি মুক্ত-ছন্দের আবৃত্তি রয়েছে। আবৃত্তির সংগে নৃত্যাভিনয়ের দৃষ্টান্ত আগেও ছিল। ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে আবৃত্তিগুলি পাঠ করেছিলেন, নৃত্যের আংগিকে অভিনয় করা হয়নি। পরে এগুলি নৃত্যছন্দে অভিনীত হয়; বর্তমানে সেই রীতিই চলে আসছে। প্রতিমা দেবী বলেছেন, এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলি মাঝে মাঝে মূল ঘটনার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে—"দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সংগে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হল তাদের কাজ; এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে।"

নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'য় মণিপুরীর প্রাধান্য চলে গিয়ে যুগপৎ কথাকলি, মণিপুরী ও কত্থক নৃত্যধারার প্রয়োগ ঘটেছিল। সেই সংগে ছিল ক্যাণ্ডীয় নৃত্য। ভরতনাট্যম্‌ও ছিল। বজ্রসেনের নৃত্যাদর্শ ভরতনাট্যম্ ও কথাকলিতে, শ্যামার মণিপুরীতে, উত্তীয়ের চরিত্র কত্থক পদ্ধতিতে এবং প্রহরীর নৃত্য কথাকলির আংগিকে রচিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালের অভিনয়ে। এই নৃত্যনাট্যেও প্রযোজনার সময় (দ্বিতীয় বারের অভিনয়ে) উত্তীয়বধের দৃশ্যটি সংযোজিত হয়।[৩৩]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মিশ্রণের চূড়ান্ত পরীক্ষার নিদর্শন এই নৃত্যনাট্যের মধ্যে রয়েছে। এ দুখানি নৃত্যনাট্যের নৃত্য-সমাবেশের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যাবে—চরিত্রের উপযোগী ক'রেই নৃত্যাদর্শ গড়ে উঠেছে। কথাকলি স্বভাবতঃই প্রহরীর

নৃত্যাদর্শের অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী। বজ্রসেনের চরিত্রের রূপায়ণে যে কথাকলি ও ভরতনাট্যমের মিশ্রণ ঘটেছিল, তাতেও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা ভাব যথাযথ ফুটে উঠেছিল নিঃসন্দেহে। বোধ হয় এই কারণেই উত্তীয় চরিত্রের সংগে সংগতিসূত্রে কত্থকের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, এই সময়েই ক্যাণ্ডি-নৃত্যচর্চা প্রসারলাভ করে শান্তিনিকেতনে। এটি ঠিক অভিনয়ের নৃত্য নয়। লোকনৃত্য হিসেবে এর ছন্দকেই টুকরো টুকরো ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে এই পদ্ধতির বহুল প্রচার দেখা যায় নৃত্যনাট্যে।

'চণ্ডালিকা'র নৃত্য-সমাবেশ করা হয়েছিল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—মূলতঃ দক্ষিণী নৃত্যধারাকে ব্যবহার করাই ছিল এই নৃত্যনাট্যের লক্ষ্য। এই নৃত্যনাট্যের মূল তুটি চরিত্র—মা ও প্রকৃতি, কথাকলি ও ভরতনাট্যম্ নৃত্যাদর্শের বিশেষ উপযোগী। ছন্দের বিচিত্র গতি ও লয়, ক্ষণে ক্ষণে নাটকীয় পরিবর্তন—এসবের মধ্যে দিয়ে এ তুটি চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে ; দ্বন্দ্বের সংঘাতে সমান তালে এগিয়ে গেছে নাট্যীয় গতি। কাজেই তার প্রকাশে কথাকলি বা ভরতনাট্যমের মতো নৃত্যধারার যে খুবই উপযোগিতা রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই নৃত্যনাট্যের শেষ দৃশ্যে চরম মুহূর্তে আনন্দের ছায়া অভিনয়ের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। হয়ত বা জাভা-বলি বা কেরল-ছায়ানৃত্যের আদর্শের অনুসরণে এই অংশটি পরিকল্পিত হয়ে থাকবে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে কখনো এই ছায়ানৃত্য দেখানো হয়নি, প্রস্তাব হয়েছিল মাত্র। ছায়া-নৃত্যাভিনয়ের বদলে মৃত্থ আলোতে য়ুরোপীয় ইম্প্রেশনিষ্ট্ নৃত্যরীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানি নৃত্যনাট্যে একটি সাধারণ ধর্ম চোখে পড়ে। চরিত্রের দিক থেকে তো বটেই—নৃত্যাদর্শের দিক থেকেও

এখানে দুটি শ্রেণীর অবতারণা রয়েছে: অভিজাত ও সাধারণ,—নৃত্যের দিক থেকে অভিজাত[৩৪] (ক্লাসিক) ও লোকনৃত্য। যেমন:—অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা, মদন, বজ্রসেন, শ্যামা, প্রহরী উত্তরীয় ও সহচরীবৃন্দ একদিকে এবং বন্য-অনুচর, গ্রামবাসী, পল্লীরমণী অন্যদিকে। চণ্ডালিকায় একদিকে প্রকৃতি ও মা, (জাতিকুলের দিক থেকে না হলেও মনোভংগীর দিক থেকে তো বটেই) আনন্দ; আর অন্যদিকে দইওলা, চুড়িওলা। বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করতে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যে এই দুটি রীতিরই স্থান দিয়েছেন। অবশ্য লোকনৃত্যের অনেক শাখা রয়েছে। মনে হয়, লোকনৃত্যের প্রত্যক্ষ যে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, তাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় (শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে) দেখেছি পুরুষদের সমবেত নৃত্যে (সন্ত্রাসের বিহ্বলতা) হাতে তলোয়ার ব্যবহার করা হয়। আসাম বা মণিপুরের কোনো কোনো লোকনৃত্যে হাতে অস্ত্র নিয়ে নৃত্যের রীতি আছে। যেমন,—তপুকিখিলে, (বল্লম হাতে নাগা পুরুষনৃত্য) মিরি (তরুণদের ডান হাতে খাঁড়া নিয়ে নৃত্য), কাবুই (গান সহযোগে নাগা ছেলেমেয়েদের নৃত্য—পুরুষদের হাতে থাকে কুঠার)। বোধহয়, এই ধরণের লোকনৃত্যের আদর্শেই ঐ নৃত্যটি এসে থাকবে। তবে, প্রত্যক্ষভাবে কোন্ লোকনৃত্যের অনুসরণের ফল, সেটি অনুসন্ধানের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যগুলিতে যেভাবে নৃত্য-সমাবেশ করেছেন, তার আলোচনা করা গেল। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে—রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যধারা বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় নৃত্যধারার ঐতিহ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দেখা যাচ্ছে, তিনি নৃত্যের দুটি উপাদানকে ভাবানুযায়ী ব্যবহার করেছেন—তাল ও অঙ্গভঙ্গী। কিন্তু, এই দুটি উপাদান তাঁর গানের সংগে মিলে অন্য এক রূপ নিয়েছে

কবির জন্মবার্ষিকীতে একটি নৃত্যানুষ্ঠান [শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে]

অর্থাৎ গানের ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি নৃত্যের মধ্যে নূতন এক প্রাণশক্তি এনেছে। তার ফলে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের প্রকৃতি উপাদানভূত বিভিন্ন নৃত্যধারার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে, বিশিষ্ট হয়েছে। প্রতিমা দেবী অন্যদিক থেকে বলেছেন যে, 'চণ্ডালিকা'য় যদিও দক্ষিণী নৃত্যধারার উপস্থাপনা করা হয়েছিল, তার ফলে যে নৃত্যধারা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ঠিক কথাকলি বা ভরতনাট্যমে পাওয়া যাবে না'। আমার তো মনে হয় তার অন্তর্নিহিত কারণ এই। অর্থাৎ বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের মতোই এই নৃত্যধারা বিচিত্র সম্ভারকে আত্মসাৎ ক'রে অনন্য হয়ে উঠেছে। এই তিনখানি নৃত্যনাট্যেই বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির যে সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তার কারণ সম্বন্ধে শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানীর অভিমত এখানে উল্লেখযোগ্য :৩৫—

"......তার বাস্তবিক কারণ হয় তো এই যে আঙ্গিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গোঁড়ামি ছিল না। যেমন গানের সুরের বেলা, তেমনি নৃত্যনাট্যের বেলাতেও দেখি তিনি একদিকে যেমন শুদ্ধ অবিমিশ্র বিধি পদ্ধতির অনুসরণ করেননি, তেমনি আবার নানা পদ্ধতির একত্র সম্মেলনও ঘটিয়েছেন। অবশ্য এর মধ্যে যে সমস্তটা ইচ্ছাকৃত তা নয়। কাব্য লিখতে গিয়ে কবিকে যেমন ভাষার হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়, তেমনি নৃত্যনাট্যকে প্রকাশের ভাষা-রূপে ব্যবহার করতে গিয়ে স্রষ্টাকে ব্যবহার করতে হয় নৃত্যনাট্য শিল্পীদের। এসব শিল্পীদের ধরণধারণ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সব কিছুকেই তিনি উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে যেমন ছিল প্রয়োজনের তাগিদ, তেমনি ছিল শিল্পীকুশলীদের বিশেষ নৈপুণ্য ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত রচনার ইচ্ছা।......"

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের রূপদান প্রসংগে স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন আজ

উঠবে—শান্তিনিকেতনের নৃত্যাদর্শই কি একান্তভাবে প্রযোজ্য? ভাষান্তরে বলা যায় তার বাইরে নৃত্যসমাবেশের দিক থেকে স্বাধীনতা কী আছে বা থাকা সঙ্গত কিনা! এর উত্তরে হয়ত এ কথাই বলা যায় যে, সত্যই আঙ্গিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো গোঁড়ামি ছিল না। রবীন্দ্রকল্পনার অনুসরণ ক'রে, মৌলিকভাব ও রস হৃদয়ঙ্গম ক'রে, হয়তো প্রতিভাবান শিল্পী কিছু 'নূতনে'র সমাবেশ করতেও পারেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণ করছি, শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ ১৯৬০ সালে বোম্বাইয়ে ঐ অঞ্চলের কয়েকজন নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য-সমাবেশ করেন ঃ—

(ক)	কুরূপা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন	— ভরতনাট্যম্, কথাকলি
(খ)	সুরূপা ,,	— মণিপুরী
(গ)	মদন	— মণিপুরী, কত্থক
(ঘ)	গ্রামবাসী	— লোকনৃত্য

স্থানকালপাত্র ও সুযোগসুবিধার বিচার ক'রে প্রযোজক তাঁর প্রয়োগ নৈপুণ্য কী দেখালেন তা পূর্বগামী আলোচনার সংগে তুলনায় বোঝা যাবে। আসল কথা, রবীন্দ্র-নৃত্যধারার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিমিত রসবোধ ও জ্ঞান থাকলেই হ'ল, না হলেই স্বৈরাচারের সম্ভাবনা, আর ভাবব্যক্তি ও রসসৃষ্টির হানি!

নৃত্যনাট্যের বিচারে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপেক্ষিক। এবিষয়ে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। যিনি খাঁটি গীতিরস আস্বাদ করতে চান, তাঁর কাছে হয়ত চিত্রাঙ্গদার আকর্ষণ বেশী; আবার যিনি নাট্যরসের ভক্ত, তাঁর কাছে হয়ত শ্যামার আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি। অন্যদিকে, কেউ মনে করেন নৃত্যনাট্য হিসেবে চণ্ডালিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ।[৩৬] আমার মনে হয়, চণ্ডালিকাই নৃত্যনাট্যের আংগিকের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ (কয়েকটি মূল গান বর্জন

করে'—কেননা, সেগুলি নাটকীয় গতি ব্যাহত করে। যেমন 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' ইত্যাদি ; এগুলি বাহুল্য মাত্র !) তো বটেই, নৃত্য-সমাবেশের দিক থেকেও এই নৃত্যনাট্যে এমন এক নতুন সম্ভাবনা আছে, বা বলা উচিত, শিল্পীর নৃত্যপ্রতিভা প্রকাশের স্বাভাবিক সুযোগ আছে, যা' অন্যত্র নেই। আগেই বলেছি—চণ্ডালিকায় সুর, ছন্দ, লয় ও ভাবের এতো দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে যে, নিপুণ শিল্পীর পক্ষেই কেবলমাত্র তা' প্রকাশ করা সম্ভব।' অন্য দুখানি নৃত্যনাট্যের সংগে এর পার্থক্য এই যে, চণ্ডালিকার নিঁখুত রূপায়ণ তখনই সম্ভব যখন সমস্ত শিল্পীর মধ্যে (নৃত্য ও সংগীতশিল্পী, এমনকি আলোকশিল্পীও !) একটি আত্মা সন্নিবেশিত হয়—যদি একই ছন্দ, একই প্রেরণা থাকে সকলের মধ্যে, তবেই তার যথার্থ রূপায়ণ সম্ভব।

সবশেষে, প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন বোধ করছি। কী জানি কেন সাধারণভাবে একটি ধারণা প্রচলিত যে, ললিত অঙ্গভঙ্গীমাত্রই রবীন্দ্র-নৃত্য। এ ধারণার পিছনে যে মনোভাব রয়েছে তাকে কোনোমতেই রবীন্দ্রানুগ বা রবীন্দ্র-নৃত্যধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলা যায় না। নৃত্য-সমাবেশের আলোচনার সূত্র ধ'রে বলছি—শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন নৃত্যধারার চর্চার ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বিশিষ্ট নৃত্যধারার সৃষ্টি হয়েছে। একথা ঠিক যে, তিনখানি নৃত্যনাট্যেই অঙ্গাভিনয়ের উপযোগিতাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুখ্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভাব ও রসের সংগে অসম্পৃক্ত বা অসমন্বিত যে কোনো অঙ্গভঙ্গীই রবীন্দ্র-নৃত্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে,—'বঁধু কোন্ আলো লাগল চোখে'-র মতো গানকে কীভাবে রূপ দেওয়া যায় ? বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণভাবে কোনো একটি নৃত্য-ধারার হুবহু অনুকরণ করা যায় ছন্দ বজায় রেখে, তাহলে নৃত্য হবে

বটে, কিন্তু গানটির ভাব বা রস ফুটে উঠবে না। তেমনি, প্রকৃতির 'জল-তোলা'র মতো এমনকতকগুলি মূকাভিনয়-প্রধান অংশও আছে, যা' কোনো বিধিবদ্ধ নৃত্যে প্রকাশ করা চলে না। চণ্ডালিকায় আনন্দের 'জল দাও আমায় জল দাও' এই অংশটি নৃত্যে রূপ দেওয়া যায় নানাভাবে। কথাকলিতে কোনো কিছু প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট মুদ্রা ও ভংগী রয়েছে। ভরতনাট্যমেও তাই। আবার সাধারণভাবে কোনো-কিছু চাইতে হ'লে অঞ্জলি-হস্তের ব্যবহার সাধারণভাবেই হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, কোন্ ভংগী কোথায় প্রযোজ্য এবং কীভাবে প্রযোজ্য, সে সম্বন্ধে রসবোধ থাকা দরকার। নৃত্যকে যেভাবেই দেখা যাক্ না কেন, তা ছন্দোবদ্ধ দেহভঙ্গী ছাড়া আর কী? কিন্তু সে দেহভংগী যেন অর্থহীন অথবা 'মাত্রাহীন' না হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, ছন্দোবদ্ধ দেহভংগী নৃত্যনাট্যের রসবস্তুর অভিব্যক্তিতে কতোখানি সাহায্য করছে, কথা সুর ছন্দ লয় ভাবভংগীর অভীষ্ট এবং অবিভাজ্য ঐক্যকে কোথাও ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ করছে কিনা, তাতেই যে কোনো অঙ্গভঙ্গীর, আংগিক রূপায়ণের, ব্যর্থতা বা সার্থকতার, উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার হবে।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য ঃ—

ভারতীয় নৃত্যধারার প্রধান চারিটি রীতির নৃত্যনাট্যের দৃষ্টান্ত থাকলেও মূলতঃ ভারতীয় নৃত্যনাট্য বলতে কথাকলিকেই বুঝি। ভরতনাট্যম্, মণিপুরী এমন কি কথক নৃত্যাদর্শের নৃত্যনাট্য বিরল নয়। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক নৃত্যধারাতেই খাঁটি তালনৃত্য ছাড়া অবশ্য অভিনয়েরও স্থান আছে। কুচ্চিপুড়ি নৃত্যনাট্য প্রায় কথাকলির মতো, তবে অভিনেতা কখনো কখনো সাধারণভাবে কথা

বলেও অভিনয় করেন। কথকে নর্তক বা নর্তকী অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই কাহিনীকে ব্যক্ত করেন। আবার রাসলীলার মতো বহুশ্রুত ঘটনাকেই কেন্দ্র ক'রে মণিপুরী নৃত্যনাট্য রূপায়িত হয়। একদিক থেকে পাশ্চাত্য ব্যালের সংগে রাসলীলা নৃত্যের বেশ মিল আছে।

এই ধারাগুলির (এমনকি যে-কোন লোকনৃত্যের) বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই পরস্পরকে পৃথক্‌ভাবে চেনা যায়। আংগিকের দিক থেকে যেমন, তেমনি পরিবেশনরীতির দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে পরস্পরের মধ্যে। এর পাশাপাশি যদি রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের তুলনা করি, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলির কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য পূর্বোক্ত কয়টি নৃত্যধারার থেকে পার্থক্য সূচিত হয়? প্রশ্নের আকারে বলা যায়—কোন এক জায়গায় কয়েকটি নৃত্যনাট্য পাশাপাশি অভিনীত হচ্ছে, প্রথমটি কথাকলিতে, দ্বিতীয়টি ভরত-নাট্যমে, তৃতীয়টি কথকে, চতুর্থটি মণিপুরীতে, এবং শেষেরটি রবীন্দ্রনাথের (ধরা যাক্) 'শ্যামা'। কোন একজন দর্শক সেগুলি দেখলেন; দেখার পর কোনো পার্থক্য অনুভব করবেন কিনা 'শ্যামা'র সঙ্গে, এবং সে পার্থক্য কিসের?

বলা বাহুল্য, সে পার্থক্য সম্পূর্ণভাবেই আংগিকগত। কথাকলি নৃত্যনাট্য পরিবেশনের জন্য বিশেষ মঞ্চব্যবস্থা থাকে। সাধারণতঃ অভিনয়ের সময় সেই ব্যবস্থাগুলি যথাযথ অনুসরণ হয়। কথাকলিরও মূল উপাদান গান, যা' অভিনয়ে রূপায়িত হয়। এই গানগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—পদম্ (কর্ণাটী সংগীতে 'পদম্' অন্য অর্থে ব্যবহৃত) ও শ্লোকম্ (দণ্ডকম্)। শ্লোকম্-এর মধ্যে দিয়ে কাহিনী রূপ পায় আর পদম্-এর কাজ হচ্ছে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাব বা আবেগ ফুটিয়ে তোলা। তাই কথাকলিতে পদম্-কেই প্রাধান্য

দেওয়া হয়। অনেকেরই ধারণা, যেহেতু এই নৃত্যধারার সঙ্গে কেরালার প্রাকৃতিক যোগ রয়েছে, সেইজন্যেই আঞ্চলিক সংগীতই এর আশ্রয়। কিন্তু তোড়ী, ভৈরবী প্রভৃতি অনেক কর্ণাটী রাগ-রাগিণী কথাকলিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য এমন কতকগুলি রাগরাগিণী কথাকলিতে ব্যবহার করা হয়, যেগুলি কর্ণাটী সংগীতের তালিকায় পাওয়া যায় না (যেমন, Padi, Indisa, Indalam, Puranira ইত্যাদি)। টি, লক্ষ্মণ পিল্লাইয়ের অভিমত এই যে, প্রাচীন তামিল সংগীতে এর নিদর্শন রয়েছে এবং বর্তমানে কথাকলি তারই ধারা বহন করছে।[৩৭] কথাকলির অন্যতম সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—এ সংগীত কখনো দ্রুত লয়ে গাওয়া হয় না, কেননা মূলতঃ এগুলি অভিনয়ের জন্য, তবে যুদ্ধের দৃশ্যে লয় দ্রুত হয়।

কথাকলির গীত-অংশ পরিবেশন করেন দু'জনে। প্রধান গায়ককে বলে পোন্নামি (Ponami) এবং অপরজনকে বলা হয় সিংকিড়ি (Sinkidi)। গানের সহযোগিতার জন্য কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রধান হচ্ছে চেণ্ডা—বড় ড্রামের মতো বাদ্যযন্ত্র, কাঠির সাহায্যে বাজানো হয়। হাত দিয়ে বাজাবার জন্য মাদলম্ চেঙ্গিলা (Changala) নামে এক ধরণের বাদ্যযন্ত্রে পোন্নামি নিজে তাল রাখেন। আর এলথালম্ (elathalam) নামে এক ধরণের ধাতব মন্দিরা ব্যবহার করেন সিংকিড়ি। মঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তে এঁরা সমবেত হয়ে বসেন। কথাকলির মঞ্চ হচ্ছে মন্দিরের সংলগ্ন মুক্ত প্রাংগণ। প্রদীপের আলোয় এই অভিনয় হয়। প্রথমে ঢাক বাজতে থাকে। (উদ্দেশ্য, লোককে অভিনয় প্রাংগণের স্থান নির্দেশ করা)। তারপর সেই বাদ্য থামলে দুটি লোক একটি পর্দা (১২´×৮´) আড়াল ক'রে ধ'রে থাকে। দেবতার মাহাত্ম্যমূলক গানের পর একটি নৃত্য (Thodayam), পেনপ্পদ,[৩৮] গীতগোবিন্দ

থেকে গানের সংগে মেলেপ্পদম্[৩৯] এবং তারপর মূল নৃত্যনাট্যের সুরু পরিবেশ অনুযায়ী হয়ত এই রীতির কিছু অদলবদল ঘটতে পারে (যেমন, ঢাক বাজিয়ে লোককে আহ্বান জানাবার প্রয়োজন নেই নাগরিক পরিবেশে !)। কিন্তু পরিবেশনের মূল রীতি অনুসৃত হয়। কথাকলির মতো কুচ্চিপুড়ি প্রভৃতি নৃত্যনাট্য বা নৃত্যাভিনয় এমনিই কতকগুলি অনুশাসনের বা রীতি-পদ্ধতির অধীন।

বলা বাহুল্য, মূল পার্থক্য এখানেই। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য-গুলির মঞ্চকলা বা পরিবেশন রীতি যথাস্থানে আলোচিত। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এগুলির পরিবেশন রীতি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কথাকলির মতো ভরতনাট্যম্, মণিপুরী বা কত্থক মূলতঃ তালবাদ্যযন্ত্র-কেন্দ্রিক নৃত্যধারা। গীতি-অংশ থাকলেও তালযন্ত্রের প্রাধান্যই স্বীকৃত। এমনকি, কথাকলির মতো নৃত্যনাট্যে যেখানে পদম্‌কে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়, সেখানেও তালযন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে পরস্পরের মধ্যে সমধর্মিতা রয়েছে। প্রসংগত সিংহলের ক্যাণ্ডিনৃত্যের কথাও স্মরণযোগ্য।

রবীন্দ্র-নৃত্যধারায় বা নৃত্যনাট্যে মণিপুরী বা দক্ষিণী নৃত্যধারার প্রভাব স্বীকার ক'রে নেবার (যথাস্থানে আলোচিত) সংগে সংগেই মনে হয়, কবি এইসব নৃত্যধারার বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানেননি বলেই স্বচ্ছন্দে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে এক নূতন নৃত্য-পদ্ধতি বা আংগিক সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যা' রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য এবং যা অন্যত্র দেখা যাবে না। কথাকলির মতো নিছক মুদ্রাভিনয়ের দিকটি যেমন গ্রহণ করেননি তিনি, তেমনি লঙ্ঘন করেছেন তালযন্ত্রের বাদ্যের অতিরিক্ত শাসন। আগেই বলা হয়েছে, গীতিনাট্যের মতো নৃত্যনাট্যেও ভাবানুযায়ী গানগুলি অভিনীত হয়, নিছক সংস্কারের দাসত্ব করে না। এদিক থেকেও দর্শক পার্থক্য

অনুভব করবেন অন্যান্য নৃত্যনাট্যের থেকে। আনন্দর 'জল দাও মোরে জল দাও' গানটির উল্লেখ ক'রে অব্যবহিত পূর্বেই বলেছি যে, এই অংশটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপায়িত হতে পারে। এক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবব্যক্তিকেই স্বীকার করেছেন।[৪০] এইভাবেই তিনি নৃত্যধারার প্রচলিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নৃত্যকে এইভাবে গণ্ডীমুক্ত করা অনেকেরই হয়ত ভালো লাগে না। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যকে অন্যান্য নৃত্যনাট্যের থেকে পৃথক আসন বা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। রসিক দর্শক এইভাবে সহজেই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের স্বরূপটি অনুভব করতে পারেন।

নৃত্যনাট্যের রূপান্তর—

"বাল্মীকি প্রতিভা"র দ্বিতীয় সংস্করণের (১২৯২, ফাল্গুন) প্রায় সাতবছর পরে ১২৯৯ সালের ২৮শে ভাদ্র 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য প্রকাশিত। এই 'চিত্রাঙ্গদা' পরবর্তীকালে ১৩৪৩ সালে, অর্থাৎ ৪৪ বছর পরে যে নবরূপ নিলে, তাকেই আমরা 'নৃত্যনাট্য' চিত্রাঙ্গদা রূপে দেখি। ১২৯৯ সালের 'চিত্রাঙ্গদা' 'বিসর্জনে'র যুগের রচনা যখন কবি প্রচলিত নাট্যরীতিকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু ১৩৪৩ সাল 'পুনশ্চ'র পরের যুগ, যখন কবি গদ্যছন্দের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তারই প্রভাব পড়েছে কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্যের আংগিকে।

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাটকের মূলে আছে মহাভারতের কাহিনী।[৪১] মূলকাহিনীর যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন কবি, বা বলা উচিত নবরূপ দান করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এই সৃষ্টিকে কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে তুলনা করা চলে।[৪২] মহাভারতের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলিকে আরো উজ্জ্বল ও পূর্ণ ক'রে

তুলেছেন, যা মহাকবির লেখনীর সামান্য স্পর্শে 'উপেক্ষিত' ছিল, তা'ই রবীন্দ্রনাথের রচনায় পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মূল কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার কাহিনী সুরু হয়েছে 'অনঙ্গ আশ্রমে', যেখানে উপস্থিত চিত্রাঙ্গদা, মদন ও বসন্ত। চিত্রাঙ্গদা মদনের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে দেখি, সে তার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনার মধ্যে অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গটি জানিয়েছে; অবশেষে অর্জুনকে রূপমুগ্ধ করবার জন্যে মদনের কাছে বর প্রার্থনা এবং নাটকের পরিণতিতে নারী-জীবনের বাসনার কথা জানবার পর, অর্জুন বলেছে— 'প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।' পক্ষান্তরে যদিও মূল কাহিনী প্রায় অবিকৃত, তবু নৃত্যনাট্যের কাহিনী-বিন্যাস অন্য রূপ। নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে আছে চিত্রাঙ্গদার শিকার আয়োজন এবং শেষে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মিলন। বলা বাহুল্য, আঙ্গিকগত পার্থক্যই এই রূপান্তর এনেছে।

চরিত্রগত পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। মূল নাটকে চরিত্র ছিল— চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন, মদন, বসন্ত এবং বনচরগণ। নৃত্যনাট্যে এর বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। অর্জুন চরিত্রটি কাব্যনাট্যেও প্রাধান্য পায়নি, এক্ষেত্রেও প্রায় গৌণ; মুখ্য চরিত্র সহচরীগণসহ চিত্রাঙ্গদা।[৪৩] মদন চরিত্রটি যথাযথ থাকলেও সহচর বসন্ত চরিত্রটি বর্জিত হয়েছে নৃত্যনাট্যে। বনচরবৃন্দ নৃত্যনাট্যে গ্রামবাসীতে পরিণত, অর্জুনের বন্যসহচরদের উল্লেখ আছে, যদিও তা' চরিত্র হিসেবে নয়।

আঙ্গিকগত পরিবর্তনের আলোচনায় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ছন্দ। কাব্যনাট্যে প্রবহমান পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত, যেমন বিসর্জন, বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন-এ। নৃত্যনাট্যের সংলাপ মুক্তবন্ধে।

সুতরাং ভাষার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। গানের, বিশেষতঃ নৃত্যের উপযোগী গানের থেকে নাটকের ভাষাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। কেননা, গানের ভাষা মূলতঃ সংহত ও সুনির্বাচিত হওয়া দরকার। এইজন্যে কাহিনীর খুব বেশী পার্থক্য না ঘটলেও, নৃত্যনাট্যকে আসলে নতুন সৃষ্টিই বলা যায়। তবু নৃত্যনাট্যের মধ্যে মূল কাব্যনাট্যের ভাষা সামান্য পরিবর্তিত আকারে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত। যেমন—

১. চিত্রাঙ্গদা। "…ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"

২. বনচর। …শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থ পর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।
অর্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক তিনি ?
বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা, অনুরক্ত প্রজাদের
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

৩. অর্জুন। কাহারে হেরিনু ? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া ?

৪. মদন। তবে তাই হোক

৫. চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে

যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

৬. অর্জুন। প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

নৃত্যনাট্যে এই অংশগুলির রূপান্তর যথাক্রমে :

১. বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে—
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী॥

২. গ্রামবাসী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি।
গোপন ব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা, তিনি রাজকুমারী।
অর্জুন। নারী! তিনি নারী!
গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা,
বাহুবলে তিনি রাজা!
তাঁর নামে ভেরী বাজা,······

৩. অর্জুন। কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া,
সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া!

৪. মদন। তাই হোক্, তবে তাই হোক্···

৫. চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি।
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।

যদি পার্শ্বে রাখো মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ আমি শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী॥

অর্জুন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি॥

এই নৃত্যনাট্যের রূপান্তর প্রসঙ্গে আরো একটা স্মরণযোগ্য। মূল কাব্যনাট্যে মদনের বরে চিত্রাঙ্গদা কুরূপা থেকে সুরূপা হয়েছে। কিন্তু তা স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত নয়, যেমন দেখি নৃত্যনাট্যে। দৃশ্যগত পরিবর্তনও লক্ষণীয়। কাব্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার দৃশ্যবিন্যাসও শিথিল। বিশেষভাবে সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্য দুটি নাটকীয়তার দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ। সে ক্রটি নৃত্যনাট্যে সংহতি লাভ করেছে।

চিত্রাঙ্গদার উৎস যেমন কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য শ্যামার উৎস তেমনি পরিশোধ নৃত্যনাট্য (নাট্যগীতি) এবং পরিশোধ কবিতা। 'কথা ও কাহিনী'র মধ্যে এই কবিতা সংকলিত ও লিখিত হয় ২৩শে আশ্বিন, ১৩০৬ সালে। এই কবিতাকে কেন্দ্র ক'রে ১৩৪৩ এর আশ্বিনে পরিশোধ নৃত্যনাট্য রচিত হয়। অতঃপর ১৩৪৬ সালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতরূপে শ্যামা নৃত্যনাট্যের জন্ম। পরিশোধের কাহিনী বা আখ্যানভাগ নেওয়া হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থের 'মহাস্তবদান' অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে।[৪৪]

পরিশোধ কবিতাটিও ১৪ মাত্রার প্রবহমান পয়ারে লেখা। সূচনা :—

"রাজকোষ হতে চুরি ! ধরে আন চোর,
নহিলে নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর
মুণ্ড রহিবে না দেহে।" —এই রাজ-ভর্ৎসনা।

অতঃপর, 'বিদেশী পথিক পান্থ তক্ষশীলাবাসী' বজ্রসেনের দুর্দশা, শ্যামার প্রসাধনের সময়ে প্রহরী-হস্তে বন্দী বজ্রসেনের প্রবেশ ; অনন্তর উত্তীয়ের আত্মদান, ইত্যাদি প্রসঙ্গ সমেত যে-কাহিনী এই কবিতার মধ্যে পাই, সেই কাহিনীই পরিশোধ নৃত্যনাট্য বা শ্যামা নৃত্যনাট্যের উপজীব্য। কিন্তু যে রূপান্তর ঘটেছে, তা আঙ্গিকগত ; কবিতা থেকে নৃত্যনাট্য—পরে, নৃত্যনাট্য পরিশোধ থেকে নৃত্যনাট্য শ্যামা-য়।

পরিশোধ নৃত্যনাট্যের সুরু এইভাবে—

শ্যামা। এখনো সময় নাহি হল
নাম-না-জানা অতিথি—
আঘাত হানিলে না দুয়ারে
কহিলে না দ্বার খোলো।

তার পর প্রহরীদের প্রবেশ—

রাজার আদেশ ভাই—
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই !
কোথা তারে পাই ?
যারে পাও তারে ধরো
কোন ভয় নাই।

এর পরেই বজ্রসেনের প্রবেশ এবং প্রহরীর গান—'ধর্ ধর্ ঐ চোর ঐ চোর।'

পক্ষান্তরে, শ্যামা নৃত্যনাট্যের সুরু :

বন্ধু। তুমি ইন্দ্রমণির হার
এনেছ সুবর্ণ দ্বীপ থেকে
তোমার ইন্দ্রমণির হার—

তারপর বজ্রসেনের উত্তর, প্রহরীর আগমন, বজ্রসেনের পলায়ন। দ্বিতীয় দৃশ্যের সুরুতে সখীরা গেয়েছে, 'হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া' উত্তীয় বলেছে : 'মায়াবন বিহারিণী হরিণী গহন স্বপন সঞ্চারিণী।' উত্তীয় বিদায় নেবার পর শ্যামা যখন সখীদের সঙ্গে নৃত্যচর্চারতা, তখন বজ্রসেনের পিছনে প্রহরীর আগমন এবং তখনকার গান— 'ধর্ ধর্ ঐ চোর ঐ চোর।' দেখা যাচ্ছে, বন্ধুর ভূমিকা নবাগত। এবং শ্যামা নৃত্যনাট্যের দৃশ্যবিন্যাসেও বেশ পূর্ণতা রয়েছে। নাটকীয় কৌশলের দিক থেকে শ্যামা নৃত্যনাট্যের রূপান্তর পরিশোধ নৃত্যনাট্যের অপূর্ণতা দূর করেছে। পরিশোধ নৃত্যনাট্যের এই আঙ্গিকগত পরিবর্তনের সঙ্গে স্বভাবতঃই বেশ কিছু গান যেমন বর্জিত, তেমনি সংযোজিত হয়েছে। এ ছাড়া পরিশোধ নৃত্যনাট্য মোট ৪টি দৃশ্যে সমাপ্ত। পক্ষান্তরে, দৃশ্যসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও, আরো বৃহৎ কলেবরে পূর্ণাঙ্গভাবে শ্যামা নৃত্যনাট্য রচিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন উত্তীয়[৪৫] চরিত্র, পরিশোধ-এ যা অনুপস্থিত। এবং মতভেদবহুল উত্তীয়বধ[৪৬] দৃশ্যটি শ্যামা নৃত্যনাট্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। শ্যামা নৃত্যনাট্য উত্তীয়বধের উপযোগিতা বা মূল্যায়ণের চেষ্টা অন্যত্র[৪৭] করেছি এই প্রসঙ্গে দুটি মন্তব্য স্মরণ করছি :

(ক) "......প্রথমবারের অভিনয়ে এই নাটিকায় কতকগুলি অংশ ছিল না। সেগুলি পরের বারে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের সময় 'উত্তীয়' চরিত্র ও ঘাতকের দ্বারা তার হত্যার

দৃশ্যটি এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হত্যার দৃশ্যটি সমালোচকদের কারো কারো মতে ‘শ্যামা’ নাটকের একটি দুর্বল অংশ। গুরুদেবও তাই মনে করতেন, তবুও তিনি ঐ অংশটি নাটক থেকে বাদ দেননি। হত্যার দৃশ্যটি তালযন্ত্রের বোলের সঙ্গে রেখেছিলেন। এই অংশটা নাটকের মাঝখানে দর্শকের চিত্তকে মৃত্যুর দৃশ্যে ও ঘাতকের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে রসান্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম দেয় বলেই হয়তো গুরুদেব এই অংশটি বাদ দেননি।[৪৮]

(খ) হত্যার দৃশ্যটি সম্বন্ধে সমালোচকরা মনে করেন যে এইটি নাটকের দুর্বল অংশ। কবি সেটি জানতেন; পারিপার্শ্বিকের অনুরোধ-উপরোধে এই অবান্তর অংশটি যোগ করিয়া দেন ও ঘাতকের নৃত্যাদির দ্বারা অভিনয়ের মধ্যে নূতন রস আনয়ন করেন।[৪৯]

এই দৃশ্য-যোজনায় হয়ত কবির সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু যদি নৃত্যনাট্যের শিল্পরীতির দিক থেকে বিচার করি তাহলে দেখবো—এই দৃশ্যটি ‘বেশির ভাগ’ একটা ঐশ্বর্যই নয়, বরং অপরিহার্য, এই নৃত্যনাট্যের সমগ্রতার মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। শ্যামা নৃত্যনাট্যের মর্মকথা হল, প্রেমের মধ্যে কলুষতা বা পাপ যেন না থাকে। পাপের স্পর্শে প্রেম লাভ হয় না। পাপ কী? কবি বলেছেন, আংশিকের প্রতি আসক্তিবশতঃ সমগ্রের প্রতি অবমাননা অর্থাৎ সত্যধর্মের অবমাননা। বজ্রসেন ও শ্যামার ভালোবাসার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই, কিন্তু প্রেমের চরিতার্থতার জন্য শ্যামাকে পাপের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত বজ্রসেনের পদাঘাতে লাঞ্ছিতা হয়েও পুনর্বার যখন, ‘এসেছি প্রিয়তম ক্ষম মোরে ক্ষম’ বলে উপস্থিত হয়েছে শ্যামা, সেই মুহূর্তে বজ্রসেন ধিক্কার দিয়ে বলেছে—‘যাও—যাও—চলে যাও।’ প্রেমের এই ব্যর্থতা, শ্যামা

নৃত্যনাট্যের এই ট্র্যাজেডির মূলে রয়েছে ঐ উত্তীয়, এবং আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে উত্তীয়বধের দৃশ্যটি। ট্র্যাজেডি উভয়ত। শ্যামা পদদলিতা ধিক্কৃতা হয়েছে বলেই নয়, ভালোবেসেও যে বজ্রসেন তাকে গ্রহণ করতে পারলে না সে জন্যেও বটে। শ্যামাকে আঘাত ক'রে বজ্রসেন যখন চলে গেল, তখন নেপথ্যে যে গানটি রয়েছে, তার কথা হল "...এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো, হারালো কলঙ্কে, অসম্মানে।" কিসের কলঙ্ক? উত্তীয়বধের।

এই দৃশ্যটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলা উচিত, নৃত্যনাট্যের এটি কেন্দ্রীয় ঘটনা। নৃত্যনাট্যটির নাটকীয় গতির কেন্দ্র এই দৃশ্যে নিহিত। এখানে গীতিনাট্যের কথা বলা হচ্ছে না, কবিতারও নয়, এমনকি একক-পাঠের কথাও নয়। নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র চরম মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে শেষ দৃশ্যের সীমান্তে, যেখানে তার আবেগ চরমে উঠেছে—'ওমা, ওমা, ওমা ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র'। চিত্রাঙ্গদাতেও দেখি সেই চরম মুহূর্ত—যেখানে অর্জুনের মনে জেগেছে দ্বন্দ্ব, যাকে সে পেয়েছে তাতে সে খুশী নয়। শ্যামার উত্তীয়বধের দৃশ্যটিও তাই। নাটকের চরম মুহূর্ত তাকেই বলা যায়, যখন বিভিন্ন চরিত্রের ও আবেগের ঘাতপ্রতিঘাত দুটি ঢেউয়ের আঘাতের মতো চরমে পৌঁছায়। এই দৃশ্যটিও আবেগ ও ঘটনার সংঘাতের চরম পরিণতি লাভ করেছে।

এই দৃশ্যকে যদি বর্জন করা হত বা নেপথ্যে রাখা যেত? তাহলে কোনো ক্ষতি হতো কি? নিশ্চয়ই এবং নৃত্যনাট্যটি অপূর্ণ থেকে যেত। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ যে 'রসান্তর'-এর কথা বলেছেন, তা' এই দৃশ্যটির জন্যই। অর্থাৎ এই দৃশ্যটি যদি বর্জিত হতো বা উপস্থাপিত না হতো, তাহ'লে নাটকীয় চরম মুহূর্ত বলতে কিছু থাকতো না, কিংবা বলা চলে রস-বৈচিত্র্য ঘটতো না। কাব্যের আদর্শের দিক

থেকে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু নৃত্যনাট্যের কলাশৈলীর বিচারে এই দৃশ্য সুনিশ্চিতভাবে 'দুর্বল অংশ' নয়, এবং তাকে বিচ্ছিন্ন বা নেপথ্যে রাখলেই নৃত্যনাট্যটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে এই দৃশ্যটির রূপায়ণে দেখা দরকার যেন সংহতি বা মাত্রা বজায় থাকে, বীভৎস রসে যেন পরিণতি না ঘটে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই দৃশ্যের উপযোগিতার কথা অনুভব করেছিলেন নিশ্চয়ই। তাছাড়া ভারতীয় নৃত্যনাট্যে হত্যার দৃশ্য যে আদৌ অবাঞ্ছিত নয়, কথাকলি নৃত্যনাট্য তার প্রমাণ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পরিশোধ নৃত্যনাট্যের এই রূপান্তর একান্তভাবে শিল্পসম্মত। আর এই দৃশ্য পরিকল্পনার জন্যে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর শিল্পবোধ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

কালের দিক থেকে মূল কবিতা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যের রচনাগত ব্যবধান যথাক্রমে ৩৭ ও ৪০ বছরের। তথাপি, যেমন পূর্ববর্তী নৃত্যনাট্যে কবি মূল উৎস-উপাদান কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন, এই নৃত্যনাট্যেও তেমনি মূল কবিতাকে উপেক্ষা করেন নি, বরং কিছু কিছু অংশ প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ব্যবহার করেছেন। যেমন,

(১) আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্‌গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে ; বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন ঐ ক্ষুদ্র আলয়ে দয়া করি।

'ক্ষুদ্র'র বদলে 'আমার' শব্দটি গানে ব্যবহৃত।

(২) হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

সামান্যই শব্দগত পরিবর্তন ঘটেছে, তাও ছন্দের ও সুরের জন্যেই।

(৩) এ পুরীর পথ-মাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।

এখানেও একই কারণে পরিবর্তন এসেছে।

(৪) হে বিদেশী, এসো এসো—হে আমার প্রিয়
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয় স্বামী
জীবনমরণ প্রভু।

কয়েকটি শব্দ বা বাক্যাংশ গানে বর্জিত—

(৫) কহো মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী
এ দীন দরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।

পূর্বানুগ পরিবর্তন।

(৬) সে কথা এখন নহে।

(৭) কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহ বিবরিয়া

মোর লাগি কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।

পূর্বানুগ পরিবর্তন।

(৮) প্রিয়তম
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ—
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা।......
.....................বালক কিশোর
উত্তীয় তার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজ প'রে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।

(৯) ক্ষমা করো নাথ
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর
তোমা লাগি যা করেছি, তুমি, ক্ষমা করো।

(১০) এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপ ভাগী
এ জীবন করিনি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।

(১১) ছাড়িব না, ছাড়িব না......।

(১২) তোমা লাগি পাপ নাথ
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মাঘাত।

(১৩) ক্ষম মোরে ক্ষম

গেল না তো সুকঠিন এ পরাণ মম

তোমার করুণ করে।

(১৪) কেন এলি কেন এলি

(১৫) যাও যাও ফিরে,

মোরে ছেড়ে চলে যাও।

—৮ থেকে ১৫ সংখ্যক উদ্‌ধৃতির মধ্যে শব্দগত পরিবর্তন পূর্বানুযায়ী। এখানে লক্ষণীয়, মূল কবিতা থেকে সঙ্কলিত সংলাপ অংশগুলি উদ্দিষ্ট চরিত্রের সংলাপের মধ্যেই ব্যবহৃত। পূর্বোদ্‌ধৃত অংশগুলির সঙ্গে নৃত্যনাট্যের মূল গানগুলির তুলনা করলে চোখে পড়ে, প্রথমে যেভাবে কবিতার সংলাপ লেখা হয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে কবি সেই বাঁধুনিই রেখে গানের তালের কথা ভেবে সামান্য শব্দ সঙ্কোচ, বর্জন অথবা পরিবর্তন করেছেন। ৪-সংখ্যক উদ্‌ধৃতির 'সকল বন্ধন টুটি' বর্জিত; ৫-সংখ্যক উদ্‌ধৃতির 'সম্পূর্ণ জানিতে চাহি' ও 'দীন দরিদ্রজন' পরিত্যক্ত; 'তব' হয়েছে তোমার। ৭-সংখ্যকের 'দুঃসাধ্য' শব্দটির বদলে 'অসাধ্য' এবং 'পরিশোধে'র বদলে 'শোধ' ব্যবহৃত। ৮-সংখ্যকের 'প্রিয়তম' বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং 'সে আমার'-এর বদলে 'মোর'; ৯-সংখ্যকের 'তোমা লাগি যা করেছি' পরিত্যক্ত। ১২-সংখ্যকের 'তুমি শাস্তি দাও' বর্জিত। ১৩-সংখ্যকের 'গেল না তো সুকঠিন' এর বদলে 'গেল না গেল না কেন কঠিন পরাণ মম, তব নিঠুর করে' হয়েছে। ১৫-সংখ্যকের 'মোরে' শব্দটি অব্যবহৃত।

পূর্বালোচিত দুখানি নৃত্যনাট্যের মধ্যে পূর্ব-সূত্র ও নৃত্যনাট্যের যে কালগত ব্যবধান, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি।

চণ্ডালিকা নাটক ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে মাত্র চার বছরের দূরত্ব। মূল নাটকটি রচিত হয় ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে। ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা রচিত।

চণ্ডালিকার ভূমিকায় কবি বলেছেন—"রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাই থেকে এই নাটিকার ভূমিকা গৃহীত।[৫০]

চণ্ডালিকার মূল কাহিনী 'ভূমিকায়' উল্লিখিত। কাহিনীর দিক থেকে চণ্ডালিকা নাটক ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে মূলতঃ কোনো প্রভেদ ঘটেনি। চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে যেমন দেখেছিলাম ভাষাগত বিশেষ মিল নেই দুয়ের মধ্যে, চণ্ডালিকায় কিন্তু তার বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। কয়েকটি গান, কথা এবং নাটকের দুটি দৃশ্যের বদলে তিনটি দৃশ্য ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। পরিত্যক্ত গানগুলি যথাক্রমে :—

১. ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি
২. না, না ডাকব না
৩. আমি তারেই জানি
৪. হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু
৫. হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র
৬. আমি তোমারি কন্যা
৭. মম রুদ্র মুকুল দলে
৮. পথের শেষ কোথায়

— প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, এই নৃত্যনাট্যে মূল নাটকের ৭টি গান যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। গানগুলি : যে আমারে দিয়েছে ডাক, ফুল বলে ধন্য আমি, বলে দাও জল, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, আমায় দোষী করো, আয় তোরা আয়, দুঃখ দিয়ে মেটাব তোর……।

এ ছাড়া, নৃত্যনাট্যে ফুলওয়ালির দল, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা ও অনুচরের ভূমিকা সংযোজিত।

কিন্তু পূর্ববর্তী নৃত্যনাট্যদ্বয়ের যে রূপান্তর অর্থাৎ আঙ্গিকগত পরিবর্তন, চণ্ডালিকার পরিবর্তন বা রূপান্তর তদ্রূপ নয়। মূল নাটকের ভাষা গদ্য, মাঝে মাঝে গান ; অন্যান্য ঋতুনাট্য বা তাসের দেশে-র মতো গীতাভিনয়ের রীতিতে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, গদ্যে ব্যবহৃত সংলাপকে তিনি বিশেষ কোনো পরিবর্তন না করেই ছন্দে বেঁধে সুরারোপ করেছেন। কথ্য রীতিকে ছন্দে বাঁধার দৃষ্টান্ত লক্ষ্মীর পরীক্ষার মধ্যে দেখি। কিন্তু চণ্ডালিকা নাটকের গদ্যকে গানে পরিণত করার মধ্যে এই প্রচেষ্টা অনেক বেশি সার্থক। আগাগোড়া তিনি নাটকটিকে সম্পূর্ণভাবে অন্য ছাঁচে ঢেলেছেন মাত্র। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই পরীক্ষা যুগান্তর এনেছে সুরারোপ ও ছন্দের দিক থেকে। গদ্যছন্দ শুধু কবিতার মধ্যেই নয়, এই নৃত্যনাট্যের গানের মধ্যে প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী গানের আঙ্গিক বদলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র এ দিক থেকেই বলা যায় চণ্ডালিকা নৃত্য-নাট্যের গীতি অংশ অনন্য। উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা গেল :

মা। আশ্চর্য করলি তুই। ......পুরাণ কথা শুনেছি, উমা তপ করেছিলেন ... ... রোদে পুড়ে ; তোর কি তাই হ'ল।

—এই উদ্ধৃতির মাঝের অংশ—'বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে' থেকে 'কাক ধুঁকছে আমলকি গাছের ডালে' অংশ বর্জিত হয়েছে, এর রূপান্তর ঘটেছে নৃত্যনাট্যে এই ভাবে :—

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে।
পুরাণে শুনি নাকি তপ করেছেন উমা

রোদের জ্বলনে—
তোর কি হ'ল তাই।

এই নৃত্যনাট্য যে মূল নাটকের কতো অনুগ ও ঘনিষ্ঠ, তা এইভাবে সমগ্র অংশটুকু উদ্‌ধৃত করে দেখানো যায়। ছন্দের ও সুরের দাবীতেই সামান্য পরিবর্তন ক'রে মূল নাটকের গদ্যকেই সুরে ও নৃত্যে বাঁধা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই রূপান্তর তাই পূর্ববর্তী দু'খানি নৃত্যনাট্যের তুলনায় স্বতন্ত্র।

'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য হিসেবেই প্রচলিত, নৃত্যনাট্য হিসেবে নয়। ১৩৪৫ সালে ফাল্‌গুন পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে স্বল্প সংখ্যক দর্শকের সামনে এই নৃত্যনাট্যের আংশিক অভিনয় হয়েছিল।[৫১] এই গীতিনাট্যের রূপান্তর আবার পূর্ববর্তী নৃত্যনাট্যগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র। মায়ার খেলা গীতিনাট্য আসলে ভাবপ্রধান, এবং নৃত্যনাট্যের রূপান্তরে রূপময়তার চিহ্ন রয়েছে। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রয়োজন বোধে কিছু গান বর্জন ও সংযোজন করা হয়েছে।[৫২]

মায়ার খেলা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য—দুটিই সপ্তম দৃশ্যে সমাপ্ত। প্রথম দৃশ্যের সূচনায় মায়াকুমারীদের গান 'মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি' গানটি যথাযথ ভাবে স্থান পেয়েছে নৃত্যনাট্যে। 'চলো সখী চলো' থেকে বাকি অংশটুকু পরিত্যক্ত। সম্ভবতঃ, এই পুনরুল্লেখ বাহুল্য বোধেই বর্জিত। দ্বিতীয় দৃশ্যেরও সুরু পূর্বানুগ, কিন্তু মূল গীতিনাট্যের মায়াকুমারীদের গান যেভাবে বিভক্ত ছিল, তার পরিবর্তে অমরের গানের পর সেটি অবিভক্ত অবস্থায় গীত হয়েছে। মনে হয়, এই পরিবর্তন নৃত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। নৃত্যনাট্যে অমরের গানের পরেই মায়াকুমারীদের প্রবেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান, কিন্তু মূল গীতিনাট্যে 'কাছে আছে দেখিতে না পাও' গানটি পুনর্বার গীত হয়েছে। নৃত্যনাট্যে পুনরাবৃত্তি

বর্জিত; বলা বাহুল্য এর পিছনেও নৃত্যের প্রভাব, নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াস। ইতিমধ্যে কবি নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং তারই প্রভাব রয়েছে এই সংহতির মূলে। তৃতীয় দৃশ্যের পরিবর্তনের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রমদার উদ্দেশে প্রথমা সখীর 'সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা' গানটির পর ছিল তৃতীয়া সখীর গান 'সখী বয়ে গেল বেলা'; তার বদলে শ্যামা নৃত্যনাট্যের অনুরূপ একটি পরিবেশের সঙ্গে সাদৃশ্যবোধে সখীদের 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা' গানটি গৃহীত। এই গানের পর পূর্ববর্তী গানটি সংযোজিত। ভাবের ও রূপের দিক থেকে 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা' গানটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব গভীর; এই গানটির সংযোজনের ফলে কাব্যসম্পদ বেড়েছে। মায়াকুমারীদের 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' গানটি বর্জিত এবং নাটকীয়তার জন্য সরাসরি প্রমদার প্রবেশ ঘটেছে অমরের 'যেয়ো না' গানের সঙ্গে। গীতিনাট্যে এই গানটি ছিল কুমারের। এই দৃশ্যের শেষে ছিল মায়াকুমারীদের গান, তা বর্জিত। দেখা যাচ্ছে, দৃশ্যগুলির মধ্যে যে জটিলতা ছিল, নৃত্যনাট্য তা থেকে মুক্ত।

চতুর্থ দৃশ্যের পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। কাননের এই দৃশ্যে 'মিছে ঘুরে এ জগতে কিসের পাকে' এবং 'তারে দেখাতে পারিনে' গান দু'টি যথাক্রমে ছিল অশোকের ও অমরের; নৃত্যনাট্যে প্রথম গানটি বর্জিত, দ্বিতীয় গানটি শান্তার কণ্ঠে বসানো হয়েছে শান্তার গানের পর সখীর কণ্ঠে 'সুখের লাগি চাহে প্রেম' গানটি আসলে গীতিনাট্যের শেষ গান, মায়াকুমারীদের কণ্ঠে গীত। 'সখা আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি' গানটি ছিল কুমারের, নৃত্যনাট্যে 'সখা' শব্দটি পরিত্যক্ত হয়ে অমরের কণ্ঠে বসানো হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ

উল্লেখযোগ্য, 'অবোধ মন লয়ে ছিল অমরের গান, হয়েছে সখীর। কুমারের 'তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে এবং অশোকের 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' পরিত্যক্ত, 'ভালোবাসে যদি সুখ নাহি' গানটি বিভক্তভাবে অমর ও অশোকের ছিল; অশোকের স্থান নিয়েছে সখী। মায়াকুমারীদের ভূমিকাও বর্জিত। 'সুখে আছি সুখে আছি' গানের সঙ্গে প্রমদা ও সখীদের প্রবেশের দৃশ্যটি নৃত্যনাট্যে যথাযথভাবে রক্ষিত হলেও, মধবের্তী 'ওই কে গো হেসে চলে যায়' গানটি বর্জিত; নৃত্যনাট্যে প্রথম প্রস্থানের পর পুনঃ প্রবেশ ঘটেছে। গীতিনাট্যে এই পুনঃ প্রবেশের পরিবর্তে 'দূরে দাঁড়ায়ে আছে' গানটি এক সঙ্গে ব্যবহৃত। গীতিনাট্যে এই দৃশ্যের সমাপ্তি মায়াকুমারীদের 'প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে' গানে, কিন্তু নৃতানাট্যে এই গানটি রক্ষিত হয়নি, আগেই বলেছি নৃত্যনাট্যে মায়াকুমারীদের ভূমিকা গৌন হয়ে পড়েছে।

নৃত্যনাট্যে পঞ্চম দৃশ্যের সুরু কুমার ও সখীদের যুগ্মগানে 'সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাহা লইব'। গীতিনাট্যে উল্লিখিত অমরের 'দিবসরজনী আমি' গানটি বর্জিত। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'—প্রমদার এই গানটি ও রক্ষিত হয়নি নৃত্যনাট্যে। 'ওগো সখী, দেখি দেখি' গানটিও তাই। অমরের 'ওই মধুর মুখ জাগে' ও বর্জন করা হয়েছে।

নৃত্যনাট্যের ষষ্ঠ দৃশ্যটিকে নব-সংযোজন বলা চলে। কেননা প্রথম গান 'আমার নিখিল ভুবন' যেমন সংযোজিত, তেমনি নিম্নলিখিত গানগুলি বর্জিত :—

১. সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল

২. কাছে ছিলে দূরে গেলে

৩. দেখো সখা, ভুল করে

৪. ওই কে আমায় ফিরে ডাকে
৫. বিদায় করেছ যারে
৬. আমি চলে এনু
৭. সেদিনোতো মধু নিশি
৮. আমি কারেও বুঝিনি
৯. চল্ সখী চল্ তবে
১০. প্রভাত হইল নিশি
১১. মধু নিশি পূর্ণিমার

—সেই সংগে কয়েকটি গান এই গানগুলির পরিবর্তে নব সংযোজিত :

১. ভুল কোরনা ভুল
২. ডেকোনা আমারে ডেকোনা
৩. যে ছিল আমার স্বপনচারিনী
৪. হায় হতভাগিনী

বলা বাহুল্য, এই গানগুলি শুধু রূপসৃষ্টির সহায়তাই করেনি, সমৃদ্ধিও বাড়িয়েছে। 'যে ছিল আমার স্বপন চারিনী' গানটির বিশদ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীকানাই সামন্ত। এখানে শুধু একটি কথা বলা দরকার যে, নৃত্যনাট্যের গানের রূপময়তা বা চিত্রধর্মের জন্মই গানটি এই রূপ নিয়েছে। এর মধ্যে কবির সেই রূপপ্রবন-চেতনারই পরিচয় রয়েছে।

সপ্তম দৃশ্যের রূপান্তরের মধ্যেও কয়েকটি গান বর্জনের চিহ্ন দেখি, যেমন, 'মধুর বসন্ত এসেছে' 'আজি আঁখি জুড়ালো' ইত্যাদি তেমনি অনেকগুলি গান নব-সংযোজন। পরিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক সমাপ্তি। গীতিনাট্যে 'এরা সুখের লাগি প্রেম চাহে প্রেম মেলে না' গানটির মধ্যে একটি করুণ বেদনাঘন আবহাওয়া ফুটে

উঠেছে। পক্ষান্তরে নৃত্যনাট্যের 'আজ খেলা ভাঙার খেলা' ৫৩ গানটি তার বিপরীত; বেদনার মধ্যেও তা' অশ্রান্ত দোলায় মনকে ভরিয়ে রাখে। ভাঙনের চঞ্চল আনন্দে রূপান্তরিত মায়ার খেলা-নৃত্যনাট্যের সমাপ্তি।

বলা বাহুল্য, নৃত্যনাট্যের রূপান্তার নৃত্যকেন্দ্রিক। গীতিনাট্যের কাহিনীগত জটিলতা, কুহেলী ও চরিত্রের অস্পষ্টতা নেই নৃত্যনাট্যে। গীতিনাট্যের প্রচ্ছায়ায় রচিত হলেও নৃত্যনাট্য মায়ার খেলাকে নব রূপায়ণই বলা যায়। দুঃখের বিষয় এই নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে নৃত্যাভিনয়ে রূপায়িত করতে পারেননি। মনে হয়, গীতিনাট্য 'মায়ার খেলার' প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মমত্ব, অনুরাগ বা দুর্বলতা ছিল তাই তিনি এই গীতিনাট্যকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেন।

তবে একটু লক্ষ্য করলে সহজেই অনুভব করা যায়—পূর্বালোচিত নৃত্যনাট্যগুলি যেমন গোড়া থেকেই নৃত্যের প্রেরণায় রচিত, 'মায়ার খেলা'র পিছনে সেই প্রেরণা সর্বৈব নয়। অথচ নৃত্যের সর্বব্যাপী আবেগে ও আনন্দে, নটরাজের অলক্ষ্য আবির্ভাবেই তার শেষ পরিণতি। বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করি' অন্তিমক্ষণই এই নাট্যের ক্রান্তি-মুহূর্ত, সেখানেই পরম রূপান্তর।

নৃত্যনাট্যের কাব্যবস্তু

জীবন ও জগৎকে রবীন্দ্রনাথ কখনো খণ্ডভাবে দেখেননি। তাঁর মতে কোন কিছুর আংশিকরূপে সত্য নেই, সত্য আছে সমগ্রের মধ্যে। মানুষ যে মুহূর্তে খণ্ডিত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখে সেই মুহূর্তে সে আংশিকের প্রতি আসক্তিবশতঃ সমগ্রের প্রতি অবহেলা বা

অবমাননা করে এবং সত্যভ্রষ্ট হয়। এখানেও সেই সীমা ও অসীমের মিলনের প্রসঙ্গ। সীমার মানুষ জীবনকে ক্ষণে ক্ষণে নানাভাবে খণ্ডিতরূপে দেখে বলেই বাইরের সত্য বড় হয়ে ওঠে, ভিতরের সত্য তার কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। তেমনি যে মানুষ বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি কামনা করে সেও সমগ্র সত্যকে জানতে পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল দর্শন ও সত্য এই ধারণার মধ্যেই নিহিত।

প্রেম সম্পর্কেও একই কথা। প্রেম যেখানে রূপজ, যেখানে বাইরের রূপটা বড় হয়ে ওঠে, সেখানে যথার্থ প্রেমের স্পর্শ থাকে না। অনিবার্যভাবে 'সুদর্শনা'র মতো বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য। প্রেমের যথার্থ চরিতার্থতা তখনই, যখন প্রেম রূপজ মোহ থেকে মুক্তি পায়। প্রেমের এই ধারণা কালিদাসের মধ্যেও দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা গেল। প্রেম সম্বন্ধে এই ধারণা উপন্যাস ও কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে, নৃত্যনাট্যের মধ্যেও তার আর-এক প্রকাশ ঘটেছে।

বস্তুতঃ, ত্রয়ী নৃত্যনাট্যের কাহিনীর উপজীব্য প্রেম 'চিত্রাঙ্গদা'য় মানবপ্রেমের ঐ চিত্রই অঙ্কিত। এখানে, চিত্রাঙ্গদার রূপজ প্রেম যখন পরাজিত হল, তখন চিত্রাঙ্গদার নারীত্ব ধিক্কার দিয়ে উঠল, সে নিজের সত্যিকার পরিচয় দিলে। এতোদিন অর্জুনের মনেও যেন কোথায় একটা গ্লানি ছিল। চিত্রাঙ্গদার যথার্থ পরিচয় পেয়ে অর্জুনকেও বলতে হয়েছে, 'ধন্য ধন্য আমি!' 'শ্যামাতেও এই প্রেমেরই ছবি আঁকা হয়েছে, তবে তার পরিণতি ট্রাজেডী। এখানেও সেই রূপের দ্বন্দ্ব, শ্যামা বা বজ্রসেন—দু'জনেই দুজনের রূপে ভুলেছিল। বজ্রসেনের 'মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি' দেখে শ্যামা 'নারকী প্রেমের স্বর্গ' রচনা করতে গিয়ে উত্তীয়কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে

দিতে কুণ্ঠিত হল না। বজ্রসেনও শ্যামার বাইরের রূপটাই দেখলে, তার পরে তার মুখোষ-খোলা বিরূপ দেখেও শিউরে উঠল, রূপজ মোহে অন্তরের অগ্নিশুদ্ধ স্বরূপ দেখবার ধৈর্য বা তপস্যার অভাব হল বলেই তাকে ত্যাগ করলে। বজ্রসেনকে ভালোবেসে তাকে পাবার জন্যে অর্থাৎ আংশিক জীবনসত্যকে স্থান দিতে গিয়ে শ্যামা সমগ্র জীবনসত্যের অবমাননা করলে ব'লেই তার প্রেম ব্যর্থ হল।

চণ্ডালিকার মূল তত্ত্বটিও প্রেম, তবে এ প্রেমের স্বরূপ স্বতন্ত্র। এখানে মানবপ্রেমের আর এক রূপ দেখানো হয়েছে। আনন্দ যে মুহূর্তে প্রকৃতির হাত থেকে জলপান করলে, সেই মুহূর্তে প্রকৃতির জীবনে এল জোয়ার— আনন্দের, মুক্তির, স্বপ্নের, এবং নারীত্বের। সেই নারীত্ব দিয়েই সে আনন্দকে জয় করবার জন্যে অধীর হল শেষে। আনন্দকে পাবার আশায় তাকে নামতে হল নীচে। তার মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে আনন্দের কামনায়; আবর্তের আন্দোলনে প্রবল ঘূর্ণিপাতে আছাড় খেতে খেতে যখন তার সম্বিৎ ফিরে এল, এল অনুশোচনা, অর্থাৎ মোহের ঝড় থামলো, সেই মুহূর্তে আনন্দ তার কাছে এসে বলে— 'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।' এখানে চিত্রাঙ্গদার মতোই প্রেমের চরিতার্থতা।

প্রেম সম্বন্ধে কবির এই ধারণা বা বোধ নতুন নয়। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। 'কুমার-সম্ভবে' পার্বতীর বাইরের রূপের মোহ যখন দূর হল তখনি সে শিবের প্রেম লাভ করল। শকুন্তলার মধ্যেও তাই দেখি; যথার্থ মিলনের জন্যে তাকে এবং দুষ্মন্তকে বিরহের আগুনে জ্বলতে হয়েছে। কিছু পেতে হলে কিছু ত্যাগ করঁতে হয়, ত্যাগ ছাড়া কোনো কিছু লাভ হতে পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রও তাই। নরনারীর প্রেম তখনই সার্থক হয়, যখন তা পারস্পরিক ত্যাগের উপর গড়ে ওঠে।

শ্যামার প্রেম মিথ্যে নয়, কিন্তু প্রেমের জন্যে সে কিছুই ত্যাগ করেনি। তার প্রেম এমনিই অন্ধ যে, একটি তরুণ কিশোরের মৃত্যু ঘটাতেও তার দ্বিধা নেই। সুতরাং ত্যাগ করা তো দূরে থাক্, মোহময় প্রেমের আংশিক সত্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে পাপের গভীরতম পঙ্কে সে নিমগ্ন হয়েছে। তাই যে মুহূর্তে বজ্রসেনের কাছে তার ছদ্মরূপ খসে পড়েছে, সেই মুহূর্তে বজ্রসেন তাকে পদাঘাত করতে এতোটুকু দ্বিধাবোধ করেনি।

শেষ পর্যন্ত সে বজ্রসেনকে পেলে না—তাকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের অদৃশ্য পরিহাস মেনে নিতে হল। অন্যদিকে বজ্রসেনের অন্তর বারবার আর্তনাদ ক'রে উঠেছে শ্যামাকে ফিরে পাবার জন্যে — 'এসো, এসো প্রিয়ে।' সেই প্রিয়তমা সামনে এসে দাঁড়াতেই সে বলেছে— 'যাও, যাও, যাও চলে!' শ্যামা শেষে চলে যাবার পর সে একান্ত অনুতাপে বলেছে—

'ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা
পাপীজন শরণ প্রভু!
মরিছে তাপে মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা,
পাপীজন শরণ প্রভু।
প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানিগো তুমি ক্ষমিবে তোরে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।

ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন শরণ প্রভু ॥

—এখানেই বজ্রসেনের বোধে ও রসিকের চিত্তে যথার্থ প্রেমের মহত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে; যে প্রেম কলুষ অতিক্রম করে যায়, সে প্রেম মঙ্গলের সঙ্গে অভিন্ন।

চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মাধ্যমে তিনি নারীর সত্যিকার কামনা, সত্যিকার রূপটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। চিত্রাঙ্গদা প্রথম জীবনে পুরুষের মতো একটা কৃত্রিম জীবন যাপন করেছিল। অর্জুনের সঙ্গে দেখা হতেই তার সেই 'পুরানো পরিচয়' খসে পড়ল—'এক পলকের আঘাতেই 'মাধবী আপনাকে' চিনতে পারলে। সেই নারী-চিত্রাঙ্গদা অবশেষে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললে—

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী।

—এই চিত্রাঙ্গদাই অর্জুনের কাছে প্রেমের জ্যোতির্ময় আলোকে সুস্নাত পবিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই প্রেমের কাছেই অর্জুন আত্মসমর্পণ করেছে। এখানেও সেই নারী-জীবনের পূর্ণরূপেরই আরাধনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

চণ্ডালিকার দ্বন্দ্বও এই নারীত্বের উগ্র কামনাকে ঘিরে। তার চাওয়ার মধ্যে ছিল আনন্দের আসঙ্গলিপ্সা। যতক্ষণ সে তাতে নিমগ্ন ছিল, ততক্ষণ সে আনন্দের স্বীকৃতি পায়নি। শেষে তার সারা অন্তর আত্মগ্লানিতে ভরে উঠেছে—

আহা কী ম্লান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর।
যাক যাক যাক,—
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিসনে বীরের,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক।

চণ্ডালিকার প্রেম যখন শেষে আত্মনিবেদনের স্বাভাবিক সহজ শুভ্রতায় ফিরে এল, তখনি সে আনন্দের স্বীকৃতি পেল। রবীন্দ্রনাথ এখানেও দেখিয়েছেন, মোহের মধ্যে সত্য নেই—মোহরূপ অন্ধকারের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তবে অরুণোদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়।

এই তিনখানি নৃত্যনাট্যেরই বিষয় বা ভাববস্তু এক—কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণ। শ্যামা-তে তা হয়নি, অশ্রুজলে সমাপ্ত। চিত্রাঙ্গদা-য় তা স্বীকৃত, চণ্ডালিকা-তেও।

প্রসঙ্গতঃ একটা দিকে আলোকপাত করছি। রবীন্দ্র কাব্যের

বিরুদ্ধে অনেকেরই অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর লেখায় জীবনের অন্ধকার দিকটি এড়িয়ে গেছেন বা রূপ দিতে পারেননি। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই, বুঝি শুধু মধুর রূপটিই দেখেছেন। অথচ, নারীর কামনা-বাসনার যথার্থ ছবি 'ল্যাবরেটরী' গল্পের মতো কোথাও যে তাঁর লেখায় নেই তা বলা যায় না। তবু হয়ত একথা সত্য যে, সামগ্রিকভাবে তিনি নারীর মধুর রূপটিই তুলে ধরেছেন। গ্যেটেও ফাউস্ট-এ নারীকে শেষ পর্যন্ত স্বর্গীয় মাধুর্যে ভূষিত করেছেন, কিন্তু তাকে সেই স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন অন্ধকারের পথ পার করে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ সেই সিদ্ধিলাভ করেছেন। এ দিক থেকে এই নৃত্যনাট্যের বিষয়-বস্তুর অনন্যতা সতিই বিস্ময়কর।

নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলা ও রূপসজ্জা ঃ

প্রাক্-নৃত্যনাট্য মঞ্চকলার বিবর্তনের যে ধারাটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত, নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলা তারই ক্রমোত্তরণ। 'তপতী'র ভূমিকায় মঞ্চকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব ও চেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে তারই বাস্তব প্রয়োগ ও পরীক্ষার সার্থকতা ঐ মঞ্চকলায় লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চকলায় নিরলংকৃত সংহতির সঙ্গে যে প্রতীকত্ব দেখা গিয়াছিল, তারই আর-এক নূতন রূপ দেখা গেল, সবশেষে তা "গতি নিল রংয়ের সহজ সরল অলংকরণের দিকে।" [৫৪] বিভিন্ন রংয়ের বৈচিত্র্য[৫৫] ঘটিয়ে কীভাবে মঞ্চের ঘনত্ব ও দূরত্ব নির্দেশ করার চেষ্টা হয়েছিল, তার আগেই আলোচনা করেছি।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে, রবীন্দ্র-নাটকে যখন থেকে নৃত্যকলার প্রবেশ ঘটেছে, তখন থেকেই ঐ পরিবর্তন এসেছে, এবং শেষ পর্যন্ত রঙের সমারোহ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েই নৃত্যনাট্যের

উপযোগী মঞ্চকলার কথা ভাবতে হয়েছে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে 'নৃত্যের উপযোগী মঞ্চকলা' বলতে কী বোঝাতে চাইছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, নৃত্যে দেহভঙ্গী প্রধান বলেই (অর্থাৎ সারা দেহের মধ্যে ভাবব্যক্তি ঘটে বলে) নৃত্যশিল্পীর দেহকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মঞ্চের দৃশ্য বা অলংকার-বাহুল্যের মধ্যে দর্শকের দৃষ্টি যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্যই মঞ্চকলায় নিরলংকৃত ভূষণের প্রয়োজন। আর এই ভূষণ সৃষ্টি হতে পারে বর্ণ-সমারোহে। জানা যায় হলদে, লাল ও নীল রংকেই মূলতঃ ব্যবহার করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে।

ইয়েট্‌স্‌ও মঞ্চকলা সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করেছেন, তাতে লক্ষ্য করা যায়, তিনি ভেবেছেন কেমন করে সম্পূর্ণ ভাবে নট-নটীর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী ও ভাবব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা যায়। তিনি যে নো-নাট্যকলার বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েন ; আমার তো মনে হয় তার কারণ এই যে নো-নাট্যকলায় প্রতীকত্ব তো আছেই, উপরন্তু মঞ্চকলার দিক থেকেও তা' দর্শকদের একান্ত উপযোগী। ইয়েটস্‌-এর লক্ষ্য ছিল দর্শক ও অভিনেতার মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া। এই ভাবে তিনিও অভিনয়কে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জাভা-বলি বা কথাকলির অথবা নো-কাবুকির মঞ্চকলা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। জাভার মুক্ত-প্রাঙ্গণ মঞ্চের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল নিরাভরণ সৌন্দর্য। বাদক ও গায়ক-বৃন্দ মঞ্চের একপাশে বসেন, নৃত্যশিল্পীরা সামনে অভিনয় করেন। কাবুকির কথা আগে বলেছি। কথাকলির মতো নৃত্যাভিনয়ও মুক্ত-প্রাঙ্গণেই হয়ে থাকে। তাছাড়া, আমাদের যাত্রার আসরের

কথাও স্মরণযোগ্য। এ সবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যপট বর্জিত মুক্ত-মঞ্চ এবং দর্শকদের সঙ্গে মঞ্চের ব্যবধানহীনতা। পরিবেশের তারতম্য সত্ত্বেও নৃত্যাভিনয়মূলক এই ধরণের মঞ্চকলায় দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার বেশ একটা যোগসূত্র রচিত হয়। যে ভাবেই দেখা যাক না কেন, মঞ্চকলা সবসময়েই পরিবেশ ও যুগের সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের (নাট্যও) মঞ্চকলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এবং একথাও স্বীকার্য যে, এই মঞ্চকলা নাটকের আঙ্গিকের ভিত্তিতেই বিবর্তিত হয়েছে।

বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের যথার্থ রূপায়ণ করতে হলে মঞ্চকলাকেও তদুপযোগী করা দরকার। নৃত্যনাট্যের রূপ-সমারোহকে ঠিকমতো রূপ দিতে গেলে কোনরকম অস্পষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যালেতে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়। তার অর্থ এই যে, ব্যালে নৃত্যের রূপায়ণে বাইরের আরোপিত সৌন্দর্য প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত—বাইরের কোন ধার-করা সৌন্দর্যের সে অপেক্ষা রাখে না; কেননা আপন স্বরূপে সে আপনি ধন্য। এই জন্যই শান্তিনিকেতনের শিল্পীবৃন্দ (আচার্য অবনীন্দ্রনাথ. গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, প্রমুখ) নৃত্যকে স্বাভাবিকভাবে বিকাশের সুযোগ দেবার কথা ভেবেই মঞ্চকলাকে বর্ণময়, নিরলংকৃত করতে চেয়েছিলেন নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গী, গতি এবং ভাবব্যক্তি যাতে নিখুঁত ভাবে ফুটে ওঠে, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই রংয়ের সহজ সরল অলংকরণে মঞ্চকলাকে ভূষিত করলেন। অর্থাৎ নৃত্যাভিনয়ের ছন্দটি যাতে অব্যাহতভাবে ফুটে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলার এই রূপায়ণ ঘটলো।

পরিবেশন-রীতির দিক থেকে অন্যান্য নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের কিছুটা পার্থক্য আছে। মঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তের

পরিবর্তে পিছন দিকে গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীবৃন্দ সমবেত হয়ে বসেন—সেই অংশটুকু রঙীন্ কাপড়ের আবরণে ঘিরে মঞ্চকে বাস্তবিক-পক্ষে দুভাগে ভাগ করা হয়। সামনের অংশে নৃত্য-শিল্পীরা অভিনয় করেন। উইংসের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান। এই নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের একপাশে উপবিষ্ট থাকতেন। এইভাবেই তিনি চিত্রাঙ্গদার কবিতাংশগুলি আবৃত্তি করেছিলেন। চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামাতে এই রীতিই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তবে চণ্ডালিকার একটি অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে, গায়কের দল দুভাগে বিভক্ত হয়ে পিছনে বসেছেন। মাঝের অংশ ফাঁকা, প্রবেশ-দ্বারের মতো।[৫৬]

বর্তমানে এই মঞ্চকলারই অনুসরণ করা হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্র মঞ্চকলার প্রথম যুগের পরিবেশ ছিল ঘরোয়া, দ্বিতীয় পর্বে শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিসরে (ও কলকতার) বিশিষ্ট দর্শকের উপস্থিতি; তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তরে এই মঞ্চকলা বৃহত্তর জন-সমাবেশের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

এই মঞ্চকলার পিছনে অবশ্য বিভিন্ন আদর্শ কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা বলা কঠিন। তবে মঞ্চকলার রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁর সহকারী শিল্পীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে একথা স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ ভরতোক্ত মঞ্চকলার কথা উল্লেখ করেছেন। আমার মনে হয়, ভরতোক্ত মঞ্চাদর্শের ব্যঞ্জনার দিকটিই তিনি গ্রহণ করেছেন, তার বেশি নয়।[৫৭]

রবীন্দ্র-মঞ্চকলার বিবর্তনের ধারাটি বিস্ময়কর নয় কি? উনিশ শতকের কিংবা বৃটিশযুগের সুরু থেকে বাংলাদেশে নাট্যাভিনয়ের প্রতি যে আগ্রহ বেড়ে চলেছিল, সেই পরিমাণে মঞ্চশিল্প-চেতনা আদৌ বাড়েনি। দুঃখের বিষয়, নাট্য-প্রসাধনের দিকে দৃষ্টি ছিল

না প্রযোজকদের, অথবা বলা যায় মঞ্চকলাকে সুসংহত শিল্পরূপ দেবার কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি। একদিকে প্রচলিত গ্রাম্য পরিবেশের অনুগ মঞ্চকলা, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আদর্শ; এ দুয়ের সমন্বয়েই শেষ পর্যন্ত মঞ্চকলার এই রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

অঙ্গসজ্জা বা রূপসজ্জারও শেষ পরিণতি লক্ষণীয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা'র পার্থক্য গভীর। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিভিন্ন চরিত্র যেমন বিশেষ কোনো দেশকালের মানুষ নয়, তেমনি অঙ্গসজ্জা। এখানেও তিনি বিশেষ অঞ্চলের সাজসজ্জার রীতিকে একান্তভাবে অনুসরণ করেননি। নৃত্যের দিক থেকে মণিপুরী রীতি গ্রহণ করেছেন কিন্তু, রূপসজ্জায় মেখলা বা ঘাগড়া বর্জন করেছেন। তেমনি কথাকলি, ভরতনাট্যম্ অথবা কত্থকের অঙ্গসজ্জার রীতিও গ্রহণ করেননি। অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, বিশেষ ক'রে নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে, তা' যেন নৃত্যভঙ্গির পরিপন্থী হয়ে না দাঁড়ায়। সেই জন্যেই মনিপুরী নৃত্যের অঙ্গসজ্জা বা কথাকলির অঙ্গসজ্জা তিনি স্বীকার করেননি। তেমনি অভিনয়ের ভাবব্যক্তির দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকার জন্যে মুখমণ্ডল অহেতুকভাবে কথাকলির মতো চিত্রিত বা মণিপুরীর (মেয়েদের চরিত্রে) অবগুণ্ঠনের রীতিকে স্থান দেন নি। এক কথায় বলা যায়, চরিত্রের উপযোগী ক'রেই নৃত্যনাট্যেরও রূপসজ্জা রূপায়িত। প্রতিমা দেবী বলেছেন, 'চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকার সাজে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদার মধ্যেই তাই ঝক্‌মকে সাজ, উজ্জ্বল ষ্টেজ······আর চণ্ডালিকার গ্রাম্যভাবের সঙ্গে মিলিয়ে, গ্রাম্য সাজ, দুটি নাটকেরই চিত্রাংশকে নানা রঙে প্রতিফলিত করেছিল।"[৫৮]

মঞ্চকলা প্রসঙ্গে আলোক-সম্পাতের প্রশ্নটিও জড়িত। আলোক-সম্পাতেরও, যেমন রূপসজ্জার, লক্ষ্য হওয়া উচিত অভিনয়কেই সার্থক রূপ দেওয়া। এক্ষেত্রে সব সময় লক্ষ্য রাখা দরকার রঙের ব্যবহার যেন দৃশ্যমান পরিবেশ ও ভাবের উপযোগী হয় এবং কোথাও যেন তার মাত্রাধিক্য না ঘটে! 'নটীর পূজা'য় উপালির প্রবেশে ফিকে নীল রঙের আলো, বা ফাল্গুনীর অন্ধ-বাউলের প্রবেশে নীল রঙের আলো ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে বলা যায়—সর্বত্রই এই আলোক-সম্পাত যেন দৃশ্যমান অভিনয়ের অনুকূল হয়ে ওঠে। এই সব নৃত্যনাট্যের সাম্প্রতিক প্রযোজনায় কোথাও কোথাও চলচ্চিত্রের রীতিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিফলন দেখাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আমার তো মনে হয়, তা' রবীন্দ্রনাথের মঞ্চাদর্শের পরিপন্থী। অতিরিক্ত 'আলোর খেলা' দেখানোর নেশা যেন আলোক-সম্পাতে প্রকাশ না পায়।

ইয়েট্‌স্-এর কথা এই আলোচনার সুরুতে বলতে হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথও তাঁর মতোই একদিকে যেমন নৃত্যাভিনয়কে পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তেমনি দর্শকের ভাবনা ও কল্পনাকে অবাধ মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে রবীন্দ্র-মঞ্চকলা যেখানে এসে থেমেছে, আশা করা যায় সেইটেই সীমান্ত নয়, এ বিষয়ে শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ শিল্পীরা আরো সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবেন। বর্তমান বাংলা তথা ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের দিকে দৃষ্টিপাত করলে চোখে পড়ে—রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই মঞ্চকলার আদর্শ আধুনিক ভারতীয় মঞ্চকলাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে; বিশেষভাবে নৃত্য বা নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে। আর পাশ্চাত্ত্যের মঞ্চকলার দিকে যখন তাকানো যায়—তখন মনে হয়, যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মঞ্চকে 'বাস্তব' করে তোলা হচ্ছে, একদিন দেখা যাবে

তার পিছনে সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। সেদিন সেই বাস্তবানুকৃতির জগৎ থেকে ফিরতে হবে। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের এই মঞ্চকলার আদর্শ একদিন সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করবে। ভারতবর্ষের বাইরে এই নৃত্যনাট্যগুলি পরিবেশন করবার সময় এসেছে আজ। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিপূর্ণ রূপটি বিশ্বের সামনে তুলে ধরবার এইটেই একমাত্র পথ।

উত্তর ভাষণ

এই সমগ্র আলোচনাটি যে বিশেষ একটি তত্ত্ব বা সূত্রের আলোকে আলোকিত সেকথা 'পূর্বভাষণ'-এ বলেছিলাম। আমার মূল বক্তব্য ছিল, রবীন্দ্র-শিল্পচেতনা শেষ পর্যন্ত একটি একাত্ম বা অবিভাজ্য ছন্দোময়তায় পরিণত, নৃত্যনাট্য তারই রূপায়ণ। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এই শিল্পচেতনার দুই প্রান্ত, এক প্রান্তে অঙ্কুর, অন্য প্রান্তে বিকাশ। গীতিনাট্য থেকে কেমন ক'রে ক্রম-বিকাশের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত নৃত্যনাট্যের যু পৌঁছোলেন, কেমন করে নাটকের আঙ্গিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্ত ও রূপান্তর ঘটেছে, অথচ অলক্ষে সেই চলমান ধারা আসলে একা নিদিষ্ট ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে—পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে ত স্পষ্ট হবে।

বলাবাহুল্য, গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে উত্তরণের পথে রবীন্দ্র-প্রতিভা আরো অনেক কিছু সৃষ্টি করেছে—গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, আলোচ তত্ত্বটি কি এইসব রচনা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য ?

এর উত্তরে, আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে, রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তির প্রতিধ্বনি তুলে বলা যায়, তিনি মূলতঃ কবি এবং এই কবি-সত্তা এতো বেশি প্রবল যে, তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এই বিশেষ সত্তাটি ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাব্য, নাটক, ছবি, গানের কথা বাদ দিলাম, প্রবন্ধের মধ্যে, চিঠি পত্রের মধ্যেও কি সেই কবিসত্তার পরিচয় পাই না ? একথা ঠিক, নিছক উপন্য রচনার জন্য চাই বস্তুগত বিশ্লেষণী জীবনবোধ ; কাব্যধর্মিতা ৫

বিশেষ শিল্পের অনুকূল নয়। কিন্তু, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথও সেই শিল্পী-কবি, যিনি সারাজীবন নানা আধারে নানারূপে জীবনের বিচিত্র ছবিই এঁকেছেন। আর, কাব্য অথবা শিল্প আসলে ছবি বা রূপায়ণ ছাড়া কী? কবি নিজেই বলেছেন যে, আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি এই বিরাট রঙ্গশালার বিচিত্র 'রূপকগুলিকে' সাজিয়ে তোলার ভার নিয়েছেন; তিনি সেই বিচিত্রের দূত—যে-বিচিত্র নানা রূপে, নানা রঙে বিশ্বভুবনে খেলে বেড়ান। কবির এই আত্মবিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং রবীন্দ্র-শিল্পবিচারের একমাত্র পথ। বস্তুতঃ আমার বক্তব্য হল, রবীন্দ্র-সৃষ্টি যে পথই অবলম্বন করুক না কেন বা যে রূপেই দেখা দিয়ে থাক না কেন, সব কিছুর মধ্যেই তাঁর কবিসত্তা জড়িত এবং এই কবিসত্তার মূলে আছে এক অভিনব ছন্দোবোধ বা ছন্দ-প্রেরণা। রবীন্দ্রকাব্য বা শিল্প সেই জীবন-ছন্দেরই রূপায়ণ।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবোধ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তৃত না হোক সুমিত আলোচনা করা হয়েছে। 'পূর্বভাষণের' অন্তর্গত সেই আলোচনায় যে সব উদ্‌ধৃতি দিয়েছি, যদিও সেগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা, তা' থেকে বোঝা কঠিন হবে না—ছন্দ সম্পর্কে কবির ধারণা কী। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আসলে কবি সারা বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এক মহাছন্দকে অনুভব করেছেন; বলা যেতে পারে, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেই কবি এক সুর-সঙ্গতি বা হার্মনি আস্বাদ করেছেন। এর পিছনে রয়েছে কবির গভীর জীবনবোধ এবং এই জন্যই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই হার্মনি বা সুর-সঙ্গতির অন্বেষণ করেছেন। ক্ষণে ক্ষণে আড়াল আবডাল থেকে, সামনে থেকে বিশ্বকে দেখেছেন এবং যে ছন্দে সামান্য তৃণ থেকে আকাশের গ্রহতারা আবর্তিত হয়ে চলেছে, তা অনুভব ক'রে পুলকিত হয়েছেন।

কবির এই বিশেষ অনুভূতি অর্থাৎ ছন্দোবোধই তাঁর সমগ্র সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে।

কিন্তু শুধু বিশ্ব বা প্রকৃতিই বা কেন, শিল্পের প্রাণশক্তিও কি ছন্দ নয়? রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গান্তরে সেকথা বলেছেন। বস্তুতঃ শিল্পের মধ্যেও সেই একই ছন্দের লীলা। আর এই ছন্দের অতনু অনুভূতিকে রূপায়িত করাই তাঁর লক্ষ্য।

শিল্পের প্রাণ যে ছন্দ, তা' প্রাচীনকালের ঋষি-কবিরাও অনুভব করেছিলেন, তা' তাঁদের অননুভূত ছিল না। সঙ্গীত সম্পর্কে প্রাচীন কালের যে ধারণা, তা' থেকে বোঝা যাবে, আসলে গীত-বাদ্য-নৃত্য সমন্বয়ে যে শিল্পরূপ তার মধ্যেই রয়েছে অখণ্ড শিল্পবোধ। গীত হচ্ছে সুরান্বিত কথা বা কাব্য, বাদ্যের কাজ প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনি পরিমিতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং নৃত্যের লক্ষ্য হচ্ছে কাব্যের বা গীতের উপজীব্য দেহের ললিত ভঙ্গীর অভিনয়। সুর, তাল, অভিনয়, কাব্য এমন কি নৃত্যের চিত্ররূপের ছন্দই একসঙ্গে 'সঙ্গীতের' মধ্যে বিধৃত। অর্থাৎ প্রাচীন 'সঙ্গীত'-চেতনার মধ্যে এক অখণ্ড ছন্দোময় শৈল্পিক অনুভূতির পরিচয় পাচ্ছি।

সৌভাগ্যবশতঃ সঙ্গীতের এই অখণ্ড ছন্দোময় শিল্পরূপের সন্ধান পাই তৌর্যত্রিক[৫২] শব্দটির মধ্যে : তৌর্যত্রিকম্ (ত্রি+কণ)-(ক্লী) নৃত্যগীতবাদ্যমিদং সমুদিতং ত্রয়ং নাট্যঞ্চ। ইতরমঃ॥ নট-সম্বন্ধি নৃত্য গীতবাদ্যমিতি ত্রয়ম্। ইতি তট্রিকাসার সুন্দরী॥ অর্থাৎ অমর বলেছেন—গীতবাদ্যনৃত্য এই তিনের সমন্বয়েই নাটক। এবং নট সম্বন্ধীয় যা' নৃত্যগীতবাদ্য সমন্বিত, তাই নাটক ; একথা বলা হয়েছে সুন্দরী টীকায়। নৃত্য গীত এবং বাদ্যের সমন্বয়ে যে শিল্পরূপ তাকেই যদি নাটক বলি, তাহলে তা কোন্ জাতীয় নাটক? বলা বাহুল্য,

নাটকে গান এবং বাদ্যের স্থান থাকলেও তৌর্যত্রিক মতে যে নাট্য-কলার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে আধুনিক নাট্যকলার মিল নেই। তাহলে কি তৌর্যত্রিক সূত্রে নৃত্যনাট্যের কথাই বলা হয়েছে? আমার বিশ্বাস, হয়ত তাই। কেননা, প্রাচীন কালে যে নৃত্যনাট্যের অস্তিত্ব ছিল, তেমন দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৬০] সুতরাং এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সঙ্গীত বা তৌর্যত্রিক-এর মধ্যে প্রাচীন নৃত্যনাট্য-জাতীয় শিল্পরূপের পরিচয় রয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, তা সে যে কোন কারণেই হোক না কেন, তার কারণ-সন্ধানও আপাততঃ সম্ভব নয়, তৌর্যত্রিক শিল্পকলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত অথবা রূপান্তরিত। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষের মন ক্রমশঃই বিশ্লেষণপর হয়ে উঠেছে। হয়ত এই কারণেই, অথবা অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও অন্যতম, তৌর্যত্রিক শিল্পরূপ পৃথক ভাবে গীত, বাদ্য এবং নৃত্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে স্বতন্ত্র পথে অবশেষে বিকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ অখণ্ড ছন্দোময় শিল্পরূপ শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত হয়ে পৃথক পৃথক একক ছন্দের আশ্রয় করেছে।

বস্তুতঃ বহু যুগ ধরে তৌর্যত্রিকের 'এক' রূপটি 'বহু' হয়ে গিয়েছে। 'বহু'কে মিলিয়ে পুনরায় 'এক' করার জন্য যে প্রতিভা, সাধনা ও সুযোগের প্রয়োজন, তার প্রয়াস বা নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের আগে কারো মধ্যেই দেখি না। য়ুরোপেও নাট্যকলার নানা সমীক্ষা ও পরীক্ষা দেখেছি। W. B. Yeats-ও সেই চেষ্টা করেছেন! তাঁর Four plays for the Dancers-এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। জাপানী নো, কাবুকী বা জাভা-বলীর নাট্যকলার কথাও যথাস্থানে আলোচিত। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে একটা কথাই মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিল্পীর একক বা সমবেত চেষ্টার মধ্যে গীত বাদ্য নৃত্য সমন্বিত একটি অখণ্ড ছন্দোময়

শিল্পকলার রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সার্থক হয়ে ওঠেনি।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, গীত বাদ্য নৃত্য যে কলায় সমুদিত তাই তৌর্যত্রিক। এই অর্থে নৃত্যনাট্যই তৌর্যত্রিক। আবার নাট্যকলার মধ্যেই শিল্পের এই বিশিষ্ট উপাদানগুলির মেলবার পথ প্রশস্ত। অর্থাৎ শিল্পের বিচারে নাট্যকলাকে একদিক থেকে সর্বোচ্চ স্থান এই জন্যেই দেওয়া যায়। নাট্যকলার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই প্রাচীনকালে নাটককে সমাজ-জীবনে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও দেখতে পাচ্ছি, নাট্যকলাকে কেন্দ্র করেই চারুশিল্পের অন্যান্য শাখাগুলিও বিকাশ লাভ করেছে।

তৌর্যত্রিক-এর সার্থক শিল্প-রূপায়ণ, নৃত্য গীত বাদ্যের সম্যক সমন্বয় বা একীভবন একালে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যেই দেখা গিয়েছে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার গুণে। আগে কী রূপে কোন্ সময়ে ছিল, সম্পূর্ণ ঐক্যপ্রাপ্ত সমন্বয় কোনদিনই হয়েছিল কিনা তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে বা রবীন্দ্রনাথের আগে কেন সেই অখণ্ড ছন্দোময় শিল্পরূপটি দেখতে পাই না, তার কারণ বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনার মূল লক্ষ্য 'বহু'কে (বিচিত্র) 'একের' মধ্যে মেলানো এবং সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নানা দেশের প্রচলিত নাট্যকলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতাই যে তাঁকে নৃত্যনাট্য সৃষ্টির পথে সাহায্য করেছে সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীজীবনের সুরু থেকেই নাট্যকলার প্রতি আগ্রহশীল এবং নতুন নতুন আঙ্গিকের চর্চায় নিমগ্ন ; শেষ পর্যন্ত নাট্যকলার এই বিশিষ্ট রূপায়ণের মধ্যেই তাঁর অভীষ্ট সাধনা সিদ্ধিলাভ করেছে।

নানা ঐতিহ্যের বা সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে তাকে নিজের

করে নেওয়ার প্রবণতা শিল্পীদের মধ্যে প্রায়শঃই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে যে, তিনি নানা উপাদানকে মিলিয়ে নতুন নতুন কলাবিধি, আঙ্গিক ও শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর যে কোন কবি, যে কোন শিল্পীর চেয়ে ভাগ্যবান; তা তাঁর জীবনদেবতারই অভিলাষ, কেননা, বিচিত্রের দূত রূপে তিনি বিভিন্ন দেশের শিল্পকলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। নানা দেশের নাট্য শিল্পকে সামনে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। রবীন্দ্র-চরিত্রে বা রবীন্দ্র-সৃষ্টির মধ্যে যে সমন্বয়ী চেতনা বা মানসের পরিচয় পাই, তার প্রভাব নাট্যকলার মধ্যেও পড়েছে সন্দেহ নেই এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার সার্থক সমন্বয় ও রূপায়ণ দেখা গেল নৃত্যনাট্যের মধ্যে। সেই জন্যই বলতে চাই, নৃত্যনাট্যই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনার সিদ্ধি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা বা নাট্য-কলার যে ধারণা, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তারই প্রকাশ দেখা গেল। এবং আমার বক্তব্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিই সঙ্গীত চেতনায় আলোকিত। বিষয়টি স্বতন্ত্র গবেষণার যোগ্য। শিল্পী বা কবিজীবনের সুরু থেকেই সঙ্গীতানুরাগই তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই প্রবণতা একান্তভাবেই মৌলিক। এ কথা ঠিক যে, লিরিক বা গীতিকবির প্রবণতাও অনুরূপ; তবে সে প্রেরণা প্রায়শঃই নির্বস্তু, প্রত্যক্ষভাবে তা সঙ্গীত বা গান হয়ে ওঠে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা হৃদয়ের অন্তরালবর্তী পরোক্ষ প্রেরণা হয়েই থাকে নি, তা প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্দীপন-বিভাব হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে-কোন কবিতা আস্বাদ করলেই বোঝা যাবে, গীত-

রসের থেকে উৎসারিত বলেই তার মধ্যে এক অপূর্ব ধ্বনি-লাবণ্য রয়েছে। তাঁর কবিসত্তাও সঙ্গীত চেতনায় উদ্‌ভাসিত, তাই রবীন্দ্র-নাথের কবিতা মাত্রই গান, গান মাত্রই কবিতা।

বস্তুতঃ, কবি স্বতন্ত্রভাবে ক্রমানুসারে কাব্য, গীত, এমন কি নৃত্যের চর্যাতেও মগ্ন হয়েছেন এবং তবেই শেষ পর্যন্ত সেগুলি একত্র মেলাবার পথ খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ একক ছন্দগুলি শেষ পর্যন্ত একটি আধারে মিলে অবিভাজ্য ছন্দোময়তায় রূপ নিয়েছে। এই জন্যই 'পূর্বভাষণে' আমার বক্তব্য ছিল গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত ধারাটির ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের ঐ বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাচ্ছি। গীতিনাট্যে যার সূচনা, নৃত্যনাট্যে তারই পরিণতি। এবং এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি আকস্মিক কোন যোগাযোগ নয়, একান্ত ভাবেই অন্তঃস্রোতের মতো আপন অভীষ্ট পথের মানস-অভিসার।

গীতিনাট্য-আলোচনার পরিণামে দেখেছি, ঐ ছন্দশ্চেতনা সেখানে সর্বাত্মক হয়ে ওঠেনি; সেখানে তার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। গীতিনাট্যের কৃত্য ছিল কথা, সুর ও অভিনয়কে মেলানো; নৃত্যনাট্যের কৃত্য হচ্ছে কথা, সুর ও নৃত্যকে মেলানো। মূল পার্থক্য অভিনয়ে ও নৃত্যে। অভিনয় দর্পণ-এর ৩৮-সংখ্যক সূত্রের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই সূত্রে বলা হয়েছে—আঙ্গিকো বাচিকস্তদ্বদাহার্যঃ সাত্ত্বিকোহপরঃ' অর্থাৎ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক—এই হচ্ছে চতুর্বিধ অভিনয়। অঙ্গের দ্বারা আঙ্গিক অভিনয়, কাব্যনাটকে বাক্যের দ্বারাই বাচিক অভিনয়; হার কেয়ুর বেশ প্রভৃতি শারীর অলংকরণ যা' আহৃত হওয়াতেই চরিত্রের পরিস্ফুটনে সাহায্য হয় তাই আহার্য এবং ভাবজ্ঞাপক অভিনয়ই হল

সাত্ত্বিক। এই সূত্রটির আগে ৩৫-৩৭ সংখ্যক সূত্রে নৃত্য গীত ও অভিনয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'নৃত্যংগীতাভিনয়ন ভাবতলযুতং ভবেৎ'। ৪২ সংখ্যক সূত্রটিও উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রে আঙ্গিক অভিনয়ের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের দ্বারা তিনটি রূপে প্রকাশিত হয়। আঙ্গিক অভিনয়কে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে আরো তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়;—অঙ্কুর, নৃত্ত ও নৃত্য। দেখা যাচ্ছে, নৃত্য আঙ্গিক অভিনয়েরই অন্তর্ভুক্ত। তাহলে অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের পার্থক্য কোথায়? অভিনয় যেমন অঙ্গের অভিব্যক্তি, নৃত্যও তাই। এ' দুয়ের পার্থক্য আসলে ছন্দের। নৃত্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ছন্দ রূপায়িত।

'পূর্বভাষণে' উল্লিখিত ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এখানে পুনর্বার স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হচ্ছে, ছন্দ এমন এক 'বস্তু' যা' জড়ের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে—"দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।" নৃত্যের ও মূল স্পন্দন এই ছন্দোময়তা—"নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ।"[৬১] বস্তুতঃ অভিনয় সুস্পষ্টভাবে ছন্দোময় নয়, নৃত্য সুস্পষ্টভাবেই ছন্দোময়। এই দিক থেকে বিচার ক'রে, গীতিনাট্যের গায়কীর আলোচনা থেকে বোঝা যাবে গীতিনাট্য সর্বাঙ্গীণ ছন্দোময়তা পায় নি।

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য উভয়ের মধ্যবর্তী আয়োজন-পর্বে কী ভাবে নৃত্য এসে রবীন্দ্রনাট্যকলায় স্থান পেয়েছে, তাও যথাস্থানে আলোচিত। দেখা গেল, নৃত্যের সংযোগ ঘটায় শেষ পর্যন্ত কথা, সুর, অভিনয় (অঙ্গভঙ্গী) সমস্তই অবিচ্ছিন্ন ছন্দোময়তা লাভ করল অর্থাৎ বিভিন্ন রসকলার বিচিত্র ধারাগুলি এক সংগমক্ষেত্রে এসে মিলেমিশে যেন একটি ধারাতেই পরিণত হল। এইভাবে

বিচ্ছিন্ন ছন্দগুলি একাত্ম বা অবিভাজ্য রূপ নিয়েছে। বলা উচিত, বিভিন্ন ধারা এমন এক ক্রান্তি মুহূর্তে এসে পৌঁছোলো যখন মিলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। কাব্য, গীত ও অভিনয়—তিনের এই যে সর্বাত্মক ছন্দ-অভিসার, তার বিভিন্ন ঘাট অবশ্য আছে, ক্রমও আছে এবং গতি পরিবর্তন অর্থাৎ অল্পস্বল্প মোড় ফেরার ব্যাপার আছে; সেই ব্যাপারটি ভালোভাবে ধারণা করা যায় রবীন্দ্রনাথের তিনখানি নৃত্যনাট্যের বিকাশ ও বিবর্তনের পর্যালোচনায়। নৃতনাট্যের গায়কী বিচারে বলা হয়েছে, লয়ের তারতম্য ঘটতে পারে কিন্তু সর্বত্রই (কিন্তু গান ছাড়া[৬২]) ছন্দ বজায় রাখা দরকার এবং গীতিনাট্যের সঙ্গে নৃত্যনাট্যের এইটেই মূল পার্থক্য। অর্থাৎ একটি অখণ্ড প্রেরণা থেকেই নৃত্যনাট্যের জন্ম; এক অখণ্ড ঐক্য লক্ষ্য অলক্ষ্যভাবে তার অন্তরে বাহিরে এবং আদ্যন্তে বিরাজমান।

গীত বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে তৌর্যত্রিক সূত্র অনুসারে ভরত প্রাচীন কালেই এক ধরণের নৃত্যনাট্য-জাতীয় নাট্যকলার কথা বলেছেন। ভরত অবশ্য মুদ্রাপ্রধান অভিনয়েরই পক্ষপাতী। নৃত্যনাট্যের এই আদর্শ যুগে যুগে চলে আসছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যকেই নতুন রূপে রূপায়িত করলেন। মঞ্চকলার দিক থেকে যেমন তিনি ভরতের মঞ্চকলাকে স্বীকৃতি দিলেও তার অনুকরণ করেন নি, তেমনি রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যও পুরোপুরি তৌর্যত্রিক সূত্রের অনুকরণ নয়। হয়ত কথাকলির মত নৃত্যনাট্যকেই ভরতের আদর্শে তৈরী নৃত্যনাট্য বলা যায়। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে, নৃত্যনাট্য হিসাবে এগুলি মোটেই সম্পূর্ণ নয়। কোথাও বা অভিনয়ের প্রাধান্য, কোথাও বা নৃত্যের, কোথাও বা প্রধান গীত। অর্থাৎ শিল্পের বিচারে বলা যায়, নানা স্তরের নানামুখী

ছন্দগুলি সম্মিলিত হয়ে এক অখণ্ড ছন্দ-প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে নি। বহু সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোগ ক'রে শিল্পী ভুবনমোহন এক মূর্তি রচনা করলেও এক প্রাণে সমস্তই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নি, এক সত্তা, এক চরিত্র লাভ করেছে বলতে একটা কেমন দ্বিধা থেকে যায়।

তৌর্যত্রিক সূত্রে বাদ্যের কথা উল্লিখিত। কথাকলির মতো নৃত্যনাট্যে (এমন কি অন্যান্য নৃত্যধারাতেও) বাদ্যের স্থান আছে, গানও তার অঙ্গীভূত। এই বাদ্যের তাৎপর্য কী? সম্ভবতঃ ছন্দকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা এবং এই সূত্রে উল্লিখিত বাদ্য যন্ত্রেরও তাই উপজীব্য। কাজেই, গীত বাদ্য ও নৃত্যের সম্মিলিত রূপের কথা উল্লিখিত হ'লেও তার সার্থক প্রয়োগবিজ্ঞান বহু শতাব্দী ধ'রে কতটা অক্ষুণ্ণভাবে চলে এসেছে সে বিষয়ে এখনই কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন নৃত্যরীতিতে সবগুলি উপাদান মেলেনি। কেননা, মেলানো সহজ নয়। বিশ্বের কেন্দ্রে যে ছন্দ বিরাজমান, যা' অলক্ষ্যভাবে নটরাজের লীলায় বিধৃত ও তরঙ্গিত, তাকে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনুভব করে আপন সৃষ্টিতে সেই ছন্দকেই রূপ দেওয়া জীবনব্যাপী সাধনারই শেষ সিদ্ধি হতে পারে। কেবল মাত্র ভূয়োদর্শন, পরিশ্রম ও প্রকরণ-জ্ঞান থেকে এই সৃষ্টির, এই রূপায়ণের সম্ভাবনা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সাধনায়, তাঁর শিল্পী-চেতনায়, কবি-চেতনায়, এক মহাছন্দকে ধীরে ধীরে গভীরভাবে অনুভব করেছেন বলেই বহু বিচিত্রকে সহজেই মেলাতে পেরেছেন। আসলে, 'বড়ো কঠিন সাধনা, যার বড়ো সহজ সুর'। যা' অতীতের স্বপ্নলোকে বিতর্কমূলক বা গূঢ়ার্থ সূত্র রূপেই বিরাজ করছিল, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে তাকেই তিনি নূতন রূপ আর নূতন জীবন দিলেন, তারই নাম রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য। যে

তৌর্যত্রিক ত্রিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেই তাকে আবার পূর্ণরূপে দেখা গেল।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের অবশ্য স্তরভেদ আছে। প্রকৃতির বিচারে চিত্রাঙ্গদা একান্তভাবে গীতিধর্মী, শ্যামা ও চণ্ডালিকা নাট্যপ্রধান। প্রথম নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা আঙ্গিকের বিচারে নৃত্যনাট্যের প্রাথমিক পর্যায়ের, এখানে তবুও সুর, কথা ও নৃত্য অবিচ্ছিন্ন 'এক' হয়ে উঠতে পারেনি। অলংকরণের আতিশয্য, স্থানে স্থানে আবৃত্তির সমাবেশে নৃত্যপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত না হলেও মন্দীভূত। পরবর্তী নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় কোনো দ্বিধা দুর্বলতার কিছুমাত্র পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার চরম বিকাশ যেমন 'বলাকা' কাব্যে তেমনি চণ্ডালিকাতেও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের চরম বিকাশ। আঙ্গিকের বিচারে, রসের বিচারে, সামগ্রিক রূপের বিচারে এবং ঋজুলক্ষ্য গতির তাৎপর্যে চণ্ডালিকাই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ক্রান্তিস্থল। এই নৃত্যনাট্যে যেমন অলংকরণের বা ভূষণের চিহ্ন মাত্র নেই, তেমনি আশেপাশের নানা খণ্ডকাব্যে বা কাহিনীতে নাট্যকে সমৃদ্ধি দেবার অথবা ঠেলে এগিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন হয় নি; সমস্ত আবেগ, ইচ্ছা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াত্মক ঘটনা, কবিতা, সঙ্গীত, অভিনয়, রূপকল্প এক উত্তরঙ্গ দ্রুতচ্ছন্দে একমুখী গতিতে এক সুদূর লক্ষ্যে ছুটে চলেছে। সাধারণতঃ নাটকের মধ্যস্থলেই নাটকের চরম মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। তিনখানি নৃত্যনাট্যের মধ্যে চণ্ডালিকা তেমনি একটি মধ্যমণি, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রতিভার তীব্রতম উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। সবশেষে শ্যামা। স্রষ্টা ও প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রতিভার সকল মাধুরী ও সুষমা যেন মিলেছে এই নৃত্যনাট্যে; সৌম্য থেকে সৌম্যতর যে শিল্পরূপ, সে যেন হয়ে

উঠেছে সৌম্যতম। কিন্তু শক্তি? এবং সাহস? এবং বেগ? তার চরমে পৌঁছেছিলেন স্রষ্টা চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে, একথা তো মানতে হবে! মধ্যগগণের দীপ্ত সূর্য নেমে আসেন এক সময় পশ্চিম গগণের কণকারুণের অপূর্ব বর্ণাঢ্যতায় ও মনোহারী লাবণ্যে, একটি ভাবের ও প্রেরণার ঢেউ উত্তাল হ'য়ে উঠে আবার নেমে যায় একটি অন্তিম প্রণামে। সৃষ্টির মধ্যে এই ছন্দ, আর রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সৃষ্টিতেও।

উল্লেখপঞ্জী

১. তুলনীয় 'নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে' (নটীর পূজা)

২. স্বভাবতঃই এই সব গানের (যেমন, বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে, সব ইত্যাদি) স্বরারোপের বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এক জাতীয় কাব্যগীতি (দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্র সংগীত) রয়েছে যেগুলি মূলতঃ কাব্যপ্রধান বলেই এসব গানের বৈশিষ্ট্যের দিকটি অনুধাবনযোগ্য। এই ধরনের গানের মূল কথা হচ্ছে—ভাবব্যক্তি অনুযায়ী চরণগুলি বিন্যস্ত। গানের আঙ্গিকের এই স্বচ্ছন্দ সমাবেশ বা স্বাধীন গ্রন্থনাই নৃত্যনাট্যের গানের আঙ্গিকে প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যায়।

৩. পরিশেষ-এর পর পুনশ্চর রচনাকাল ১৯৩২। এই সময়েই গদ্য ছন্দের পরীক্ষা করেন রবীন্দ্রনাথ। এই উপলক্ষ্যেই তিনি গদ্যকবিতা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে পুনশ্চ-র ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তাছাড়া এই সময়ে ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত প্রাসঙ্গিক চিঠির কথাও স্মরণীয়। দেখা যাচ্ছে এই সময়েই শিশুতীর্থ ও শাপমোচন (১৯৩১) রচিত হয়েছে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬ সালে রচিত। বস্তুতঃ গদ্যছন্দের প্রেরণাতেই নৃত্যনাট্যে গানগুলি রচিত ও প্রভাবিত।

৪. ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন

৫. রবীন্দ্রনাথের গদ্যগান—গীতবিতান বার্ষিকী (১৩৫০)

৬. গ্রন্থ পরিচয়, গীতবিতান (৩য় খণ্ড)

৭. "The stage, curtain, actors and various other aspects connected with drama, make the playwright concious of the innumerable technicalities to be followed at the time of production, and therefore, a theme very successfully handled by a novelist or verse writer find difficulties in the hands of a playwright. As Attakatha is almost alike to a play, the writer of Attakatha has to be very careful in composing one"—Attakatha.

Dr. S. K. Nayar (Marg. vol XI, Dec. 1957 No-1)

৮. তদেব

৯. তদেব

১০. তুলনীয়—শিকার নৃত্য (Hunter dance)

১১. সখী, কী দেখা দেখিলে ; হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ ; ব্রহ্মচর্য ! পুরুষের স্পর্ধা ; এ কি দেখি ; মীনকেতু কোন্ মহারাক্ষসীরে ; হে সুন্দরী ; তবে তাই হোক ; আজ মোরে সপ্তলোক ; সে আমি যে আমি নই ; এ কী তৃষ্ণা !

১২. এই তথ্য শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত।

১৩. The Poetic Image—C. Dey Lawis.

১৪. "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।" (১৩ই জুলাই, ১৯৩৫)—সুর ও সঙ্গতি, পৃঃ ৯৫

১৫. দ্রষ্টব্য 'মায়ার খেলার রূপান্তর' (রবীন্দ্র প্রতিভা)—কানাই সামন্ত

১৬. রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন।

১৭. এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা এর পরে 'নৃত্য সমাবেশ' অংশে করা হয়েছে।

১৮. শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় শুনেছি গানটি প্রথমে বিনাতালে গাওয়া হতো।

১৯. এর পরে 'সঙ্গীত-সমাবেশ' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২০. কোনো কোনো রাগরাগিনী নির্ণয়ে মতভেদের আশঙ্কা করছি। আগেই বলেছি, এসব গানে প্রায়শঃই রাগের প্রকৃতি বিলুপ্ত। কাজেই নৃত্যনাট্যের রাগনির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ তো বটেই, সেইসঙ্গে তর্কাতীতও নয়। এক্ষেত্রে, স্বরারোপে যে মূল রাগের আভাস ফুটে উঠেছে, তা থেকেই রাগ-রাগিনীগুলি বিশ্লিষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

২১. রবীন্দ্রসঙ্গীতের শেষ পর্ব সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একথা প্রযোজ্য। ১৯২৫ সালে ৫টি হিন্দী ভাঙা গান ও ১৯৩১ সালে ৪টি মাদ্রাজী স্বর-ভাঙা গান ছাড়া আর বিশেষ অনুকৃতির চিহ্ন চোখে পড়ে না। দ্রষ্টব্য: ভূমিকা—রবীন্দ্রসংগীতের ধারা। শুভ গুহঠাকুরতা

২২. "বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখেছি—এখানকার সঙ্গীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।"—পারস্যে (রচনাবলী ২২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ)

২৩. সুর ও সঙ্গতি

২৪. সঙ্গীতের মুক্তি

২৫. প্রসঙ্গতঃ, বীটোভেনের সিম্ফনীর কথা মনে হতে পারে।

২৬. তিনখানি নৃত্যনাট্যের কাহিনীর মধ্যেই এর বীজ রয়েছে। চিত্রাঙ্গদার কাহিনী যতটা গীতিধর্মী, শ্যামা বা চণ্ডালিকার কাহিনী বা বিষয়বস্তু ঠিক ততটাই নাটকীয়।

২৭. তুলনীয়: "Every dance form creates its own aura exhales its particular atmosphere. Bharata Natyam has solemnity and spiritual grandeur. Kathakali delves into the metaphysical and creates from it an ecric world of enchantment. Kathak stimulates the senses as with cloying smell of exotic blooms. But Manipuri is the dance form that reaches the heart of Nature and epitomizes its beauty and its richness."—Indian Dancing Ramgopal and Serozh Dadachanji.

২৮. (ক) "ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড-নাচে মিলে ক্রমে ক্রমে যে এমনি ক'রে একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা পরিণত হতে পারে তারই নূতন পদ্ধতি চোখে পড়তে লাগল।"

(খ) "নীচের ক্লাসগুলি দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলুম মণিপুরী ও দক্ষিনী নাচের অনেক ভঙ্গী ও তাল একটার সঙ্গে একটা জুড়ে দিলে একটি ভূমিকা অনায়াসেই তৈরি করা যায়।"—নৃত্য

২৯. গত ৬ই মার্চ, মঙ্গলবার (১৯৬২) শান্তিনিকেতনে কোনার্কে বসে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে নৃত্যনাট্য সম্পর্কে যে আলোচনা হয়, তাতেই এই তথ্য জানতে পারি। নৃত্যনাট্যের রচনাপদ্ধতির কথা জানতে চাইলে উনি 'নৃত্য'-র কথা উল্লেখ করার পর এ কথা বলেন। এই তথ্যটি আমি লেখার মধ্যে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করলে উনি সংকোচের সঙ্গে স্বীকৃত হন। এ জন্যে ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রসঙ্গক্রমে, রূপসজ্জায় ওঁর কতখানি দায়িত্ব ছিল, তাও বলেন।

৩০. এই তথ্য শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত।

৩১. তদেব

৩২. তদেব

৩৩. এ সম্বন্ধে 'নৃত্যনাট্যের রূপান্তর' অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৪. শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ বলেন যে, বর্তমানে যাকে ক্লাসিক নৃত্য বলা হচ্ছে, আসলে তাও লোকনৃত্য—এগুলি classical নাচের মর্যাদা পেয়েছে গত ৩০ বছরের মধ্যে। দ্রষ্টব্য—ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি

৩৫. আমাকে লেখা ৩১. ১. ৬২ তারিখের পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানীর সৌজন্যেই এই পত্রাংশ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

৩৬. শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানী রবীন্দ্রনাথের সময় তিনখানি নৃত্যনাট্যেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বোক্ত চিঠিতে তিনি বলেছেন যে, চণ্ডালিকাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। এই নৃত্যনাট্যে তিনি প্রকৃতির ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যে গভীর তৃপ্তি পান, অন্য দুখানি নৃত্যনাট্যের নাম ভূমিকায় অভিনয় ক'রে তা পান নি।

৩৭. Marg. Vol XI: The Orchestra—V. Madhavan Nair.

৩৮. Marg. Vol XI.: The play.

৩৯. তদেব

৪০. চণ্ডালিকার প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

৪১. এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

৪২. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৪৩. তিনখানি নৃত্যনাট্যেই সহচরী বা সখীর দলের ভূমিকা রয়েছে। বোধহয় মেয়েদের যূথনৃত্যকে স্থান দেবার জন্যেই এই ধরনের ভূমিকার অবতারণা করা হয়েছে।

৪৪. দ্রষ্টব্য—গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (২৫শ খণ্ড) এবং পরিশিষ্ট অংশ।

৪৫. পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

৪৬. এই দৃশ্যটির পরিকল্পনা শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র প্রতিভা, গ্রন্থ পরিচয়, কানাই সামন্ত।

৪৭. উত্তীয়-বধ প্রসঙ্গে—প্রণয়কুমার কুণ্ডু। রম্যবীণা, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

৪৮. রবীন্দ্রসঙ্গীত—শান্তিদেব ঘোষ—'শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা'

৪৯. রবীন্দ্রজীবনী—৪র্থ খণ্ড—'শ্রীতে' অভিনয় (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)

৫০. "চণ্ডালিকা নাটিকাটি ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাদ্রের শেষে কলিকাতায় ম্যাডান থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ উহা আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহার আখ্যান অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57 Park Street, 1882) গ্রন্থের ২২৩—'২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত।"—রবীন্দ্ররচনাবলী (বিঃ ভাঃ সং) ২৩শ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়।

তাছাড়া, প্রথম সংস্করণ চণ্ডালিকার সঙ্গে মূল নৃত্যনাট্যের যে পার্থক্য, সেই রূপান্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থ পরিচয় (রবীন্দ্ররচনাবলী ২৫শ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৫১. গ্রন্থপরিচয়—গীতবিতান, ৩য় খণ্ড। প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

৫২. 'মায়ার খেলার রূপান্তর' (রবীন্দ্র প্রতিভা—কানাই সামন্ত) প্রবন্ধে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

৫৩. চিত্রাঙ্গদার অনুরূপ সমবেত নৃত্যটি (তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি) তুলনীয়।

৫৪. রূপকার নন্দলাল—শান্তিদেব ঘোষ

৫৫. "একটি রঙের সঙ্গে আর একটি রঙের সম্পর্ক স্বভাবতঃই সম্বাদী বাদী বা বিবাদী হতে পারে। দুইটি রঙ পরস্পর অনুকূল বা পরিপূরক হলে সম্বাদী বলা চলে; একটির প্রতিবেশিতায়, সংঘাতে আর-একটি উজ্জ্বল বা পরিস্ফুট হয়ে উঠলে বাদী বলা যেতে পারে; আর যেখানে দুটি রঙের মধ্যে সংঘাত সাংঘাতিক বললেই হয়, সেখানেই বিবাদী রঙের সমাবেশ হয়েছে বলতে হবে।—শিল্প চর্চা [পৃঃ ১৬০। নন্দলাল বসু]

৫৬. চণ্ডালিকার আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য

৫৭. দ্রষ্টব্য—ভরতের নাট্যশাস্ত্র—

স্মরণীয়: "He and his interpreters have given a fair idea of the layout of some play houses. Some were squares, some were of long and some were triangular. They all had a main stage in front and a wider stage—behind, where the orchestra sat. Wings or rooms at the sides of the front stage may have connected the actors before they centred... At a later time than Bharata's life, there seems to have been a curtain between the two stages".—The Oriental Theatre —The Living stage.

কৌতূহলী পাঠক হয়ত জানেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে দ্বিতল-বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চেরও প্রচলন ছিল। একতলায় পার্থিব ঘটনার অভিনয়, এবং দ্বিতলে স্বর্গ ইত্যাদি বৃত্তান্তের অভিনয় হতো। শকুন্তলার প্রথম ছুটি সর্গ একতলায়, সপ্তম সর্গটি দ্বিতলে (শকুন্তলার নাট্যকলা—দেবেন্দ্রনাথ বসু। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য)

৫৮. 'নাট্যধারা'—প্রতিমা দেবী (গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৭০ সাল)

৫৯. শব্দ কল্পদ্রুম্-এ তৌর্যত্রিক শব্দটির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নীচে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেল :

"নৃত্য গীত বাদ্য—এই তিনের সমন্বয়েই নাটক, অমর একথা বলেছেন। নট সম্বন্ধীয় যা' নৃত্যগীতবাদ্যসমন্বিত, তাই নাটক, একথা সুন্দরীটীকায় বলা হয়েছে।

বিষ্ণুগৃহে নৃত্যগীতবাদ্যের ফল প্রদর্শিত হয়েছে। যথা, যারা সৎকর্মপরায়ণ হয়ে গান ক'রে থাকেন, তাঁদের কী ফল লাভ হয়, তা' বলছি, শ্রবণ কর। যশস্বী ব্যক্তি যত সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা গান করেন, তত সহস্র বৎসর ইন্দ্রলোকে বাস করেন। রূপবান গুণবান সর্ববেদবিদ্ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষ নিত্য বজ্রপাণি দেবকে নিঃসন্দেহে দেখতে পারেন। আমার ভক্ত ইন্দ্রলোক পথে অবস্থান করেন। সর্বকর্মগুণশ্রেষ্ঠ সে আমারই পূজারী হয়ে থাকেন। মদ্গীতপরায়ণ ব্যক্তি ইন্দ্রলোক হতে পরিভ্রষ্ট হলেও সংসারযুক্ত হয়ে মদ্লোকে (বৈকুণ্ঠলোকে) গমন করেন। যে আমাকে জাগরিত করবার জন্য সর্বদা গান করে, সে সর্ব-আসক্তিহীন বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে। হে দেবি, তোমাকে গানের মহৎ ফলের কথা বললাম। যার গীতের শব্দের দ্বারা সংসার-সাগর অতিক্রম করা যায়, সেই বাদিত্র (বাদনকারীর) ফলের কথা বলছি, শ্রবণ কর। বাদিত্র ব্যক্তি দেবের সমতা লাভ করেন। তিনি কুবের ভবনে গমন ক'রে ইচ্ছামতো আনন্দ উপভোগ করেন। কুবের ভবন থেকে ভ্রষ্ট হলে স্বচ্ছন্দে নিজ ভবনে গমন করেন। বাজনার তালের সঙ্গে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। হে দেবি! এইবার নৃত্যমানের

ফললাভের কথা শ্রবণ কর। নৃত্যের দ্বারা মনুষ্যগণ সংসার-সাগরকে অতিক্রম করে অর্থাৎ সংসার বন্ধন ছিন্ন করেন। তারা ত্রিশশত বর্ষ বা ত্রিশ হাজার বৎসর ধ'রে পুষ্কর দ্বীপে অবস্থান ক'রে স্বচ্ছন্দে নিজের গৃহে গমন করেন। আমার কাজে নিযুক্ত পুরুষ রূপবান, গুণবান, বীর ও চরিত্রবান হয়ে সুফল লাভ ক'রে থাকেন। নৃত্যরত আমার ভক্ত সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যে ব্যক্তি নিত্য জাগরিত হয়ে গীতবাদ্য সহযোগে নৃত্য করেন তিনি জম্বুদ্বীপে রাজরাজ অর্থাৎ রাজাশ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন। সৎকর্মপরায়ণ আমার ভক্ত সর্বকর্মসমাযুক্ত রাজা রক্ষিত হয়ে থাকেন। সৎকর্মপরায়ণই আমার ভক্ত হয়ে থাকেন। বরাহ পুরাণে একথা উক্ত আছে।''

কৌতূহলী পাঠকের জন্য 'তৌর্যত্রিক' সম্বন্ধে আর একটি শ্লোক উল্লেখ করা গেল :

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্যত্রিকং চ বৃথাট্যা কামজো দশকোগণঃ॥

(মনু সংহিতা, সপ্তম অধ্যায়।)

—মৃগয়া, পাশাখেলা, দিবানিদ্রা, নিন্দা, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান, নৃত্যগীত, বাজনা ও বৃথা ভ্রমণ—এই দশটি কামজ ব্যসনের অন্তর্গত। মনু তৌর্যত্রিকম্ কথাটির দ্বারা নৃত্যগীত ও বাদ্যকে পৃথক পৃথকভাবে বুঝিয়েছেন। বাদ্যসহ নৃত্য বা বাদ্যসহ গীতকে তিনি বোঝাতে চান নি। তূর্য কথাটি থেকেই তৌর্য শব্দের উৎপত্তি। তূর্য শব্দের সঙ্গে অণ্ প্রত্যয় যোগ করে তৌর্য্য হয়েছে। তৌর্য্যের অর্থ আমোদ-প্রমোদ। (ত্রি+কণ্, পরিমাণার্থে)—ত্রি শব্দের সঙ্গে কণ্ প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে ত্রিকং হয়েছে। তৌর্য্যাণাং ত্রিকম্ ইতি তৌর্য্যত্রিকম্। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করার জন্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে পৃথক পৃথকভাবে বোঝানো হয়েছে। (কুল্লুকভট্ট)

লক্ষণীয়, এখানে মনু তৌর্যত্রিকের নিন্দা করেছেন।

৬০. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (১ম ভাগ)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

"গঙ্গাবতরণ অভিনয়াঙ্গ নৃত্য, সুতরাং হরিবংশে অভিনয়ের বিষয়বস্তু

হিসেবে গঙ্গাবতরণকে 'নৃত্যনাট্য' বলা যেতে পারে। গঙ্গাবতরণ করণটির পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন,

উর্ধ্বাঙ্গুলিতলৌ পাদৌ ত্রিপতাকাবধোমুখৌ
হস্তৌ শিরঃ সন্নতং চ গঙ্গাবতরণং চ তৎ ॥"

[—নাট্যশাস্ত্র, কোশী সং ৪।১৬৮ পৃষ্ঠা—১৪৩।]

৬১. ছন্দ

৬২. পূর্বে আলোচিত

৬৩. "In Kathakali and kuttu proper acting occupies the most important place, in Korettiyattam and Mohininayattam dancing takes the place of importance, while in Kayyukuttikali we have practically only vocal music and a very simple kind of dance".

—South Indian Theatre,

K. R. Pisharoti—(The theatre of the Hindoos, Ch. IX.)

পরিশিষ্ট

'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে একটি মন্তব্য :

[ক] বাল্মীকি প্রতিভা সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। গীতবিতানের গ্রন্থ-পরিচয় অংশেও এ সম্বন্ধে নানা আলোকপাত করা হয়েছে এবং জীবন-স্মৃতির সর্বশেষ সংস্করণেও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য চোখে পড়ে। তথাপি ১২৮৭ সালের ১৬ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষ্যে বাল্মীকি প্রতিভার যে অভিনয় হয়, সে সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক বিবরণ স্মরণ করা গেল। এই বিবরণের রচয়িতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবরণটি এইরূপ ঃ

"বিদ্বজ্জন সমাগম : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১]

সুখই স্বর্গ, আর যেখানে সুখ, সেই স্বর্গ। যেখানে বিদ্বৎমণ্ডলী যেখানে এক প্রাণ বহুজনের সমাগম, সেখানে যাহার সুখ না হয়, সে পামর, সে হতভাগ্য—তাহার অদৃষ্টে কুত্রাপি সুখ নাই; তাহার স্বর্গলাভ কখনোই ঘটিবে না, তা বাঁচিয়া থাকিতেই কি আর মরিয়া গেলেই বা কি?

যিনি কমলার কৃপা সত্ত্বেও ভারতীর[২] চিহ্নিত সেবক, যিনি দুর্লভ মানবজন্মে দ্বিজেন্দ্র বলিয়া বরেণ্য, তাঁহার আতিথ্যে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। ইহা বিচিত্র নহে। তাহার উপর, যেখানে বাল্মীকির কাব্যপ্রভা,[৩] মূর্তিমতী প্রতিভা,[৪] যেখানে সঙ্গীতের নিসর্গ শোভা, সে যদি স্বর্গ না হয় তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দী স্বর্গবাসী হইলেও এখন নরলোকে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং মানব-স্বর্গেও তিনি ইন্দ্রত্ব করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন সমাগমে তিনি মর্তের পরম সুখ লাভ করিয়াছেন। ধরাধামে কি কি উপাদানে স্বর্গ সংগঠিত হয় তার পরিচয় পঞ্চানন্দ পাইয়াছেন;

অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা স্বরূপ এই লৌহ-লেখনী দ্বারা তদ্‌বৃত্তান্ত বিচারিত হওয়া আবশ্যক।

যেখানে সমাগম, সেখানেই সভা; যেখানে সভা সেইখানে সভাপতি। কালের জ্যেষ্ঠপুত্র[৫] বঙ্গের গণপতি এই জনসমাজে সমাগত হইয়াছিলেন; ইহা বলাই বাহুল্য। মণিমুক্তা বিভূষণে স্বয়ং সঙ্গীত স্বীয় রাজশ্রী[৬] প্রদর্শনে সমাগত বিদ্বজ্জনের মনোমোহন করিয়াছিলেন, ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্বানের বল বিজ্ঞান; সুতরাং রসায়ণ[৭] রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেবভাষা, নাগরবেশে আশু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া লম্বশাঠ পটাবরণে সভায় শোভা বর্ধন করিয়াছিলেন। শীতলভাবে[৮] মেধা স্বীয় পুরুষকার দেখাইতেছিলেন। পাছে এত শোভা সমষ্টি সন্দর্শন করিয়া মানব-নয়ন ঝলসিয়া যায়, সেইজন্য নেত্ররোগ ধন্বন্তরি[৯] নিজ বিপুল কলেবর সঞ্চালনে ক্রটি করেন নাই।

এতদ্‌ভিন্ন বিভাকরাদি[১০] নানা গ্রন্থ জ্ঞাতীয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ পউগ্রহ, কুলাচার্য ডার্বিনের পরমপূজ্য স্বকৃতভঙ্গ কুলতিলক সম্প্রদায় তথায় উপদ্রব করিতে রক্ষা করেন। আর যেখানে এত উপসর্গ, সেখানে সাধারণীয় অক্ষয়চ্ছায়া[১১] মূল স্বর্গের অপ্সর স্থানীয় সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন, ইহাতে কাহার আনন্দ না হইবার কথা। এমত অবস্থায় সুকণ্ঠ সঙ্গীত এবং আকণ্ঠ সন্দেশে পঞ্চানন্দ যে নিরানন্দের বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আইস ভাই, প্রবন্ধের শেষে জয়ধ্বনি করিয়া ছাপাখানায় কাপি পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।”

—এই উদ্‌ধৃতাংশের পাদটীকাগুলি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত।

(১) ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’ এই নামে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে একটি সাহিত্যিক সম্মিলন খুব সমারোহের সহিত

হইয়াছিল। (২) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩) ঐ দিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রী সকলেই ঠাকুর পরিবারের লোক। (৪) প্রতিভাসুন্দরী দেবী (৫) তাৎকালিক বৃদ্ধ Reverend K. M. Mukherjee (৬) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (৭) তাৎকালিক রসায়নাচার্য রায় কানাইলাল দে বাহাদুর (৮) লাহোর 'Tribune' পত্রের শীতলবাবু, (৯) সেকালের চক্ষু চিকিৎসক লালমাধব মুখোপাধ্যায়, ইনি বিপুল কলেবরই ছিলেন (১০) 'নব বিভাকর' পত্রের সম্পাদক, প্রভৃতি (১১) 'সাধারণী'র অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

গীতিনাট্যের 'বিলাতী' গান

'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' গ্রন্থে ইন্দিরা দেবী কয়েকটি 'বিলাতী সঙ্গীতের' কথা উল্লেখ করেছেন। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া গীতিনাট্যে কবি য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসরণে কয়েকটি গান রচনা করেন। সুরের আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে, এখানে মূল গানের কথা অংশ (সম্পূর্ণ বা আংশিক) উদ্ধৃত করা গেল। এ' থেকে বোঝা যাবে, কেবল মাত্র গানের সুরই কবি গ্রহণ করেছেন, কথা-অংশ নয়। অবশ্য, কিছু সাদৃশ্য যে আদৌ নেই তা নয়; 'Nancy Lee' গানের অনুসরণে 'কালী কালী বলো রে' গানটির প্রসঙ্গ (বলো হো হো হো) স্বভাবতঃই মনে হতে পারে। গানগুলি যথাক্রমে :

১. মরি, ও কাহার বাছা —Go where glory waits thee
২. মানা না মানিলি — "
৩. কালী কালী বলো রে — Nancy Lee

৪. ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে — Ye banks and braes

৫. সকলি ফুরালো — Robin Adair

১. Go where glory waits thee,
But while fame elates thee,
Oh ! still remember me.
When the praise thou meetest
To thine ear is sweetest,
Oh ! then remember me.

Other arms may press thee,
Dearer friends caress thee,
All the joys that bless thee,
Sweeter far may be ;
But when friends are nearest,
And when joys are dearest,
Oh ! then remember me.

When, at eve, thou rovest
By the star thou lovest,
Oh ! then remember me.
Think, when home returning,
Bright we've seen it burning,
Oh ! thus remember me.

Oft as summer closes,
When thine eye reposes,

On its ling'ring roses,
Once so lov'd by thee,
Think of her who wove them
Her who made thee love them,
Oh ! then remember me.

When, around thee dying,
Autumn leaves are lying,
Oh ! then remember me.
And, at night, when gazing
On the gay hearth blazing,
Oh ! still remember me.

Then should music, stealing
All the soul of feeling
To thy heart appealing
Draw one tear from thee ;
Then let memory bring thee
Strains I us'd·to sing thee,—
Oh ! then remember me.

[Moor's Irish Melodies থেকে গৃহীত।]

৩. Of all the wives as e'er you know,
Yes ho ! Lads ho ! Yeo' ho ! Yeo ho !
There's none like Nancy Lee, I trow,
Yeo ho ! Lads ho ! Yeo ho !
See there she stands an' waves her hands
Upon the quay,
And ev'ry day when I'm away

She'll watch for me,
An' whisper low, when tempests blow
For jack at sea,
Yeo ho ! Lads ho ! Yeo ho !

The sailor's wife the sailor's star shall be
Yeo ho ! we go across the sea.
The sailor's wife, the sailor's star shall be
The sailor's wife his star shall be.

[Nancy Lee—Stephen Adams। মূল গানের প্রথম স্তবকটি এখানে উল্লিখিত]

৪, Ye banks and braes o' bonnie Doon,
How can ye bloom sae fresh and fair,
How can ye chant, ye little birds,
And I sae weary fu' o' care ?
Thou'll break my heart, thou warbling bird,
That wantons thro' the flowering thorn ;
Thou minds me o' departed joys,
Departed never to return,

Aft hae I rov'd by bonie Doon,
To see the rose and woodbine twine ;
And ilka bird sang o' its tune ;
And foundling sae did I o' mine.
Wi' lightsome heart I pu'd a rose,
Fu' sweet upon its thorny tree !
And my fouse lover stole my rose,
But ah ! …he left the thorn wi' me.

[Burns (175?-1796) : old scottish Melody.

—The oxford song Book, Melody Edition, Vol 1. collected and arranged by Percy C. Buck থেকে গৃহীত।]

৫. What's this dull town to me ?
Robin's not near
What made th' as sembly shine ?
Robin Adair.
But now thou'rt cold to me,
Robin Adair.

What was't I wish'd to see ?
What wish'd to hear ?
What made the ball so fine ?
Robin was there.
But no thou'rt cold to me.
Robin Adair.

Where's all the joy and mirth
What, when the play was o'er.
Yet him I lov'd so well
Made this town a heav'n on earth ?
What made my heart so sore ?
Still in my heart shall dwell ;
Oh ! they're all fled with thee,
Robin Adair.
Oh ! it was parting with Robin Adair.
Oh ! I can ne'er forget Robin Adair.

[তদেব, Traditional]

য়ুরোপীয় গানের কয়েকটি প্রত্যয়

গীতিনাট্যের গায়কীর আলোচনা প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসর ব্যবহৃত Staccato, Largo ইত্যাদি প্রত্যয়গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে সেই প্রত্যয়গুলির অর্থ নির্দেশিত হল। এগুলি আসলে গানের বিভিন্ন লয়ের নির্দেশক, হার্বার্ট স্পেনসর তাঁর আলোচনায় এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন :

Staccato—Detached...the note is to be as short as possible.

Largo—Slow and broad.

Adagio—At ease, i. e. Slow. Hence used to describe the slow movement of symphony, a sonata or concerto.

Andante—going, moving...moderate tempo,...actually slow.

Allegro—Lively, used to indicate brisk movement.

Presto—The fastest speed in normal use.

[Collins Music Encyclopedia]

এ ছাড়া মূল আলোচনায় একথাও বলা হয়েছে যে, য়ুরোপীয় অপেরার গায়ন পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উপযোগী বিশেষ ধরনের কণ্ঠস্বরের রীতি প্রচলিত। যেমন,

ওয়াগ্‌নারের DIE WALKüRE´ (The valkyrie)

চরিত্র—Siegmund : Tenor

Sieglinde : Soprano

Hunding,

Sieglinde's husband : Bass

Wotan : bass-baritone

Brünnhilde, his daughter : Soprano

Frieka : Mezzo-Soprano

8 Valkyries, sisters of Brünnhilde.

PARSIFAL

চরিত্র—Four Esquires : Two Sopranos and Two Tenors

Two Solo knights of the grail : Tenor and Bass

Kundry : Soprano

Amfortas : Baritone

Persifal : Tenor

Titurel : Bass

Klingsor : Baritone

Knight of the grail, flower maidens, Chorus of boys.

মোজার্টের DON GIOVANNI

চরিত্র—Leporetto servant of Don Giovanni (Bass), Donna Anna (Soprano), Don Giovanni (Baritone), The commandant (Bass), Don ottavio, fiance of Donna Anna (Tenor), Donna Elvira, a notable Lady of Burgos (Soprano), Zerlina, a peasant girl (Soprano), Masetto, her suitor (Bass).

বিটোভেনের—FIDELIO

চরিত্র—Jaquino, a young turnkey (Tenor), Marzellina, his betrothed (Soprano), Rocco, a jailer (Bass), Leonore-[Fidelio] (Soprano), Don Pizzarro, governor of the prison (Baritone), Florestan, husband of Leonore (Tenor), Don Fernando, Minister of Justice (Bass).

য়ুরোপীয় অপেরায় (বা গায়কীর) ব্যবহৃত এই প্রত্যয়গুলির অর্থ নির্দেশিত হল :

Bass : Lowest part of the composition.

Baritone : A high Bass voice

Contralto : Lowest Female voice...

Soprano : The female voice of the highest register.

Mezzo-Soprano : The voice between a Soprano and a contralto in range.

Tenor : Hence applied to the adult male voice intermediate between the Bass and the alto.

[Collins Music Encyclopedia.]

শান্তিনিকেতনের নৃত্যানুশীলনের প্রতিক্রিয়া

সাম্প্রতিক কালে জনসাধারণের মধ্যে নৃত্য সম্বন্ধে উৎসাহ ও অনুরাগ রীতিমতো বেড়ে চলেছে, এমন কি কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচী থেকে নৃত্যকে বাদ দেবার উপায় নেই। তা'ছাড়া, নাট্যাভিনয়ও ব্যাপক প্রসার লাভ করছে। কিন্তু এই ঘটনা বেশী দিনের নয়। এই শতকের দ্বিতীয় দশকের সমাজেও এ বিষয়ে অনুকূল আবহাওয়া ছিল না। তৎকালীন 'বাঙলা' পত্রিকায় বলা হয়—

"......পথ দেখালেন রবিবাবু, তাঁর 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় ক'রে...

সাধারণ দর্শকের সমক্ষে পাদপ্রদীপের সম্মোহনী আলোকের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবার জন্য সকল দেশে একটা বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে—তাদের নাম নটনটী। নট-নটীর হিন্দু সমাজে

বা খৃষ্টীয় সমাজে একটা স্থান থাকলেও এবং সে স্থানটা আদরের হলেও গৃহস্থ বা ভদ্র নরনারীর স্থান নয়। নটনটী এক দিকে ও ভদ্র নরনারী আর এক দিকে, মধ্যস্থানে footlights-এর সার, এ ব্যবস্থায় যে যুক্তি আছে, না মেনে থাকবার যো নেই। উভয় শ্রেণীকে যদৃচ্ছাক্রমে স্থান পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়, সমীচীনও নয়।

কেন নয়, তাই বলবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করেছি। ফুটলাইটের magic এবং green room ও rehearsal room-এর আবহাওয়া কোনটাই সুস্থ-প্রকৃতি ভদ্র মহিলা ও ভদ্র যুবকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। আপাততঃ মনে হবে আমার এ কথাটা অনাবশ্যক আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু যৌন প্রকৃতির তারল্য পরিকল্পনাকল্পে, তদ্বিষয়ে অতি সাবধানতা দোষের ব'লে মনে করি না।......"

শেষে অভিনয়ের ত্রুটি দেখিয়ে বলা হয় —

"আমাদের দেশের তাই বর্তমান 'হেয়ুৎটা' বড় আমার ভাল লাগচে না। অনেক ভদ্র মহিলা যে footlights-এর আকর্ষণ একটু বেশী মাত্রায় অনুভব কচ্চেন সেইটাই আরও ভালো লাগছে না। আমার মত অনেক পুরুষও যে আতঙ্কিত হয়েছেন তার প্রমাণ আছে।"

ঠাকুর পরিবার নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহী, সেকথা হয়ত অনেকেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই মানুষ। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে নারী-চরিত্রের ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণের তখনো রেওয়াজ ছিল না। ঠাকুর পরিবারেও প্রথম দিকে যেসব অভিনয় হতো, তাতে পুরুষই নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন।

ক্রমে ক্রমে অবশ্য এই প্রথা বদলে যায় এবং মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকায় নেমে সেই কৃত্রিম রীতির বিলুপ্তি ঘটান। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় যখন হয়, তখন দেখি ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা তাতে অংশ গ্রহণ করেছেন। বলা যেতে পারে, ঠাকুর পরিবারের উদ্যমে এবং উদ্যোগেই এইভাবে রঙ্গমঞ্চে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা অবতীর্ণ হতে থাকেন। তারই প্রতিক্রিয়া 'বাঙলা' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত অংশে দেখানো হল।

এ' তো গেল অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্য। তখনও নৃত্যের বা নৃত্যানুশীলনের প্রশ্ন ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের উদ্যমে শান্তিনিকেতনে যখন প্রাথমিকভাবে নৃত্যের অনুশীলন চলতে থাকে, তখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, তার কিছু নিদর্শন মূল আলোচনার ('সেতুবন্ধ') মধ্যে উল্লিখিত। এখানে তার অতিরিক্ত আরো কিছু মন্তব্য স্মরণ করা গেল :

বেদনাবোধ বা আমোদ-প্রমোদ :

বন্দীদের সাহায্যার্থে ধন ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রথমেই আমোদ-প্রমোদের প্রলোভন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে ; ইহা কি বাংলাদেশের পক্ষে গৌরবের বিষয় ? না লজ্জার কথা, কলংকের চিহ্ন—নিষ্ঠুর হৃদয়ের নিদর্শন।

...তাই আজ লোকদিগকে আমোদ-প্রমোদের প্রলোভন দিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বাংলার যুবকগণ,—বাংলার জনসাধারণ, তোমাদের হৃদয় যদি বন্দীর জন্য বেদনায় আকুল হইয়া থাকে, তবে কি তোমাদের পক্ষে আমোদে রত হওয়া শোভা পায় ? অর্ডিন্যান্সের শেলঘাত যখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছ,

তখন কি যুবতীর নৃত্যকলায় তোমার চিত্তবিনোদন হইবে?... সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলাগণ আজ নর্তকী ও অভিনেত্রীর ঘৃণিত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থসংগ্রহে আসিয়াছেন, আর বাঙ্গালী তোমরা বন্দীর দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুর্নীতির পাপের প্রশ্রয় দিতে আসিয়াছ—হায়, ইহার পরেও কি আর অধঃপতন আছে?

...যাঁহারা তোমাদের মাতৃস্থানীয়া, যাঁহারা তোমাদের ভগ্নী স্বরূপ তাঁহারা নৃত্যাভিনয় করিতে আসিয়াছেন, তোমরা লজ্জায় মস্তক অবনত কর, ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত কর,—ক্ষোভে দুঃখে বক্ষে করাঘাত কর। তোমাদের যদি অর্থ থাকে, তবে তাহা বন্দীর ধনভাণ্ডারে দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। আর পাপের প্রশ্রয় দিও না।

...আজ এই সুবৃহৎ প্রাসাদে যখন নৃত্যকারিণীর নৈপুণ্য দর্শন করিয়া দর্শকগণ আনন্দে করতালি দিবেন, তখন মনে রাখিও তোমার বন্দী ভ্রাতার দীর্ঘশ্বাসে সুদূর কারাগারের পাষাণ প্রাচীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে।"

[সঞ্জীবনী। বৃহস্পতিবার ১২ই মাঘ, ১৩৩৪]

এর কিছুদিন পরেই, প্রকাশ্যভাবেই এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা হয়:

সরিষায় ভূত—মূলকথা নীরব অভিনয়

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে...সেই সময় বিলাসী সমাজের এই অন্যায় কার্যের তীব্র প্রতিবাদ সঞ্জীবনী-তে প্রকাশিত হয় এবং এইরূপভাবে ভদ্র পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নাচ দেখাইয়া পয়সা উপায়ের ফিকিরের

বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হইয়া উঠে।...তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'আমরা ত' বাক্য আবৃত্তি বা নৃত্যগীতের অভিনয় করিতেছি না, কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতেছি মাত্র, ইহাতে আর দোষ কী?...উক্ত অভিনয় করিতে যাইয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন লোক অবগত আছেন।

দ্বিতীয় সোপান সঙ্গীত

ইহার পরে অধঃপতনের দ্বিতীয় সোপানের আরম্ভ হইল।... জনসাধারণ ও যুবকগণ ভদ্রমহিলাদের এই অভিনয় দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া আসে তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।...

তৃতীয় সোপান

ক্রমে এই বিলাসী সমাজের সাহস বাড়িয়া গেল।...নীরব অভিনয় ক্রমে সরব হইয়া উঠিল। বাঙ্গলার ভদ্র সমাজে এই সকল অর্থশালী ব্যক্তিগণ বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতীগণকে সর্বসাধারণের সম্মুখে নাচাইয়া অধিকতর অর্থ সংগ্রহের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গৃহে এক নাট্যাভিনয়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কন্যাকে নাচাইয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিন চারদিন নৃত্য দেখাইয়া তিনি অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। নারীর নৃত্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পথ তিনিই প্রথম দেখাইয়া দিলেন এবং বিলাসী সমাজ বুঝিল যে, নারীকে নাচাইলে ও তাহার দ্বারা নাটক অভিনয়

করাইলে অনেক অর্থ উপার্জন হয়।...নারীর শালীনতা ও পবিত্রতা সঞ্জীবনী কতটা উচ্চে স্থান দিয়াছে এবং তাহারই জন্য প্রতিবাদ করিয়া সঞ্জীবনী বলিয়াছিল, এইরূপে অর্থ উপার্জন করা অপেক্ষা বিশ্বভারতী ও সঙ্গীত বিদ্যালয় রসাতলে যাউক। ইহারই কয়েক মাস পরে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কয়েকবার যুবক যুবতীর সাহায্যে অভিনয় করিয়া এক বিধবাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সঞ্জীবনীতে তাহারও প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

সেদিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে রাজবন্দীর অর্থকষ্ট দূর করিবার অজুহাতে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় প্রভৃতি এক নাচের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, "রাজবন্দীদের অর্থকষ্টের কথা দূর হউক,—তামাসা দেখিয়া যাও!" সেদিনের সাগর নৃত্যে নৃত্যকারিণীর পরিধেয় বস্ত্রের কথা শুনিয়া লজ্জায় দুঃখে ম্রিয়মান হইয়াছি। যিনি এই সখীর নৃত্য দেখাইয়াছিলেন, তিনি পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী রেবা রায়। আজ রেবা রায় তাঁহার স্মৃতিতে কালিমা লেপন করিল।

বালির বাঁধ

একবার যখন ভদ্রঘরের নারীর নৃত্য সুরু হইয়াছে, তখন যে ইহা ঘন ঘন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সম্ভ্রমের বাঁধ ভাঙিয়াছে। ব্রাহ্ম কর্তৃক পরিচালিত সঙ্গীত সম্মিলনী সেজন্য তাঁহাদের শিক্ষার্থিনীদিগকে নাচাইয়া অর্থ-সংগ্রহের সুবিধা ছাড়িবেন কেন? ......জনসাধারণ ব্যবসাদার নর্তকীর নৃত্য দেখিয়া ক্লান্ত হইয়াছে। তাহারা ভদ্রঘরের যুবতীর নৃত্যের দ্বারা উত্তেজনা চাহে।...সঙ্গীত

সম্মিলনীর পরিচালকদের মধ্যে কে, সি, দে-র পত্নী ও ডাঃ বি, এল চৌধুরীর পত্নী আছেন।...তাঁহারা ৪ঠা মার্চ পুনরায় রঙ্গালয়ে 'দিবসের অভিব্যক্তি' নামে এক নাটিকার অভিনয় করিবেন ও নারীকে নাচাইবেন। শুনা যায় তাহাতে নববিধান সমাজের বিখ্যাত ৺প্রকাশ চন্দ্র রায়ের পুত্র ডাঃ বিধান রায়ের আত্মীয় থাকিবেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৺চণ্ডীচরণ সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেনের কন্যা যোগ দিবেন। ঐ দিন পুনরায় নৃত্য দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সবুজ বাসনা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিলাস-বাসনা এখনও 'সবুজ' রহিয়াছে। শুনা যায়, তিনি বিশ্বভারতীতে নৃত্যের ক্লাস খুলিয়াছেন। বালিকা ও যুবতীগণ তাঁহাকে মধ্যে রাখিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করে। তিনি তাহার এক চলচ্চিত্র (সিনেমা ফিল্ম) উঠাইয়াছেন। সেই চিত্রে দেখা যায় তিনি মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া যুবতীগণ নৃত্য করিতেছে ও তিনি তাল দিতেছেন —দূরে তবলচী তবলা বাজাইতেছে। তিনি সরলচিত্ত সংসারানভিজ্ঞ বালিকাগণকে এ কি শিক্ষা দিতেছেন!

অপরাধী ব্রাহ্ম সমাজ

......এই সকল নৃত্যকারিণী এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে এই সকল নৃত্যে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বা নববিধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আজ তাঁহারা এই সকল অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীগণকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছেন?

উৎপত্তি ও লয় একই স্থানে

ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে হইয়াছে বলিলেই হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টাতেই ব্রাহ্মধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়স হইতেই নাটকের পক্ষপাতী। সেই সময় হইতে তিনি আপন গৃহে, আপন আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে নাটকের অভিনয় করিতেন। ক্রমে তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং অবশেষে এখন যুবতীর নৃত্যে অর্থোপার্জন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে অবস্থা আরো কি ঘৃণিত হইবে কে জানে! যে পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি সেইখানেই তাহার লয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম আজ বহুদূর। যে স্থানে মানবের মুক্তির আয়োজন হইয়াছিল, সেই স্থানে মানবের জঘন্য-বৃত্তির ধূমায়িত বহ্নিতে ইন্ধন দেওয়া হইতেছে।

[সঞ্জীবনী। ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৪]

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, এইসব পত্রিকা ছাড়াও আরও কোন কোন পত্রিকা এই ব্যাপারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নি। তবে সৌভাগ্যের কথা, নাচঘর, প্রবাসী-র মতো পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যমকে প্রশংসার চোখে দেখেছিল।

নৃত্যকলার উজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য-কীর্তি ছাড়া, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যে নবযুগ রচনা করছেন তা' যেমনি বিস্ময়কর তেমনি বিস্তৃত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও আলোচনা-সাপেক্ষ বিষয়। এখানে সেই ঐতিহাসিক আলোচনার সুযোগ কম। প্রসঙ্গতঃ একথা শুধু বলা দরকার যে, সঙ্গীতের অন্যদিক ছেড়ে দিয়ে নৃত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে যুগান্তর এনেছেন, তা' আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় মুখ্য স্থান পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নৃত্যশিল্পী* ছিলেন না একথা স্বীকার করেও তাঁকে ঐ মর্যাদা দিতেই হয়।

বাংলার লোকনৃত্য কোনদিনই সর্বভারতীয় নৃত্যধারায় সামনের সারিতে আসন পায়নি; হয়ত পাবার কথাও নয়। কিন্তু আধুনিক কালে ভারতবর্ষে যে নৃত্যান্দোলন দেখা গেল, তা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র ক'রে বাইজী, চাই কি উত্তর-ভারতীয় নৃত্যের চর্চা হতে থাকে বাংলাদেশে। চর্চা ঠিক বলা যায় না, কেননা তার স্থান ছিল রাজপ্রাসাদ। রাজনৈতিক কারণে তখন বাদশাহী আমলের রিক্ত ঐশ্বর্য দেখে নৃত্যশিল্পীরা বা

---

* নৃত্যশিল্পী বলতে এখানে বোঝাতে চাইছি, নৃত্যের ক্রিয়াসিদ্ধি অনুশীলন যিনি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের চর্চা না করলেও ভারতীয় নৃত্যের মর্মে যে পৌছোতে পেরেছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। শুনেছি, মহড়ার সময় কখনো কখনো তিনি নিজে ভঙ্গী সহকারে শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত নৃত্যটি তাঁর ভালো না লাগতো বা মনের মতো না হতো ততক্ষণ তিনি উপস্থিত থেকে নৃত্যের ভাব বা ভঙ্গিমা বোঝাবার চেষ্টা করতেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের। বস্তুতঃ তিনি ভারতীয় নৃত্যের মর্মে পৌছোতে পেরেছিলেন বলেই নৃত্যধারাকে নতুন পথে চালিত করতে পেরেছেন।

বাইজীরা বাংলায় আসতে সুরু ক'রেছেন নতুন করে ভাগ্যকে যাচাই করবার জন্যে। ধীরে ধীরে রাজসভা থেকে তাঁদের স্থান হতে থাকে নতুন শহর কলকাতার অভিজাত সমাজের আসরে। জুটতো বেশ মোটা রকমের 'পেলা'। তার পাশাপাশি বাংলার ঝুমুর, গম্ভীরা, রায়-বেঁশে ইত্যাদি লোকনৃত্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেরই উপভোগ্য ছিল, উচ্চবর্গীয় সমাজে তারা ছিল 'ব্রাত্য'। অবশ্য সব লোকনৃত্যের দশাই তাই। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গেই তার নাড়ির সম্পর্ক। বাংলাদেশে উত্তর-ভারতীয় বাইজী নৃত্যের (কথক ?) প্রভাব ছাড়া দক্ষিণী নৃত্যের বা দূর প্রাচ্যের কোনো প্রভাব সম্ভবত প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে চোখে পড়ে না। অবশ্য কিংবদন্তী আছে যে, জয়দেবের আমলে পদ্মাবতী (তিনি নিজেও বুঝি দক্ষিণী নারী।) যে নৃত্য করতেন তা দক্ষিণী নৃত্য। এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে যেহেতু লিখিত কোনো প্রামাণ্য বিবরণ নেই, সেইজন্যেই সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।

যাই হোক, উনিশ শতকে বাংলাদেশে (বিশেষতঃ কলকাতায়) প্রচলিত মেথর-মেথরাণীর নাচ, কালু ভুলুর নাচ, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানীর নাচ ইত্যাদির যে নমুনা পাচ্ছি তা বাইজী নৃত্যেরই বিকৃত রূপান্তর এবং কোনো শিল্পরসিক চিত্ত তাকে নৃত্য বলতে কুণ্ঠিত হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ নৃত্যকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে তার প্রমাণ রয়েছে।

গিরিশচন্দ্র তৎকালীন থিয়েটারের নৃত্যধারা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যেও দেখি, তৎকালীন নৃত্যধারায় কোনো শিল্প-চেতনার পরিচয় নেই। কেননা তখনো নৃত্যের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল 'লোকরঞ্জন'। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এইসব নৃত্যের

সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং স্বভাবতই তাই তিনি নৃত্য সম্বন্ধে উৎসাহিত বোধ করেন নি।

বাল্মীকি-প্রতিভার যুগে দস্যুদের গানের সঙ্গে যে ছন্দোময় অঙ্গবিক্ষেপ ঘটেছিল তাকে হয়ত নৃত্য বলা চলে না, অন্ততঃ তা' নিশ্চিতভাবে কোনো বিশেষ রীতির আদর্শে রচিত হয় নি। তবে কবি হয়ত অনুভব করেছিলেন যে, মানবমনের চরম আনন্দের মুহূর্তে মানুষ নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারে নৃত্যের মধ্যে। পরবর্তীকালে সে মনোভাব আর রইল না। অথচ তখন নৃত্য সম্বন্ধে সামাজিক পরিবেশ ও মনোভাব সম্পূর্ণভাবেই প্রতিকূল ছিল। শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্বে 'সেতুবন্ধ'-এ আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যাবে, কীভাবে ধীরে ধীরে তা ঐ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নাগরিক লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকেও প্রথমে স্বীকার করতে হয়েছিল—নৃত্যচর্চা আসলে ব্যায়ামচর্চা। তাছাড়া 'নটীর পূজা'র প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি তৎকালীন পত্রিকায় বিষোদ্গারের স্বরূপ কী কম ছিল তারও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের চেহারাটা ধরা পড়বে। এই সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেই কবি অবশেষে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলনেরই ঢেউ ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তীকালে। বহু শতাব্দীর উপেক্ষিত এই গৌরবময় ঐতিহ্য ও সম্পদ আজ নতুন করে আমাদের জীবনে ফিরে এসেছে। বর্তমানে নৃত্য আর নিছক 'লোকরঞ্জনে'র খোরাক নয়, আমাদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির মহৎ দৃষ্টান্ত। পরম সৌভাগ্যের কথা—রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দযজ্ঞের ঋত্বিক, নৃত্যনাট্যগুলিও এই আনন্দযজ্ঞেরই উৎসার।

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'নৃত্যকলার উজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৭০। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত।

নেপথ্যের কথা

নৃত্যনাট্যগুলি রচনার সময় কবির মানসিক অবস্থা কী রকম ছিল, কীভাবে নৃত্যনাট্যগুলি রচিত বা রূপায়িত হচ্ছিল, ঐ সময়ে লেখা চিঠিপত্রে তার পরিচয় রয়েছে। নৃত্যের মহড়া, প্রযোজনা, প্রতিমা দেবীর উৎসাহ, অনুষ্ঠানের আয়োজন অথবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তার ব্যবস্থা, ইত্যাদি নেপথ্যবর্তী এইসব ঘটনা একদিক থেকে খুবই চিত্তাকর্ষক ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ থেকে বোঝা যাবে, নৃত্যনাট্যগুলি কীভাবে নিরলস অনুশীলন ও সাধনার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, নেপথ্যবর্তী এই ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত হতে পারে না। এখানে তারই সামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে :

১. পরিশোধের কবিতা পরিবর্ধন ও প্রযোজনার সঙ্গে বউমা আমাকে লাগিয়ে দিয়েছেন তাই হাঁফ ছাড়বার সময় নেই, কথা বাঁধছি, সুর জুড়চি, শেখাচ্ছি শান্তিকে। খুব চেষ্টা যাতে দোল পূর্ণিমায় ওটা মঞ্চে চড়ানো হয়—কঠিন কাজ। [১৬. ৩. ৩৭]

২. এখানে রিহার্সাল চলচে। খুব শক্ত। এ দিকে নিবেদিতা অসুস্থ। আমাদের চারিদিকে যেন ছায়া পড়েছে। [১৭. ৩. ৩৭]

৩. আপন খেয়ালে নৃত্যনাট্য বাড়িয়েই চলেছি—কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। আধুনিক নারী প্রগতির দল যেমন বাইসাইক্‌ল চালনা করেন, বৌমার নৃত্যকলা তেমনি সওয়ার হয়েছে আমার বহুকেলে কলমটার পৃষ্ঠে—সে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটেছে—পথ বেড়ে

চলেছে তারই তাড়নায়। অবশেষে থামতে হয়েছে সে কেবল অগত্যা। কারণ আমার লেখনীকে চালানো যায় যত খুশি কিন্তু আমাদের রূপায়ণীদের হাত পা চালানোর সীমা আছে। জিনিষটা উপাদেয় হবে আন্দাজ করচি—কারণ ডেকচি নামাবার পূর্বেই সুঘ্রাণ বেরিয়েছে। [১৯. ৩. ৩৭]

৪. যা হোক সায়াহ্নেই য়ুরোপীয়েরা চলে যাবে না কিন্তু আমার ছুটি নেই। বৌমা আগামী অভিযানের জন্যে চণ্ডালিকা তৈরী করতে চান। তাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমার উপরে ফরমাস আছে—রিহার্সালের কর্তৃত্ব আমাকে নিতে হবে। [৬.১.৩৮]

৫. এই শোকাবহ প্রহসনের পরদিনেই দৌড় দিতে পারতুম, কিন্তু বৌমা চণ্ডালিকার উপসর্গে আমার ঘাড়ে এক দায় চাপিয়েছেন, সকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মাথা চলচে চরকার মতো। সমস্ত চণ্ডালিকার গদ্য অংশটাকেও গানে রূপান্তরিত করতে হবে—ব্যাপারটা কী দুঃসাধ্য তা বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। কবে খালাস পাব ঠিক বলতে পারচিনে। সতেরোই তারিখ পেরিয়েও যেতে পারে। তুমি জানো বৌমার কথা ঠেলবার শক্তি আমার নেই। বিশেষত তিনি যখন মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলেন আপনার যদি কষ্ট হয় তো করবেন না।......

...বকুনি শেষ হলো, এখন চললুম কাজে। আমার সামনের সেই চৌকো ঘড়িতে ইঙ্গিত করচে বেলা দেড়টার। ইচ্ছা করলে ফাঁকি দিতে পারি বলেই ফাঁকি দিতে পারিনে। অতএব চল্লুম—সন্ধ্যে বেলার রিহার্সালের জোগান দিতে হবে। শীতকালের রোদ্দুর যখন গাছের তলায় ছায়া মেলে দেয় তখন মন কেমন করে, কিসের জন্যে তা জানিনে। [১১. ১. ৩৮]

৬. ফিশার এসেছেন। সময় ছিল সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁকে যা

দেখিয়েছি তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। এন্‌ড্রুজকে বলেছেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে এই নাচকে এখনি ফিল্‌মে তুলে নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, এ জিনিষের ভিতর দিয়ে এদেশের যে পরিচয় য়ুরোপকে দেওয়া যেতে পারবে তা খুব মূল্যবান। জেনিভা থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বলে গিয়েছেন এ জিনিষটি অতুলনীয়। কেবল একজন রোগা মতন বাঙালী দর্শক বলে গেলেন, এরকম নাচে গানে বলহানি করচে। [১৭. ১. ৩৮]

৭. কিন্তু আমি এখনো ছুটি পেলুম না। চণ্ডালিকা দিনের অষ্ট প্রহর অধিকার করে আছে। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বৌমা না থাকাতে আমার বোঝা আরো ভারি হয়ে উঠেছে। জিনিষটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে ভালো হবে—এই উৎসাহেই দায়িত্ব আমাকে বেঁধেছে—আর্টের বন্ধন—উৎকর্ষ সাধনের নেশা—এতেই পরিশ্রমকে দুঃসহ বোধ হয় না। বোধ করি সাংখিকদেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। এইমাত্র খেয়ে উঠে একটু অবকাশ নিয়েছি। হৈমন্তীদের রচিত সেই ছোট ঘরে আমার বাসা—দরজা জানালার ফাঁকে রৌদ্রে ঝলমল গাছপালার ইসারা আমাকে কাজ ভোলাবার চেষ্টায় আছে। দূরের কথা যখন মনে পড়ে তখন নেত্রকোণার ঘরের কোণটাই মরীচিকা বিস্তার করে—ঘড়ঘড়িয়ার রাজকীয় ঘরগুলো মনটার দখল নিতে পারে নি। চণ্ডালিকার দল চলে গেলেও নিষ্কৃতি পাব না—অন্তত ২৪।২৫শে পর্যন্ত আতিথ্যের উপসর্গ আছে। [২১শে মাঘ, ১৩৪৪]

৮. কলকাতার অভিনয়ের দিন পেছিয়ে গেল। মার্চের আরম্ভ দিকে ষ্টেজ পাওয়া গেছে। সময় পাওয়াতে সুবিধা হলো—কেননা চণ্ডালিকা অত্যন্ত দুরূহ, দীর্ঘ অভ্যাস ও শিক্ষা সাপেক্ষ। তাছাড়া কলকাতার বাইরের জন্যে চিত্রাঙ্গদা প্রস্তুত করা চাই—এই দুটোতে মিলে নিঃশেষে আমার সময় অপহরণ করেছে। [১০. ২. ৩৮]

৯. কুঁড়েমি করতে যতই ইচ্ছে করচি কাজ করচি ততই বেগে। একটার পর একটা তাগিদ অনাহূত এসে পড়চে। বৌমা অশুভ লগ্নে আমাকে সমর্পণ ক'রে নিজে সরে পড়েছেন—ত্যাগ ক'রে মুক্তি নিতে পারচিনে। সকলের চেয়ে বিরাট একটা তাগিদ আমার উপরে ঝুলচে —কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্বীকার করেছি মহাভারতের উপর একখানা বই লিখব। তাই মন খারাপ হয়ে আছে। [২৩. ২. ৩৮]

১০. চণ্ডালিকার দলের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্চি শুনে আত্মীয় বন্ধু সকলেই নিরতিশয় দুঃখিত ও আশঙ্কিত—বিবি শোকাবহ একখানা চিঠি লিখেছে। আমি বলচি মাভৈঃ—আমার উপরে ছায়াপাত বাঁচিয়ে চলব—সমস্ত কলকাতা জুড়ে তো ছায়া পড়বে না—যাব না সেই প্রলয় বঙ্গভূমিতে! ভেবেছিলুম অভিনয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ ক'রে যাব তাহলে সকলের মন সুস্থ থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের নিকট থাকা অত্যাবশ্যক। শান্তির সেই অনুনয়। সেই জন্যেই ঐ কয়দিন জোড়াসাঁকোয় থাকতে হবে—অর্থাৎ যদি কোনো অন্তিম স্পর্শ অর্থাৎ Last touch-এর দরকার হয় সেজন্যে আমাকে প্রয়োজন আছে। জিনিষটা অত্যন্ত দুরূহ। এর জন্যে অনেক খাটতে হয়েছে। দলবল যাবে ২রা তারিখে। আমিও সেই তারিখেই যাচ্ছি। [২৫. ২. ৩৮]

১১. অভিনয়ের কুষ্টিতে কুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে—দিনক্ষণ নিয়ে কেবলি চলচে গোলমাল। অবশেষে স্থির করেছি পরশু অর্থাৎ সোমবারে যাব। আপাতত তোমারই আশ্রয় স্বীকার করেছি। তারপরে মেয়েরা যখন খুলনা থেকে ফিরে এসে কলকাতার অভিনয়ের জন্য তৈরি হবে তখন কয়েকদিন তাদের নিকটবর্তী হতে হবে—তার দেরী আছে। সব সুদ্ধ বড়ো জীর্ণ হয়ে পড়েছি, চোখ হয়েছে ঝাপসা, কান হয়েছে রুদ্ধ, পা হয়েছে অচল, মন হয়েছে অকর্মণ্য। [৫. ৩. ৬৩]

১২. বাকি রইল, আজ রাত্রে তাসের দেশের অভিনয়। সেটাকে এতদিন ধ'রে নতুন করে দিয়েছি। এখন সেটা নৃত্যনাট্যের রূপ নিয়েছে, অনেক নতুন গান জুড়ে দিতে হলো। ভালো লেগেছে যাঁরা দেখেছেন। [২৭. ১১. ৩৮]

১৩. সম্প্রতি বউমা স্থির করেছিল মায়ার খেলার নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃ সংস্কারে লেগেছি, যেখানে তার অভাব ছিল পূরণ করচি, কাঁচা ছিল শোধন করচি—গানের পরে গান লেখা চলচে, এক-একদিনে চারটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান—জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল ক'রে দেয় এমন আর কিছুতে নয়। [১১. ১২. ৩৮]

১৪. অভিনয়ের দল কাজ সুরু করবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—দেখতে পাবে তাদের নাট্য-নৈপুণ্য। আমি ব'সে ব'সে নিন্দা প্রশংসার ঢেউ গণনা করব খবরের কাগজে।* [২৭. ১. ৩৯]

নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন অভিনয়

১৯৩৬ (১৩৪২-৪৩)

চিত্রাঙ্গদা নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ১১ই, ১২ই, ১৩ই মার্চ অভিনীত হয়। ১৫ই মার্চ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ত্যাগ করলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয়ের জন্যে। পাটনা, এলাহাবাদ,

* এখানে উল্লিখিত পত্রাংশগুলি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত পত্রগুচ্ছ থেকে সংকলিত। এই পত্রধারা ধারাবাহিকভাবে 'দেশ'-এ প্রকাশিত; তারই অন্তর্গত (১৯৬২ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ) এই পত্রাংশগুলি। এর জন্য লেখিকার কাছে কৃতজ্ঞ।

লাহোর, দিল্লী ও মীরাটে এই নৃত্যনাট্যের একাধিক অভিনয় হয়। লক্ষ্ণৌ-এ এই নৃত্যনাট্যের অভিনয় হয় ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে।

পরিশোধ (শ্যামা নৃত্যনাট্যের পূর্ব রূপ)—আশুতোষ হল (ভবানীপুর) কলকাতা : ১০ই ও ১১ই অক্টোবর।

১৯৩৭ (১৩৪৩-৪৪)

চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা—২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৮ই মার্চের মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও আসানসোলে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়।

১৯৩৮ (১৩৪৪-৪৫)

চণ্ডালিকা

কলকাতায় প্রথম অভিনয়। তারপর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় হয়—খুলনা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৈমনসিংহ এবং শিলং-এ।

১৯৩৯ (১৩৪৫-৪৬)

শ্যামা

৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী (কলকাতা)

চণ্ডালিকা

কলকাতা ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী

১৯৪০ (১৩৪৬-৪৭)

চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদা-র অভিনয়

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, আসানসোল।

শ্যামা

৭ই আগষ্ট, শান্তিনিকেতনে অভিনয়—এই বছর শাপমোচনও অভিনীত হয়।

১৯৩৬ সালে কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে যে অভিনয় হয়. তাতে বিশিষ্ট দুটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন :

অর্জুন—নিবেদিতা

সুরূপা চিত্রাঙ্গদা—নন্দিতা

কুরূপা চিত্রাঙ্গদা—যমুনা

কবি মঞ্চের একপ্রান্তে উপবিষ্ট থেকে আবৃত্তি (নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত) করেন।

এই বছরেই বাংলার বাইরে যে সব অভিনয় হয়, তার তারিখ ও বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের নাম উল্লেখযোগ্য :

পাটনা—মার্চ ১৬, ১৭। হুইলার সিনেট হল ও
এলিফিনিস্টোন পিক্চার প্যালেস্
এলাহাবাদ -মার্চ ১৯। রিজেণ্ট
লাহোর—মার্চ ২২, ২৩। প্লজ্
দিল্লী—মার্চ ১৬, ২৭। রিগ্যাল
মীরাট—মার্চ ২৯।

লাহোরে অভিনয়ের আগে মুখ্য রূপায়ণীদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অর্জুনের ভূমিকায় নিবেদিতা দেবীর পরিবর্তে অংশ গ্রহণ করেন শান্তিদেব ঘোষ। ২২শে নভেম্বর (১৯৩৬) তারিখে শান্তিনিকেতনের এক বিজ্ঞপ্তিতে চিত্রাঙ্গদায় অংশ গ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দের নাম জানানো হয়। তাঁরা যথাক্রমে—শান্তিদেব ঘোষ, নীলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গোবর্ধন পাঞ্চাল, শিশির কুমার ঘোষ, ডি, বালগঙ্গাধর, সন্তোষ ভঞ্জচৌধুরী, শিবকুমার দত্ত, হীরেন ঘোষ, বিশ্বরূপ বসু, যমুনা দেবী, নিবেদিতা দেবী, মমতা দেবী, হাসু দেবী, দীপ্তি দেবী, বনলীলা দেবী, ইন্দু দেবী, মণিকা দেবী, রমা দেবী।

১৯৩৮-এ কলকাতা 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে 'চণ্ডালিকা'র অভিনয়

(মার্চ ১৮, ১৯, ২০) হয় ; ১৮ ও ১৯ তারিখের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং মহাদেব দেশাই।

নিম্নলিখিত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন :

প্রকৃতি—নন্দিতা

আনন্দ—কেলু নায়ার

মা—মৃণালিনী স্বামীনাথম্, মমতা ভট্টাচার্য

এই বছরেই ২রা মার্চ তারিখে সঙ্গীত-ভবনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ চণ্ডালিকার অভিনয়ের জন্যে যাত্রা করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, পূর্ববঙ্গে চিত্রাঙ্গদা-র অভিনয়ের জন্যে কয়েকজন শিল্পী ৯ই মার্চ কলকাতা থেকে সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নীচে তাঁদের নামগুলি তুলে দেওয়া গেল :

*শান্তিদেব ঘোষ, *শিশির কুমার ঘোষ, *অশেষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *নীলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কেলু নায়ার, চিমনলাল শেঠ, *শ্যাম কর্মকার, *ইন্দু দেবী, *রেণুকা মুখোপাধ্যায়, বিজেশ কুমারী, মণিকা দেবী, লক্ষ্মী দেবী *মৃণালিনী দেবী, কমলা দেবী, *অমিতা দেবী, *প্রতিমা দেবী, *সেবা দেবী, *সুজাতা দেবী, *কণিকা দেবী *সাধনা দেবী, মাধুরী দেবী, মাধবী দেবী।

*বিশ্বরূপ বসু, *শিবদাস দত্ত, *শান্তি গুহ *মমতা দেবী, সুকৃতি দেবী, *নিবেদিতা দেবী।

—*-চিহ্নিত শিল্পীবৃন্দ ব্যতীত অন্য সকলে কলকাতা থেকে ফিরে আসেন।

চিত্রাঙ্গদার অভিনয়ের সময় যে শিল্পী-গোষ্ঠী যাত্রা করেন, তাঁরা শান্তিদেব ঘোষ এবং বিশ্বরূপ বসুর দায়িত্বাধীনে ছিলেন। ৫ই মার্চ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে শিল্পীবৃন্দের নামের যে তালিকা দেখা

যায় তাতে উপরোক্ত নামগুলি ছাড়াও সন্তোষ ভঞ্জচৌধুরী, হীরেন ঘোষ ও কালিপদ দুলাই মহাশয়ের নাম উল্লিখিত দেখা যায়।

নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের জন্য দলবল সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল তথা ভারত নানা প্রদেশে ভ্রমণ অবশ্য নতুন নয়। তার আগে ১৯৩৪ সালে শাপমোচন-এর অভিনয়ের জন্যেও কবি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ সালে কবি এই উপলক্ষে সিংহল যাত্রা করেন। সেখানে রিগ্যাল থিয়েটারে ১৪ই মে, (সোমবার) তারিখে শাপমোচন-এর অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন :

অমলা দত্ত—গায়িকা
শান্তিদেব ঘোষ—ইন্দ্র
রাণী চন্দ—ইন্দ্রাণী
হৈমন্তী চক্রবর্তী—অরুণেশ্বর
যমুনা বসু—কমলিকা
নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়—উর্বশী।

নৃত্যনাট্যের অভিনয় সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকার মন্তব্য ঃ

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে নৃত্যানুশীলনের সূচনা করেন তখন তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তৎকালীন সমাজ তথা পত্রিকায়, পূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের অভিনয় সম্পর্কে তখন আর সেই মনোভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বাংলা, ভারতবর্ষ, এমন কি ভারতবর্ষের বাইরে এই সমস্ত অভিনয় কী ভাবে সমাদৃত হয়েছিল, তা' তৎকালীন পত্রিকার মন্তব্য থেকে জানা যাবে। এখানে নৃত্যনাট্যের বা অন্যান্য রবীন্দ্র-নাট্যের অভিনয় সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য ও মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল :

নটীর পূজা

১. শ্রীমতী গৌরী বসু শ্রীমতীর ভূমিকায় তাঁহার সঙ্গীত ও নৃত্যকুশলতায় দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।...রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেত্রীগণের বেশভূষার মধ্যে প্রাচ্য রুচিসম্মত বর্ণ ও ভঙ্গীর বিন্যাস মনোরম হইয়াছিল। (আনন্দবাজার, ২৯.১.২৭)

২. নাট্যকলার চরম ব্যাপার এই শহরে ঘটে গেল 'নটীর পূজা'র অভিনয়ে।

...আমরা এমন আর কোনদিন জীবনে দেখিনি—সেই লাবণ্য-নিদান নৃত্য বন্দনার তালে তালে আমাদেরও ডাইনে-বামে, আমাদেরও নব জীবনের মাঝে তার ছন্দ নামলো, নৃত্যরতার সমস্ত অবয়ব থেকে যেন লালিত্যের নির্ঝর ঝরে পড়লো—তার ধারায় জীবন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। [নাচঘর, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২১শে মাঘ, ১৩৩৩]

৩. 'নটীর পূজা'র অভিনয় বাঙলার রঙ্গজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। [আত্মশক্তি (নাট্যনিবন্ধ) ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭]

৪. But above all no praise can be too high for the girl who acted the part of 'Nati'. She was easily the best and exorted praise from everybody by the serene dignity of her pose. Her every movement was natural and showed transparent sincerity within the dance in which the play culminates rises to a pitch far above the reach of human imagination...

[*Forward 29. 1. 27*]

শাপমোচন :

বোম্বাই-এর অভিনয় প্রসঙ্গে বলা হয় :

The poet's whole outlook on life is one symbolic of the utter unity of the universe and his dramas express it,

impressing the fact that rhythm and colour are as fundamental as word and action in the expression of life. This, too, was the greek spirit, and one felt him in 'Redemption' far nearer to Euripides than to the clumsy artificiality of the traditional indian drama, save that he used the convention of the permanent "Set" and makes the time-factor purely arbitrary and unimportant.

[*Times of India*, Bombay, *Nov.* 27. 1933]

তাসের দেশ :

বোম্বাই-এর অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য :

The second drama of the Tagore week, 'The kingdom of cards' was put on boards at the Excelsior Theatre on Monday night, before a crowed house. The Bengali population of the city, wearing festive national appearance, turned out in full force.

...Dr. Tagore's genius is essentially lyrical and as one watched the progress of representation of the drama on the stage one felt that all along that one had been attending a musical party rather than witnessing an actual drama on the stage...

The drama, with its high poetic setting reveals the soul of Santiniketan where if the arts, music, dancing and painting are worshiped as goddesses.

[*The Free Press Journal*, Bombay, 29 11. 33]

১৯৩৪ সালে সিংহলে 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। এই অভিনয় সেখানে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। নিম্নলিখিত দীর্ঘ আলোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

Greatest within Living Memory

Achievement of Tagore Plays

Feast of Dance and Song and Music

Since the unknown artist put the last finishing touches to to the frescoes on the face of the rock at Sigiriya, nothing greater in the way of oriental art has been achieved in this Island than that created by the Tagore players at Regal, Theatre, in the presentation of 'Shap Mochon' on Saturday night...

Once upon a time when the moon was very young there came by chance to this country a Bengali called Vijaya to conquer the primitive tribe that inhabited this island in those days of pre-history. After the lapse of almost twenty-five centuries another Bengali has come, not by chance, with another band of loyal followers for the cultural conquest of what by contrast may be considered the primitive ceylonese in the way of the highest possessions of man—art and beauty and music.

The play bigins

When the first scene opened it was a veritable feast of dreams and longings traslated into colour, sound and rhythm—rich, oriental, splendid. Against an orange background, framed in darker orange with a border of peacock-blue in between as a contrast, sat Indra's court.

The court-dancers, each in a different costume of shadowy elusive gold, spotted green, crimson of the blood and creamy white danced scattering flowers to the rhythm of a haunting melody that seemed to carry the audience away from the world of men.

The show was a perfectly woven pattern of marvellously matched colours. Bathed in flooded light the supple bodies of Bengali damsels moved serenely to rhythm. The pageant that moved across the slage fitted sometime, with the swift gaity of running of winds, the sadness of hearts and the suppressed ecstasies of great moments.

Each scene seemed a bringing to birth in a dream of beauty the frescoes of Ajanta and Bagh and Sigiriya with a vividness that almost intoxicated the senses.

[*The ceylon Daily News, Monday, 14th May 1934*]

—উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে 'শাপমোচন'-এর অভিনয় সিংহলবাসীদের কাছে শুধুমাত্র অভিনবই মনে হয়নি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার ভাবটিও এই সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

তবু তাঁরা মূল নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয় দেখেননি! বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের শিল্পগত অভিনবত্ব ও সার্থকতা এই মন্তব্য থেকে সহজেই অনুভূত হবে।

যাই হোক, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ শান্তিদেব ঘোষের অকুণ্ঠ প্রশংসা ক'রে বলা হয়—"The finest dancer of the whole troupe." কমলিকার ভূমিকায় আচার্য নন্দলাল বসুর কন্যা যমুনা দেবীরও প্রশংসা করা হয়। প্রসঙ্গত মন্তব্যে বলা হয়—"Classicism and modernism combined togather to from something new—a perfect wedding of music and emotion, scene and sound.

The whole setting was a lavish simplicity—greek in design, Javanise in execution.

১৯৩৪ সালে মাদ্রাজে মিউজিয়াম থিয়েটারেও শাপমোচন অভিনীত হয়। সেই অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য :

...The audience was kept spell-bound. The acting was excellent and the music captivating. The delightful colours of the dresses work by the actors lent a particular charm to the occasion.

[*Hindoo, Madras, 28th Oct. 1934*]

চিত্রাঙ্গদা

নিউ এম্পায়ার (কলকাতা) রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এই নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে মন্তব্য :

He (poet) was on the stage throughout the performance and recited portions from the play...

The novelty of the programme last night was that the whole action was carried out in rhythm with vocal accompaniment forming a musical background. Such an attempt at combining opera and ballet has not been made before. Creditable displays were given by Arjun and the two girls who impersonated Chitrangada before and after her transformation.... It is apparent that in Santiniketan not only one the traditional and ancient dances presented in this original form, but a new art is evolving,—a synthesis of all the forms handed down by tradition.

[*The Statesman.*]

Amrit Bazar পত্রিকায় বলা হয় :

The dance-tradition of the country with its conventionalised types has been sought to be rejuvenated with the creative conception of the poet. The dramatic cubism of katha-kali gloriously wedded to the sensitive lyricism of the Manipuri and occasionally punctuated with folk feelings breathe an aroma of dreamland interspersed with haunting melody and silvery moonlight.

চিত্রাঙ্গদার এই অভিনয় প্রসঙ্গে দিল্লী শাখার Statesman-এ মন্তব্য করা হয় :

During the last few years, Dr. Tagore has been experrimenting and searching for a new form, a new design, and a new technique for Indian dramatic art...

But Tagore has always refused to accept the stereotyped forms of old tradition...and he has rebelled against accepted

and current forms in his search for new expressions for new designs.... From the Valmiki-Prativa, his first venture, to his latest production in Chitrangada, produced last week at the Now Empire Theatre in Calcutta, there is traceable an evolution of dramatic experiments in a steady march of progress.

বোম্বাই-এ Excelsior রঙ্গমঞ্চে চিত্রাঙ্গদার অভিনয় সম্বন্ধে বলা হয়:

The huge audience, which included a shrinkling of Europeans, was held enthralled by the performance.

As Mrs. Naidu, who delivered one of her beautifully composed addresses in language worthy of poet during the interval, pointed out the story of Arjuna and Chitra is part of heritage of the Hindu race and the country owes a debt of gratitude to the grand old man who has made of it a work of art for the admiration and edification of all who come into contact with it.

চণ্ডালিকা:

কলকাতায় 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে এই নৃত্যনাট্যের অভিনয় সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

That the old poet of Bengal has lost none of his power of creating new wonders will be proved by performances of 'Chandalika' at Chhaya by the students of Santiniketan...

Neither the narrative nor the moral—which perhaps accompanies it—would make the play what it is by itself. The elements that go to contribute to its success are the taste and the orchestra into a perfect rainbow texture. All the different factors merge into a harmrnious whole and the total effect is a marvellous coherence of sight and sound.

[*Hindoosthan Standard*, *Sunday*, 20. 3. 38]

শেষে মন্তব্যে বলা হয় :

Art in the strict sense of the term presupposes a creative genius and Tagore's creative talent has found a full-fledged expression in this immortal lyric drama.

[*Hindoosthan Standard*]

এই অভিনয় সম্বন্ধে Statesman-এর মন্তব্য :

The entertainment was excented in a dance drama, which was of special interest in that it was a revival of the oldest form of indian play acting...

The costumes and the production in general were extremely artistic ; the hand of the master (though he was unable to be present) could be traced throughout, for Dr. Togore had been responsible for all the dramatic arrangements. [*19th March, 1938*]

এই অভিনয় সম্বন্ধে The Amrita Bazar Patrika-য় বলা হয় :

The dances followed the traditional styles of Kathakali with snatches and catches from Manipuri, both the styles being harmoniously blended...

In the 'Chandalika' based on the well-known theme drawn from Buddist literature, the poet has made his poems visible on the stage with cadances of dance and music—'Karana' and 'Raga' as the media of visible and audible expression. In Tagore's dance-drama 'Vachikabhinaya' is relegated to the background for the purpose of intensifying 'Angikabhinaya' which is passionate and lyrical, and in its higher manifestations interpretive and creative, dynamic and dramatic. [*19. 3. 38*]

এবং—

অভিনয়ের সব দিকের বিচার এই ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রযোজকরা আলোকপাত, সাজ-পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি

বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দিয়াছেন, তাতে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। দক্ষিণী, মণিপুরী, কাণ্ডীয় বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্যের সংমিশ্রণে 'চণ্ডালিকার' নৃত্যগুলি নিত্য নূতন হয়ে উঠেছে।

[যুগান্তর। ৫ই চৈত্র, শনিবার ১৩-৪ : ১৯শে মার্চ, ১৯৩৮]

নৃত্যনাট্যের কাহিনীর মূল সূত্র :

একথা অনেকেই জানেন যে, নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কল্পনাজাত সৃষ্টি নয়; বস্তুত এগুলির বিষয়বস্তু অন্যত্র থেকে সংগৃহীত। যেমন, নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'-র (পরিশোধ কবিতারও বটে) আখ্যানভাগ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকার' কাহিনীও তদ্রূপ। এই নৃত্যনাট্য দুখানির আখ্যানভাগ ঐ গ্রন্থের যথাক্রমে মহাবস্তু অবদান ও শার্দূলকর্ণ অবদান-এর অন্তর্গত। তেমনি নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। এই নৃত্যনাট্যের কাহিনীর মূল সূত্র হিসাবে কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনূদিত মূল মহাভারতের এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত করা হল।

প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের অন্যতম চরিত্র 'উত্তীয়' নামটির সূত্র এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম উল্লিখিত হল। হয়ত অনেকেই জানেন যে, প্রথমে এই চরিত্রটি ছিল না। পরে এই চরিত্রটি নৃত্যনাট্যে সংযোজিত হয়।

চিত্রাঙ্গদা

[ক] বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ইন্দ্রাত্মজ অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমাচলের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠ পর্ব্বত ও ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। কুরুসত্তম (পুরুষোত্তম ?) অর্জ্জুন অসংখ্য বাসভবন ও সহস্র-সহস্র গোধন বিপ্রসাৎ করিয়া হিরণ্যবিন্দুর তীর্থে অবগাহনপূর্বক অনেকানেক পুণ্যস্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রগণ সমভিব্যাহারে হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া উৎসুক মনে পূর্বদিক দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল এবং গয়া প্রভৃতি পুণ্য তীর্থ পর্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় এবং সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জ্জুন সর্বত্র গমন, দর্শন, ও ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ পর্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যল্পমাত্র সহায় সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য পুণ্য তীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণ পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্য তীর্থসকল সন্দর্শন করিয়া তদ্দেশীয় রাজার নিকটে উপনীত হইলেন। মণিপুরেশ্বর পরম ধার্মিক। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন

তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে রাজার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি? অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কুন্তীপুত্র, নাম ধনঞ্জয়। মণিপুরেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধনঞ্জয়। অস্মদ্বংশে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্রকামনায় অতি কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান্ ভবানীপতি তদীয় উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া, "তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদিগের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ভরতর্ষভ! আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা সুতরাং আমি ইহাকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইঁহা দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে, এই আশায় আমি ইঁহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইঁহার গর্ব্ভজাত পুত্র আমারই বংশধর হইবে; হে পাণ্ডব! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে। অর্জ্জুন নিয়মানুরূপ পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তথায় তিন বৎসরকাল বাস করিয়া রহিলেন। পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। [মহাভারত। আদিপর্ব-পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। পৃঃ ২৬০। কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত। ১২৮৮, জ্যেষ্ঠ।]

চিত্রাঙ্গদা

[খ] (অর্জ্জুনের নিয়মভঙ্গ ও বনে গমন)

সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্য-অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নামে ধরে তাহার কুমারী॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা, পূর্ণা রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা, দেখিল অর্জ্জুনে॥
কন্যা দেখি মোহিত হইয়া ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয়॥
পার্থ বলিলেন, রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান॥
রাজা বলে, কে তুমি, কোথায় তব ঘর।
কোন্ বংশে জন্ম তব, কাহার কোঙর॥
তীর্থবাসী জন হইয়া বাঞ্ছ রাজসুতা।
কেমন সাহসে তুমি কহ এই কথা॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তী গর্ভে জন্ম মম, নাম ধনঞ্জয়॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন॥
রাজা বলে, এত দূর আসা কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন পৃথার নন্দন॥
রাজা বলে, মোর ভাগ্যে আইলা হেথায়।
মম বিবরণ শুন, কহিব তোমায়॥

প্রভঞ্জন নামে দ্বিজ মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হইবে রাজা একই কোঙর॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে, সেই রাজ্যে রাজা হৈবে॥
পূর্বেতে এমত বর দিলেন ধূর্জটি।
পুত্র না হইল মম, হইল কন্যাটি॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম বংশে রাজা হৈতে নাহি আর জন॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়ে তারে দিব রাজ্যভার॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে একথা।
এক সত্য কর, তবে দিব আমি সুতা॥
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুত্র হৈবে।
সেই যে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে॥
সত্য করিলেন পার্থ, রাজা কন্যা দিল।
এক বর্ষ তথা তাঁরে রহিতে হইল॥

[মহাভারত-আদিপর্ব। কাশীরাম দাস। প্রথমনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ২২০]

চণ্ডালিকা | শার্দূলকর্ণ অবদান

Story of Śārdūlakarna, in narrating which opportunity is taken to point out in detail the utter fatuity of relying on on caste distinctions.

The scene of the story is laid at Śrāvasti. When the Lord was once sojourning there, in the garden of Anāthapindada, Ānanda, his favourit disciple used daily to go to the city to collect alms. One day after partaking of a repast in residence of a house-holder, when he was returning to the hermitage, he felt thirsty. Seeing a girl, named Prakriti, the daughter of a Chand li, raising water from a well, he asked her for a drink and was duly served.

The girl was smitten by the appearance of the hermit and as he could not be otherwise, influenced, she besought her mother who was proficient in charms and incantations, to bewitch him by her art. The mother prepared with cowdung, in the middle of the courtyard of her house, an altar, lighted thefire thereinand threw into it, oneby one, 108 arka flowers (calotropis giganter), repeating a mantra each time. Ānanda, could not resist the force of this charm and in the evening came to her house and took his seat on the altar, while Prakriti, in delight, was engaged in preparing a bed for him. The conscience of Ānanda, now smote him, and he began to cry, praying that the Lord may rescue him, from his dangerous position. The Lord perceiving by his miraculous power how his disciple was situated,

recited a Buddha mantra, which immediately overpowered the incantations of the Chandali and Ānanda, returned to the hermitage. The Lord, thereupon, taught him the potent mantra whereby he could always overcome such evils.

Matters, however, did not progress so satisfactorily as could be wished. The girl, disappointed at night, rose early the next morning, put on her finest apparel and stood on the road by which Ānanda daily went to the city for alms. Ānanda came and she followed him to every house he went for alms. This caused a great scandal and Ānanda followed by the girl, ran back to the hermitage and reported the occurence to the Lord. The Lord was then called upon to exercise diplomacy to save the character of his disciple. He said to Prakriti, "You want to marry Ānanda. Have you got the permission of your parents? Go, and get their permission." This afforded but slight respite, for Prakriti soon returned from the city with her parents' permission. The Lord then said, "Should you wish to marry Ānanda, you must put on the same kind of Ochre-coloured vestment which he uses." She agreed, and thereupon her head was shaved, she was made to put on Ochre-coloured cloth, diverted of her vicious motives and had all her former sins removed by the mantra called 'Sarvadurgati Śodhona-dhārani,' the destroyer of all evils. Thus did the Lord convert her into a Bhikshuni.*

[*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.* (*P P 223*)
Ed. by Rajendralal Mitra.]

* কবি সতীশ রায়ের কবিতা, 'চণ্ডালী' স্মরণযোগ্য। এ বিষয়ে কানাই সামন্তর "রবীন্দ্র-প্রতিভা"-র গ্রন্থ পরিচয় অংশে বিশদ আলোচনা আছে ; সেই আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্যামা | মহাবস্তু অবদান

Story of Śhyāmā and Vajrasena :—

The reason why Buddha abandoned his faithful wife Yaśodharā is given in the following story.

There was in times of yore, a horse-dealer at Takśhasilā, named Vajrasena ; on his way to the fair at Varanaśi, his horses were stolen, and he was severely wounded. As he slept in a deserted house in the suburbs of Varanasi, he was caught by police as a thief. He was ordered to the place of execution. But his manly beauty attracted the attention of Śhyāmā, the first public woman in Varanasi. She grew enamoured of the man and requested one of her handmaids to rescue the criminal at any hazard. By offering large sums of money, she succeeded in inducing the executioners to set Vajrasen free and execute the orders of the king on another, a banker's son, who was an admirer of Śhyāmā. The Latter, not knowing his fate, approached the place of execution with victuals for the criminal and was severed in two by the executioners.

The woman was devotedly attached to Vajrasen. But her inhuman conduct to the banker's son made a deep impression on his mind. He could not reconcile himself to the idea of being in love with the perpetrator of such a crime. On an occasion when the both set on a pluvial excursion, Vajrasen piled her with wine, and when she was almost senseless, smothered and drowned her. When he thought she was quite dead, he dragged her to the steps of the ghat and fled, leaving her in that helpless condition. Her mother, who was at hand, came to her rescue and by great assiduity resuscitated her. Śhyāmā's first measure, after recovery, was to find out a Bhikhuni of Takshaśilā

and to send through her a message to Vajrasena, inviting, him to her loving embrace. Buddha was that Vajrasena, and Śhyāmā, Yaodhārā.*

[*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.* (*P P 135*)
Ed. by Rajendralal Mitra.]

শাপমোচন-এর রূপান্তর

শাপমোচন শান্তিনিকেতনে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে, এমনকি ভারতের বাইরে সিংহলে নানা উপলক্ষে বহুবার অভিনীত হয়। বিভিন্ন অভিনয়ে প্রায় প্রত্যেক বারেই কিছু-না-কিছু রূপান্তর ঘটে। ১৩৩৯ সালে ১৫ই ও ১৬ চৈত্র (২৯শে, ৩০শে মার্চ ১৯৩৩) তারিখে এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয়ের সময় যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিমার্জিত রূপান্তরই বর্তমানে প্রচলিত।

বস্তুত, ১৩৩৮ সালের প্রথম অভিনয়ের সময় শাপমোচন-এ সর্বসমেত ১৯টি গান ব্যবহৃত হয়েছিল। মাদ্রাজে 'শাপমোচন' মঞ্চস্থ হবার আগে কবি কয়েকটি নতুন গান রচনা করেন। মাদ্রাজের এই অভিনয় প্রসঙ্গে কবি প্রতিমা দেবীকে ১৯৩৪ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখের একখানি চিঠিতে জানান :

* দ্রষ্টব্য। এই কাহিনীতে "banker's son"-এর উল্লেখ আছে, কিন্তু তার নাম 'উত্তীয়' নয়। অবশ্য উত্তীয় নামটি এই মহাবস্তু অবদানেই অন্যত্র উল্লিখিত :

"When the Lord lived at Gridharkuta in Razgriha, Mandgalāyana chanced to meet a Suddhāvāsa Devaputra. From him he learned of the great merits of one "Uttiya", a banker, the disciple of Sarvavibhū". (P P 115)

—*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.*

"আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিষটা [শাপমোচন] এবার সবশুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েছে"। (পত্রসংখ্যা ৪৪, চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড)

গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ) থেকে জানা যায় যে, ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে (১৯৪০) শান্তিনিকেতনে যে অভিনয় হয়, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় নাটিকাটির সেই শেষ অভিনয়। সেই অভিনয়ে ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে গানগুলি নির্বাচন ক'রে দেন, শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে তার মুদ্রিত তালিকাটি এখানে উল্লিখিত হল :

প্রথম দৃশ্য। ইন্দ্রসভা—১। নহ মাতা, নহ কন্যা

২। হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র ৩। ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরুণেশ্বরের প্রাসাদ

১। তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে ২। ওরে চিত্ররেখা ডোরে ৩। তুমি কি কেবলি ছবি ৪। কখন দিলে পরায়ে

তৃতীয় দৃশ্য। মদ্ররাজগৃহে কমলিকা

১। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় ২। তোমায় সাজাব যতনে ৩। দে পড়ে দে আমায় তোরা ৪। বাজিবে, সখা, বাঁশি বাজিবে ৫। বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে ৬। তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে ৭। বাজো রে বাঁশরি, বাজো ৮। লহো লহো তুলে লহো

চতুর্থ দৃশ্য। পতিগৃহে রাজবধূ

১। হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে ২। কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে ৩। কাছে থেকে দূরে রচিল ৪। আন্‌মনা আন্‌মনা ৫। হায়রে, ওরে যায় না কি জানা ৬। বসন্তে ফুল গাঁথল

৭। অসুন্দরের পরম বেদনায় ৮। একদিন সইতে পারবে
৯। তোমার এ কী অনুকম্পা ১০। না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো

পঞ্চম দৃশ্য। নির্জনবনে রাণী

১। সখী, আঁধারে একেলা ঘরে ২। কোন্ গহন অরণ্যে তারে
৩। ও কি এল, ও কি এল না ৪। মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি।

পূর্ব-উল্লিখিত গ্রন্থপরিচয়ে আরো বলা হয়েছে যে, চতুর্থ দৃশ্যের ৮ ও ৯-সংখ্যক গানের পাঠ প্রচলিত মুদ্রিত পাঠ থেকে ভিন্ন। প্রাসঙ্গিকবোধে তাও উদ্ধৃত করা গেল :

রাজা। একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে, তোমার আপনার দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে।

রাণী। তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে, তাহার অর্থ বুঝিনে। ঐ শোন ঐ শোন, উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক্-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই রূপান্তর ছাড়াও শাপমোচন-এর আরো রূপান্তর ঘটেছিল। আশা করা যায়, যথাসময়ে সে বিষয়ে আলোচনা হবে। পরিশেষে একথাও বলা দরকার যে, অন্যান্য নৃত্যনাট্যের মতো শাপমোচন-এর আখ্যানভাগও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত Kuśa Jataka থেকে গৃহীত। মূল কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

Subandhu of Benaras was the Lord of sixty thousand cities. In the bed-chamber of the royal palace, there sprang up, all of a sudden, a large number of sugarcane trees. From one of these, a boy was produced, was named Ikshvāku

after his birth-place. On the demise of Subandhu, Ikshvāku ascended the throne. He had five hundred wives of whom Avūdā was the chief. Avūdā obtained from Indra a pill which promoted pregnancy. This she dissolved in water and took a small quantity of the mixture, distributing the rest of it to her rivals. Every one of them gave birth to a son of whom Avūdā's child was the most ugly ; but it had on its person all the signs of a royal personage of Kūśa,···Kūśa, the son of Avūdā, was, as the eldest and born of the chief queen, raised to the throne, and he married Sudarśanā, the daughter of the king of Kānyakubja in Sūrasena. Sudarśanā finding her husband very ugly, left his house, and went over to her father's. Kūśa too proceeded to Kānyakubja and there displayed his skill in various arts to win the heart of his consort. By the advice of his father-in-law, he placed a valuable jewel (Jyotirasa) on his head. Instantly his ugliness was changed into the most charming beauty, and his wife had no more objection in accepting him.

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের প্রসার

সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলি বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। য়ুরোপেও এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। প্রাসঙ্গিক বোধে আমাকে লেখা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানীর পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

(১) "···১৯৫২ সালে শ্রীমতী মৃণালিনী সারাভাই তাঁর 'দর্পণা'র দল নিয়ে যখন দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন তখন

সেই দলের সঙ্গে আমি ছিলাম এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ সেই সময় অভিনীত হয়। ওই অঞ্চলের সংবাদপত্রে সে সময় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার থেকে আমার ধারণা লোকেদের 'চিত্রাঙ্গদা' দস্তুর মতো ভালো লেগেছিল।"

(২) "…'চিত্রাঙ্গদা' ballet রূপে অভিনীত হয়েছিল কুবিশেভ থিয়েটারে…। অবশ্য…মস্কোতে শতবার্ষিকী উপলক্ষে Bolshoi থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল ব'লে শুনেছি। …পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল মূল কাহিনী অবিকৃত রেখে তাঁরা ব্যালে নৃত্যে পরিণত করে দেবেন।"

বিদেশে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি বলেই পরিচিত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাট্যকাররূপে। সঙ্গীত-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিদেশীরা (এমন কি ভারতীয়রাও!) কতোটুকু রাখেন তা' আমার জানা নেই। রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলত কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং নৃত্যনাট্যগুলি এই ত্রয়ীর (নৃত্যের মাধ্যমে) সঙ্গমভূমি। সুতরাং, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় একমাত্র নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয়ের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। ভারতীয়দের কাছে বিশেষভাবে য়ুরোপীয় বা বিদেশীদের কাছে এগুলি তুলে ধরবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য, বাংলা ভাষা যাঁরা জানেন না, তাঁদের কাছে, বিশেষত য়ুরোপীয়দের কাছে এগুলি কিভাবে মূল স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে উপস্থাপিত করা যায়, তাও ভেবে দেখার বিষয়। এই নৃত্যনাট্যগুলি যদি ঠিক মতো য়ুরোপীয়দের কাছে তুলে ধরা যায়, তাহলে তাঁরা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-প্রতিভার তথা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির এক নতুন পরিচয় পাবেন।

নির্দেশিকা

গ্রন্থপঞ্জী

অভিনয়-দর্পণ—অশোকনাথ শাস্ত্রী
আমাদের শান্তিনিকেতন—সুধীরঞ্জন দাস
কথা ও সুর—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য—শান্তিদেব ঘোষ
ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ
চিত্রদর্শন—কানাই সামন্ত
ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন
ছান্দসিকী—দিলীপ কুমার রায়
জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
জীবনের ঝরা পাতা—সরলাদেবী
জাভা ও বলির নৃত্যগীত—শান্তিদেব ঘোষ
নৃত্য—প্রতিমা দেবী
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মনোমোহন ঘোষ
বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—২য়, ৩য় খণ্ড—সুকুমার সেন
বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—বৈদ্যনাথ শীল
বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিচিত্র সাহিত্য। ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন
ভারতীয় গ্রামীন সংস্কৃতি—শান্তিদেব ঘোষ
রবীন্দ্রজীবনী (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ
রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ ১ম ও ২য় খণ্ড—প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রপ্রতিভা—কানাই সামন্ত
রবীন্দ্রসঙ্গীত—শান্তিদেব ঘোষ
রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা—শুভ গুহঠাকুরতা
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসংগম—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী
রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবী
রাগ ও রূপ (১ম ও ২য় খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
রূপকার নন্দলাল—শান্তিদেব ঘোষ
হুতোম প্যাঁচার নক্সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ
শহর কলকাতার আদিপর্ব—সমুদ্র গুপ্ত
শকুন্তলার নাট্যকলা—দেবেন্দ্রনাথ বসু
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা—সুধীরচন্দ্র কর
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি। ১ম ও ২য় খণ্ড—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সঙ্গীত প্রবেশ ১ম—রবীন্দ্রলাল রায়
সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সুর ও সঙ্গতি—রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ—হেমেন্দ্রকুমার রায়

পত্রিকা

গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০
দেশ
নাচঘর
প্রবাসী
বাঙলা

গ্রন্থপঞ্জী

বিশ্বভারতী

ভারতী

রম্যবীণা

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

সঞ্জীবনী

সংবাদ প্রভাকর

An Introduction to Greek Theatre—Peter D. Arnott
A Source Book of Theatrical History—A. M. Nagler
Ballet—A Decade of Endeavour—Ed. by A. H. Franks
Classical Dances and Costumes of India—Kay Ambrase
Collin's Music Encyclopedia—
Dances of India—Ragini Debi
Form in Music—Stewart Macpherson
Four Plays for the Dancers—W. B. Yeats
Girl's Book of Ballet—Ed. by A. H. Franks
Historical Development of Indian Music
—Swami Prajnananda
Indian Dancing—Ram Gopal
Introduction to Study of Indian Music—E. Clements
Moore's Irish melodies—Thomas Moore
Mirror of Jesture—A. Coomerswamy
On Poetry and Poets—T. S. Eliot
Opera—Edward J. Dent
Plays and Controversies—W. B. Yeats
Poetry of the English-speaking World—Chosen and Ed.
by Richard Aldington
Poetics of Music—Ignor Stravinsky
Selected Essays—T. S. Eliot

Stories of the Great Operas—Milton Cross
Tagore : Poet and Dramatist—Edward Thompson
The Art of Indian Asia Vol. I, II—Hènrich Zimmar
The Dance of Siva—A. Coomerswamy
The Indian Stage Vol. I, II—H. Dasgupta
The Living Stage—Kenneth Macgowan & William Melnitz
The Metropolitan Opera Guide—
The Oxford Song Book—Melody Edition Vol. I—Percy C. Buck
The Sanskrit Drama—A. B. Keith
The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal—R. L. Mitra
The Poetic Image—C. Day Lewis
The Theatre of the Hindoos—(S. Gupta & Co. Calcutta)
The Vaktangov School of Stage Art—Nikolai Gorchakov
The World's Great Operas—John Tasker Howard
W. B. Yeats and Tradition—F. A. C. Wilson

Periodicals

Visva Bharati Quarterly
Hindu Patriot May 1865
Hindoo 1934
The Ceylon Daily News
Marg
The American Record Guide, March 1960

: এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী ধরা হয় নি। যথাস্থানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লিখিত।